রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার

দিলীপকুমার দত্ত
প্রবীরকুমার দেবনাথ
সম্পাদিত

রবীন্দ্রচর্চা-ভবন
৯৭ এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রোড,
কলিকাতা-২৬

প্রকাশ : ১১ শ্রাবণ ১৩৮৭ ॥ ২৭ জুলাই ১৯৮০

প্রকাশক

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

শান্তিনিকেতন । বীরভূম

মুদ্রক

শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়

নিউ আর্ট প্রেস । শান্তিনিকেতন রোড । বোলপুর

মূল্য

পনেরো টাকা মাত্র

সূচী

নিবেদন

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য-সহায়ক রূপে দীর্ঘকাল তাঁর অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে রয়েছি। এই সময়ে প্রভাতকুমারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বহু বিদ্যোৎসাহী সজ্জন কর্তৃক আমরা বহুবার অনুরুদ্ধ হয়েছি প্রভাতকুমারের একটি 'জীবন-পঞ্জী ও রচনা-পঞ্জী' প্রকাশের ব্যাপারে। কিন্তু নানা কারণে এতদিন তা সম্ভব হয়ে ওঠেনি। কিছুকাল পূর্বে শ্রদ্ধেয় পুলিনবিহারী সেন মহাশয় এই গ্রন্থপ্রকাশে বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়ে গ্রন্থ-সম্পাদনার দায়িত্ব-ভার অর্পণ করেন আমাদের উপর। বলা বাহুল্য, তাঁরই অনুপ্রেরণায় ও নির্দেশনায় আমরা এ কাজে ব্রতী হয়েছি। কতটা সফল হয়েছি তার বিচার করবেন পাঠকবর্গ।

প্রথমেই বলা আবশ্যক যে, প্রভাতকুমারের 'জীবন-পঞ্জী ও রচনা-পঞ্জী' প্রথম প্রকাশিত হয় 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় ১৩৭৪ সালের শ্রাবণ মাসে। এই পঞ্জী সংকলন করেন বাণী বসু। আমরা এই সংখ্যা থেকে অনেক তথ্য আহরণ করেছি।

প্রভাতকুমার তাঁর ঘটনাবহুল দীর্ঘজীবনে শুধু বোলপুর--শান্তিনিকেতন ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলেই নয়, বাইরেও বহু অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছেন, পেয়েছেন বহু সম্মান ও স্বীকৃতি। আমরা 'জীবন-পঞ্জী'তে এই ধরনের প্রত্যেকটি অনুষ্ঠানের বিবরণ দিতে পারিনি— উল্লেখ করেছি কেবলমাত্র গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী।

এই গ্রন্থের 'জীবন-পঞ্জী ও রচনা-পঞ্জী' অংশ মুদ্রণ ও গ্রন্থখানির প্রকাশ—এর মধ্যে যে সময়ের ব্যবধান তার মধ্যেও কিছু উল্লেখ্য ঘটনা ঘটে গেছে, প্রকাশিত হয়েছে কিছু রচনা।

নিবেদন

আমরা সেসব ঘটনা ও রচনা গ্রন্থশেষে 'সংযোজন ও সংশোধন' অংশে অন্তর্ভুক্ত করেছি।

এই গ্রন্থ সম্পাদনায় যাঁরা আমাদের নানাভাবে সহায়তা করেছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বশ্রী পুলিনবিহারী সেন, কানাই সামন্ত, সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, বিশ্বপ্রিয় মুখোপাধ্যায়, জগদিন্দ্র ভৌমিক, জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়, সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায় ও অজয়কুমার মালের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

প্রভাতকুমার সম্পর্কে রচনা দিয়ে যাঁরা গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি করেছেন তাঁদের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক শ্রদ্ধা। এই গ্রন্থে ব্যবহৃত প্রভাতকুমারের আলোকচিত্রটি তুলেছেন শ্রীসুমন্ত মজুমদার— তাঁকে অভিনন্দন জানাই। চিত্রের ব্লক প্রস্তুত করেছেন ও ছেপেছেন কলিকাতার রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট। নিউ আর্ট প্রেসের স্বত্বাধিকারী বন্ধুবর শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক সহায়তা আমাদের বিশেষভাবে প্রীত করেছে— শ্রীমুখোপাধ্যায় ও তাঁর সহকর্মিদের কৃতজ্ঞতা জানাই।

সুখের বিষয়, এই গ্রন্থ পরিবেশনার দায়িত্ব নিয়েছেন কলকাতার 'রবীন্দ্রচর্চা-ভবন' (টেগোর রিসার্চ ইনষ্টিটিউট)— এজন্য আমরা এই প্রতিষ্ঠানের সম্পাদক অধ্যাপক সোমেন্দ্রনাথ বসু ও তাঁর সহকর্মিদের নিকট কৃতজ্ঞ।

বোলপুর-শান্তিনিকেতন
৭ শ্রাবণ, ১৩৮৭

দিলীপকুমার দত্ত
প্রবীরকুমার দেবনাথ

জীবন-পঞ্জী । রচনা-পঞ্জী

জীবন-পঞ্জী

১৮৯২ ॥ ১২৯৯

২৫শে জুলাই (১১ শ্রাবণ) নদীয়া জেলার রাণাঘাটে জন্ম। পিতা শ্রীনগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (স্থানীয় উকিল) এবং মাতা গিরিবালা দেবী। প্রভাতকুমার দ্বিতীয় সন্তান।

১৯০৬ ॥ ১৩১৩ ॥ বয়স ১৪

: রাণাঘাটের পালচৌধুরীদের প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ে প্রাথমিক শিক্ষা। পিতার শরীর অসুস্থ হওয়ায় সপরিবারে গিরিডি আগমন ও সেখানকার বিদ্যালয়ে শিক্ষারম্ভ।

১৯০৭ ॥ ১৩১৪ ॥ বয়স ১৫

: গিরিডিতে শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের বাসায় রবীন্দ্রনাথকে প্রথম দর্শন।

: বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন উপলক্ষে সাতই আগষ্টে অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করার জন্য গিরিডি বিদ্যালয় থেকে বিতাড়িত।

১৯০৮ ॥ ১৩১৫ ॥ বয়স ১৬

: জুন মাসে কলিকাতায় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ-প্রবর্তিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় পঞ্চমস্থান অধিকার ও মাসিক ১০ টাকা বৃত্তি লাভ। বিনয়কুমার সরকারের সহায়তায় কলিকাতার মেসে বাস ও অধ্যয়ন।

: অক্টোবরে পিতা নগেন্দ্রনাথের মৃত্যু।

জীবন-পঞ্জী

১৯০৯ ॥ ১৩১৬ ॥ বয়স ১৭

: কলিকাতায় স্বাস্থ্যহানির জন্য কলেজ ত্যাগ। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের শিক্ষক গিরিডি নিবাসী হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের সহায়তায় আশ্রমে আগমন ৯ই নভেম্বর।

১৯১০ ॥ ১৩১৭ ॥ বয়স ১৮

: জুন মাসে মাসিক ১৫ টাকা বেতনে ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের শিক্ষক নিযুক্ত।

: সাংসারিক দায়িত্বপালনের জন্য শান্তিনিকেতন ত্যাগ।

: ১২ই জুন এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পত্র।[১]

: রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তন। সঙ্গে আসেন মা, দুই বোন ও এক ভাই।

: ১৭শে জুলাই (১১ শ্রাবণ) প্রভাতকুমারের বয়স ১৮ পূর্ণ হ'লো। সেইদিন সন্ধ্যায় এই জন্মদিনের উল্লেখ করে শান্তিনিকেতন মন্দিরে রবীন্দ্রনাথের উপদেশ।[২]

: পূর্ববঙ্গ ভ্রমণ। আশ্রমে সেকালে পূর্ববঙ্গের বহু ছাত্র ছিল; ক্ষিতিমোহন সেনের সহায়ক রূপে প্রভাতকুমার ঢাকা যান। সোনারঙ, বজ্রযোগিনী প্রভৃতি গ্রাম পরিদর্শন। তরুণদের সভায় প্রাচীন ইতিহাস বিষয়ে ভাষণ দান।

: ডিসেম্বর। ঢাকা (উয়ারী) থেকে প্রভাতকুমারের প্রথম পুস্তক 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' প্রকাশিত। ভূমিকা—যদুনাথ সরকার।

[১৯১০ জুন থেকে ১৯১৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত শিক্ষকতা]

১৯১৪ ॥ ১৩২১ ॥ বয়স ২২

: জুলাই মাসে প্রভাতকুমারের জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক আশীর্ব্বাণী।[৩]

১৯১৬ ॥ ১৩২৩ ॥ বয়স ২৪

: রবীন্দ্রনাথ বিদেশে ; কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতভেদ হওয়ায় এবং আর্থিক কারণে আশ্রমের কার্যভার ত্যাগ।

১৯১৭ ॥ ১৩২৩-২৪ ॥ বয়স ২৫

: জানুয়ারি মাস থেকে কলকাতা সিটি কলেজের গ্রন্থাগারিক।

: জোড়াসাঁকোর বাড়িতে 'বিচিত্রা' ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হ'লে গ্রন্থাগার গঠনের ভার অর্পণ। কয়েকমাসের অক্লান্ত পরিশ্রমে প্রভাতকুমার গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন।

১৯১৮ ॥ ১৩২৪-২৫ ॥ বয়স ২৬

: জানুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক প্রভাতকুমারের উপর 'গুরু' ('অচলায়তন' নাটকের অভিনয় যোগ্য সংস্করণ) মুদ্রণের দায়িত্ব প্রদান।

: ১১ই মার্চ 'কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কমিশন'-এর নিকট গ্রন্থাগার সংগঠনের জন্য প্রয়োজনীয় রীতিনীতি সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ স্মারকলিপি পেশ (উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে)।

: শান্তিনিকেতনে প্রত্যাবর্তনের আবেদন জানিয়ে ২১শে আগষ্ট (৫ ভাদ্র) রবীন্দ্রনাথের পত্র।[৪]

: নভেম্বর মাসে (পুজাবকাশের পর) পুনরায় শান্তিনিকেতনে আগমন। পাঠভবনের শিক্ষকতা এবং গ্রন্থাগারের কার্যভার গ্রহণ।

১৯১৯ ॥ ১৩২৬ ॥ বয়স ২৭

: ২৭শে মে পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণের চতুর্থা কন্যা শ্রীমতী সুধাময়ী দেবীর[৫] সঙ্গে বিবাহ।

১৯২০ ॥ ১৩২৭ ॥ বয়স ২৮

শান্তিনিকেতন 'গুরুপল্লী'তে বাস।

১৯২১ ॥ ১৩২৮ ॥ বয়স ২৯

: বিশ্বভারতীর প্রথম বিদেশী 'অভ্যাগত-অধ্যাপক' ফরাসী প্রাচ্যতত্ত্ববিদ্ সিলভ্যাঁ লেভির নিকট চীনা ও তিব্বতী ভাষা শিক্ষা এবং গবেষণা।

১৯২৫ ॥ ১৩৩২ ॥ বয়স ৩৩

: বিশ্বভারতীর বিদেশী অধ্যাপক ইতালীর জোসেপ তুচ্চি (Tucci)র নিকট মূল চীনা ভাষায় কুংফুৎসুর গ্রন্থ পাঠ। 'তা-সুয়ে' (**Great Learning**) অনুবাদ।

১৯২৬ ॥ ১৩৩৩ ॥ বয়স ৩৪

: বিশ্বভারতী শিক্ষাভবনের অধ্যাপক। ১৯৪১ সাল পর্যন্ত এই পদে ছিলেন।

: 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের' সহকারী সভাপতি।

১৯২৭ ॥ ১৩৩৪ ॥ বয়স ৩৫

: ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বিশ্বভারতীর জন্য অর্থ সংগ্রহের অভিপ্রায়ে ভরতপুর, জয়পুর ও আমেদাবাদ ভ্রমণ।[৬]

: জুলাই মাস থেকে (১৯৩০ পর্যন্ত) জাতীয় শিক্ষা পরিষদে 'হেমচন্দ্র বসুমল্লিক' অধ্যাপক পদে নিযুক্ত এবং বৃহত্তর ভারতে হিন্দু এবং বৌদ্ধসাহিত্য ও সংস্কৃতি

১৯২৭ ॥ ১৩৩৪ ॥ বয়স ৩৫

সম্বন্ধে ধারাবাহিক ভাষণ দান। সভাপতি উপাচার্য যতুনাথ সরকার।[৭]

: সপরিবারে শিলঙ ভ্রমণ।

১৯২৮ ॥ ১৩৩৫ ॥ বয়স ৩৬

: বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস্‌চান্সেলর ডাঃ ধ্রুব-র আমন্ত্রণে ৩০-৩১শে জানুয়ারি উক্ত বিশ্ব-বিদ্যালয়ে এবং ১লা ফেব্রুয়ারি কাশী বিদ্যাপীঠে বৃহত্তর ভারত সম্পর্কে বক্তৃতা।

১৯৩৩ ॥ ১৩৪০ ॥ বয়স ৪১

: ব্রহ্মদেশ ভ্রমণ। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচ্য বিদ্যার বিশিষ্ট ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ লিউস (Luce)-এর সঙ্গে পরিচয়।

১৯৩৬ ॥ ১৩৪৩ ॥ বয়স ৪৪

: শ্রীনিকেতনের 'লোকশিক্ষা সংসদ' প্রতিষ্ঠিত হ'লে প্রথম সহ-সম্পাদকরূপে কার্যভার গ্রহণ। সম্পাদক রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

: ৩১শে জানুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে Bengal Education Week-এ স্কুল লাইব্রেরি বিষয়ে বক্তৃতা।

: ভুবনডাঙার জলাশয়ের সংস্কার কার্যে উদ্যোগী।[৮]

১৯৪১ ॥ ১৩৪৮ ॥ বয়স ৪৯

: পাবনার (বাংলাদেশ) আনন্দগোবিন্দ পাঠাগারের পঞ্চাশবর্ষ-পূর্তি অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব। অন্যতম সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৪৩ ॥ ১৩৫০ ॥ বয়স ৫১

: বোলপুর 'তালতোড়' ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট-রূপে দক্ষতার সঙ্গে দায়িত্ব পালন করায় সরকার কর্তৃক পুরস্কৃত।

: সিউড়িতে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব সভায় সভাপতি।

১৯৪৫ ॥ ১৩৫২ ॥ বয়স ৫৩

: রাণীগঞ্জ স্কুলে এবং বার্ণপুরে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে সভাপতি।

১৯৪৬ ॥ ১৩৫৩ ॥ বয়স ৫৪

: বরোদায় অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

১৯৪৭ ॥ ১৩৫৪ ॥ বয়স ৫৫

: ডুমকার 'লোকশিক্ষা সংসদে'র আহ্বানে ভাষণ দান। স্থানীয় বিদ্যালয়ে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আলোচনা।

: বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজে রবীন্দ্র-সভায় সভাপতিত্ব।

১৯৪৮ ॥ ১৩৫৫ ॥ বয়স ৫৬

: মে মাসে চন্দননগরে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে যোগদান। মেদিনীপুরে রবীন্দ্র পরিষদে এবং কাঁথিতে রবীন্দ্র জন্মোৎবে ভাষণ।

: ১২ই অক্টোবর এলাহাবাদে হিন্দী সাহিত্য সম্মেলনে হিন্দী সাহিত্য বর্গীকরণ সম্পর্কে আলোচনা।

: ২৪শে অক্টোবর প্রয়াগে ভাষণ দান। এই সময় খ্যাতনামা হিন্দী সাহিত্যিক শ্রী রাহুল সাংকৃত্যায়নের সঙ্গে পরিচয়।[৯]

১৯৪৯ ॥ ১৩৫৬ ॥ বয়স ৫৭

: ১৮-২৫শে জানুয়ারি নাগপুরে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলন প্রবন্ধ পাঠ।

১৯৫১ ॥ ১৩৫৮ ॥ বয়স ৫৯

: ৫ই মে ঝাড়গ্রামে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভাষণ দান।

: ৬ই মে টাটানগর 'মিলনী' ক্লাবে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে ভাষণ দান।

: ১০-১৮ই মে ইন্দোরে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান ও সংস্কৃত সাহিত্য বর্গীকরণ সম্পর্কে আলোচনা।

১৯৫২ ॥ ১৩৫৯ ॥ বয়স ৬০

: হায়দ্রাবাদে সর্বভারতীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে যোগদান এবং বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

১৯৫৩ ॥ ১৩৫৯-৬০ ॥ বয়স ৬১

: ২৩-২৫শে জানুয়ারি পুরুলিয়ার 'হরিপদ সাহিত্য মন্দির'-এর রজত জয়ন্তীতে উদ্বোধনী-ভাষণ দান।

: ৩রা এপ্রিল শান্তিপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে ভাষণ।

: ৫ই মে জামসেদপুরে রবীন্দ্র পরিষদে ভাষণ।

: ৭ই মে জামসেদপুরে 'চলন্তিকা'য় ভাষণ।

: ৯-১২ই মে রাঁচীতে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে বক্তৃতা।

: ১৩ই মে ঝাড়গ্রামে রবীন্দ্র-জন্মোৎসবে বক্তৃতা।

: কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'সরোজিনী বসু' স্বর্ণপদক লাভ।

জীবন-পঞ্জী

১৯৫৪ ॥ ১৩৬১ ॥ বয়স ৬২

: ১৫-১৮ই এপ্রিল মালদহে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে বিভিন্ন আলোচনায় অংশ গ্রহণ।

: ৯ই মে পানাগড়ে 'বুদ-বুদ'-এর সাহিত্য সভায় বক্তৃতা।

: ২৭শে জুলাই বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারিকের পদ থেকে অবসর গ্রহণ।[১০]

১৯৫৫ ॥ ১৩৬১-৬২ ॥ বয়স ৬৩

: ৮-১০ই এপ্রিল খিদিরপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের বার্ষিক সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

: অক্টোবর মাসে বোলপুরে ব্রাহ্ম সম্মেলনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯৫৭ ॥ ১৩৬৪ ॥ বয়স ৬৫

: পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক 'রবীন্দ্র পুরস্কার' প্রদান।[১১]

: ২৪শে এপ্রিল উত্তরায়ণে রবীন্দ্র-পুরস্কার প্রাপ্তি উপলক্ষে সম্বর্ধিত। সভাপতি বিশ্বভারতীর উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

: ১৫ই মে মহাজাতি সদনে রবীন্দ্রমেলা (প্রথম বর্ষ) কর্তৃক সম্বর্ধিত। মেলা কমিটির সভাপতি তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়।

: মে মাসে শেওড়াফুলি 'মধুচক্র' রাজবাটীতে রবীন্দ্র জন্মোৎসবে যোগদান।

: কাঁদি (বহরমপুর) নবগ্রাম সমাজ শিক্ষা কেন্দ্রের উদ্বোধন করেন।

১৯৫৭ ॥ ১৩৬৪ ॥ বয়স ৬৫

: ১৭ই মে রবীন্দ্রপুরস্কার-প্রাপ্তি উপলক্ষে বোলপুরবাসী কর্তৃক বোলপুর সাধারণ পাঠাগারে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

: ২৭শে মে শান্তিনিকেতন 'আলাপিনী মহিলা সমিতি' কর্তৃক সম্বর্ধিত।

: অক্টোবর মাসে বারাণসী নাগরী প্রচারিণী সভায় এবং গার্লস কলেজে ভাষণ দান।

: লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রসভায় বক্তৃতা।

১৯৫৯ ॥ ১৩৬৬ ॥ বয়স ৬৭

: ৯—১২ই ফেব্রুয়ারি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'লীলা বক্তৃতামালা' প্রদান।[১২]

: ২৬—২৭শে মার্চ বহরমপুরে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনের উদ্বোধক।

: ২২শে মে কলিকাতা বিজয়গড়ে 'লোকশিক্ষা সংসদে'র সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব।

: ১৫ই অক্টোবর বনগ্রাম 'সাধুজন পাঠাগারে'র রজত জয়ন্তী উৎসবে সভাপতিত্ব।

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭ ॥ বয়স ৬৮

: ৬ই মার্চ কলিকাতা বিজয়গড়ে সম্বর্ধিত।

: ১৭ই মার্চ কলিকাতায় ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ফেয়ারে টেলিভিশনে ভাষণ দান।

: ১৫ই এপ্রিল রবীন্দ্র-নাটকের ধারা সম্বন্ধে 'আই-পি-টি-এ'র সভায় ভাষণ দান।

: ৮ই মে শিলিগুড়িতে 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮ ॥ বয়স ৬৯

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী-উৎসব। ভারতব্যাপী অনুষ্ঠিত বহু সভা-সমিতিতে অংশ গ্রহণ। উল্লেখ্য কয়েকটি অনুষ্ঠান—

: ২২শে মার্চ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত Peace Festival-এ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' বিষয়ে ভাষণ।

: ৬ই মে বর্দ্ধমানে রবীন্দ্রসদনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

: ৭ই মে চীন থেকে আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি। কিন্তু প্রভাতকুমার যেতে পারেন নি। এই দিনই জলপাইগুড়িতে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে ভাষণ।

: ৮ই মে দার্জিলিঙে ভাষণ দান এবং শিলিগুড়ি 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ' গৃহের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন।

: ৯ই মে বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত Education Conference-এ ভাষণ।

: ২৭শে জুলাই নিউজিল্যাণ্ড ও অষ্ট্রেলিয়া সরকারের আমন্ত্রণ-প্রাপ্তি। কিন্তু প্রভাতকুমারের যাওয়া হয়নি।

: ১১ই নভেম্বর ভারত সরকার ও সাহিত্য আকাদেমী প্রদত্ত 'রবীন্দ্র-শতবার্ষিকী' পুরস্কার লাভ।

: নভেম্বর মাসে জয়পুর ও আজমীরে ললিতকলা আকাদেমীর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় ভাষণ দান।

১৯৬২ ॥ ১৩৬৯ ॥ বয়স ৭০

: অক্টোবর মাসে 'সোভিয়েত আকাদেমী অফ্ সায়েন্স' -এর আমন্ত্রণে পক্ষকালের (৯ই—২৪শে) জন্য রাশিয়া ভ্রমণ।[১৩]

১৯৬৩ ॥ ১৩৭০ ॥ বয়স ৭১

: ২৬শে জানুয়ারি দক্ষিণ কলিকাতার রবীন্দ্রনিকেতন গ্রন্থাগারের দ্বারোদ্ঘাটন।

: ফেব্রুয়ারি মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'গিরিশচন্দ্র ঘোষ' বক্তৃতামালায় 'তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়' বিষয়ে ভাষণ দান।[১৪]

: ২৮শে এপ্রিল 'গীতবিতান'-এর সমাবর্তন উৎসবে সভাপতিত্ব।

: ১লা মে বরানগরে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সান্ধ্য-শাখার উদ্বোধক।

: ৩০শে অক্টোবর—৩রা নভেম্বর কালনায় অনুষ্ঠিত ব্রাহ্ম-সম্মেলনে সভাপতিত্ব।

১৯৬৪ ॥ ১৩৭১ ॥ বয়স ৭২

: এপ্রিল মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে রামমোহন রায় সম্বন্ধে 'বিদ্যাসাগর বক্তৃতা' প্রদান।[১৫]

: ২৫শে মে কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইন্‌স্টিটিউট হলে রবীন্দ্রজয়ন্তী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।

: মে মাসে কলিকাতায় বিশ্বভারতী 'লোকশিক্ষা সংসদ' কর্তৃক আয়োজিত সাহিত্যসভায় সভাপতিত্ব।

: ১৯শে নভেম্বর কলিকাতার ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে কেশবচন্দ্র সেনের জন্মোৎসবে বক্তৃতা।

: ২১-২২শে নভেম্বর রাণাঘাটে অনুষ্ঠিত বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি।

১৯৬৫ ॥ ১৩৭২ ॥ বয়স ৭৩

: আগষ্ট মাসে 'ষ্টার' থিয়েটারে 'একক দশক শতক' নাট্যাভিনয়ের শততম রজনীর স্মারক-উৎসবে সভাপতিত্ব ও পুরস্কার প্রদান।

: ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর সমাবর্তন উৎসবে আচার্য প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী কর্তৃক 'দেশিকোত্তম' (ডি.লিট) উপাধিতে ভূষিত।

১৯৬৬ ॥ ১৩৭৩ ॥ বয়স ৭৪

১৯শে জানুয়ারি কলিকাতায় রমা রেঁালা-শতবার্ষিকী সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব।

: ৫ই ফেব্রুয়ারি রাণাঘাটে পৌরসভার শতবর্ষপূর্তি-উৎসবে সভাপতিত্ব।

: ৬ই ফেব্রুয়ারি 'দেশিকোত্তম' প্রাপ্তি উপলক্ষে জাতীয় গ্রন্থাগারে সম্বর্ধিত।

: ১৯শে মার্চ নিখিল ভারত গ্রন্থাগার পরিষদের উদ্যোগে 'দেশিকোত্তম' উপাধি প্রাপ্তি উপলক্ষে দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্বর্ধনা।

: ৬ই আগষ্ট বোলপুর বালিকা বিদ্যালয় কর্তৃক সম্বর্ধিত।

: সেপ্টেম্বর মাসে পঁচাত্তর বৎসরপূর্তি উপলক্ষে কলিকাতার আর্ট সোসাইটি কর্তৃক অর্ঘ্যদান।

: ৪ঠা সেপ্টেম্বর রাণাঘাট রবীন্দ্রভবন কমিটি কর্তৃক আয়োজিত স্মরণ-সভায় প্রধান অতিথি।

১৯৬৭ ॥ ১৩৭৪ ॥ বয়স ৭৫

: 'কথাসাহিত্য' পত্রিকায় প্রভাতকুমারের জীবন ও রচনার বর্ষপঞ্জী প্রকাশিত (শ্রাবণ ১৩৭৪)।[১৬]

১৯৬৮ ॥ ১৩৭৫ ॥ বয়স ৭৬

: ৬ই মার্চ বোলপুর ডাকবাংলো-ময়দানে অনুষ্ঠিত অমৃতবাজার পত্রিকার শতবার্ষিকী-উৎসবে সহ-সভাপতি এবং বোলপুর পৌরসভা ভবনে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষের সম্বর্ধনা সভায় সভাপতিত্ব।

: ২২শে সেপ্টেম্বর মধ্য কলিকাতায় নবনির্মিত বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদ-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন।

: সেপ্টেম্বর-অক্টোবর। রবীন্দ্রচর্চায় সহায়তার জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃক দু'জন সাহিত্য-সহায়ক নিযুক্ত।[১৭]

: ২৩শে ডিসেম্বর (৮ই পৌষ) বিশ্বভারতীর 'প্রতিষ্ঠা দিবস' উদ্‌যাপন-অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব।

১৯৬৯ ॥ ১৩৭৬ ॥ বয়স ৭৭

: ৫ই জানুয়ারি কলিকাতা 'টেগোর রিসার্চ ইন্‌ষ্টিটিউট' কর্তৃক 'রবীন্দ্রতত্ত্বাচার্য' উপাধিতে ভূষিত।

: ২৫শে জানুয়ারি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত মাঘোৎসবে আচার্যরূপে ভাষণ দান।

: ২রা অক্টোবর গান্ধীজন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ইংরেজি কথিকা 'আকাশবাণী' দিল্লী থেকে সম্প্রচারিত।

: ২৬শে নভেম্বর থেকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'বাংলায় ধর্ম সাহিত্য' বিষয়ে 'যোগীন্দ্রমোহিনী' বক্তৃতামালা প্রদান।[১৮]

১৯৭১ ॥ ১৩৭৮ ॥ বয়স ৭৯

: এপ্রিল মাসে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে আকাশবাণী দিল্লী থেকে ইংরেজি কথিকা সম্প্রচারিত।

১৯৭১ ॥ ১৩৭৮ ॥ বয়স ৭৯

: ২৮শে জুলাই আশী বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে ঘরোয়াভাবে জন্মোৎসব পালন।

: ২৪শে ডিসেম্বর বিশ্বভারতীর সুবর্ণ-জয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত বিশেষ ডাকটিকিট বিক্রয়ের উদ্বোধক।

১৯৭২ ॥ ১৩৭৯ ॥ বয়স ৮০

: আশীবর্ষ পূর্ণ। ঘরোয়া-পরিবেশে জন্মোৎসব।

: অক্টোবর মাসে আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্র থেকে ('শ্রবণী' অনুষ্ঠানে) রবীন্দ্র-দিনপঞ্জী প্রণয়ন বিষয়ে কথিকা সম্প্রচারিত।

: ৩রা ডিসেম্বর বোলপুরে শিশু গ্রন্থাগারের উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে যোগদান।

১৯৭৩ ॥ ১৩৮০ ॥ বয়স ৮১

: ২১শে এপ্রিল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি·লিট' প্রদান।[১৯]

: ২৭শে এপ্রিল রবীন্দ্রভারতী সমিতি কর্তৃক সম্মানিত।

: ২৭শে জুলাই বিরাশী বৎসরে পদার্পণ উপলক্ষে বিশ্ব-ভারতী 'পাঠভবন' কর্তৃক সিংহ সদনে জন্মোৎসব পালন।

: ২রা ডিসেম্বর বোলপুর ধর্মশালায় বীরভুম-বর্ধমান ডেলী প্যাসেঞ্জারস্ এসোসিয়েসন (লুপ সেকশন)-এর প্রথম সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণ।

: ২৩শে ডিসেম্বর উদয়ন-প্রাঙ্গণে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক অর্ঘ্যদান।[২০]

১৯৭৪ ॥ ১৩৮০-৮১ ॥ বয়স ৮২

: ৬ই ফেব্রুয়ারি শ্রীনিকেতন সাম্বৎসরিক উৎসবে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ।

: ২১শে এপ্রিল স্বর্গত প্রফুল্লকুমার সরকারের স্মৃতিতে প্রদত্ত 'আনন্দ পুরস্কার' লাভ।[২১]

: ৯ই মে 'বীরভূম সাহিত্য পরিষদ' কর্তৃক নিজ বাস-ভবনে সম্বর্ধিত।

: বিশ্বভারতীর পুনর্গঠন বিষয়ে ভারত সরকার কর্তৃক নিযুক্ত 'মাসুদ কমিটি'র সঙ্গে আলোচনা ২৯শে জুন।

: ২৪শে জুলাই তিরাশি বৎসর বয়সে পদার্পণ উপলক্ষে স্ব-গৃহে জন্মোৎসব। এইদিন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা প্রদান।

১৯৭৬ ॥ ১৩৮৩ ॥ বয়স ৮৪

: ১৮ই অক্টোবর বিশ্বভারতীতে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় অষ্টমবার্ষিকী জীব-পদার্থ-বিদ্যা (Biophysics) সম্মেলন-অনুষ্ঠানের উদ্বোধক।

: নভেম্বর মাসে 'বাংলা সাহিত্য একাডেমী' কর্তৃক সিংহসদনে আয়োজিত বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের সভাপতি।

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৩-৮৪ ॥ বয়স ৮৫

: ২৯শে জানুয়ারি ভারতীয় সংস্কৃতি ভবন, বাংলা সাহিত্য একাডেমি ও পশ্চিমবঙ্গের বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ কর্তৃক সম্বর্ধনা।

: ২২শে ফেব্রুয়ারী উদয়নে 'ইন্দো সোভিয়েত সিম্পোসিয়ামে' উদ্বোধনী ভাষণ।

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৩-৮৪ ॥ বয়স ৮৫

: ১লা মার্চ রবীন্দ্র-দিনপঞ্জী প্রণয়নে সহায়তার জন্য দু'জন সাহিত্য সহায়ক নিযুক্ত।

: ২৭শে জুলাই 'ভারতীয় ইতিহাস গবেষণা সংসদ' কর্তৃক বোলপুরে জন্মোৎসব উদ্‌যাপন।

: ২৭শে নভেম্বর রবীন্দ্রভবনে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মোৎসবে ভাষণ।

: ডিসেম্বর মাসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'জগত্তারিণী স্বর্ণপদক'-লাভ ঘোষিত।[২২]

১৯৭৮ ॥ ১৩৮৪-৮৫ ॥ বয়স ৮৬

: ৬ই মার্চ কলাভবনে আয়োজিত সর্বভারতীয় ডাকটিকিট প্রদর্শনীর উদ্বোধক।

: ২০শে মার্চ উত্তরায়ণে চীনা শুভেচ্ছা-প্রতিনিধি দলের সম্বর্ধনা সভায় যোগদান। দলীয় নেতা **Wang Ping-nan**কে 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' গ্রন্থখানি উপহার দেন।

: সেপ্টেম্বর মাসে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক প্রকাশিতব্য রবীন্দ্ররচনাবলীর সম্পাদক-মণ্ডলীর সভাপতি নির্বাচিত। প্রথম অধিবেশন প্রভাতকুমারের গৃহে অনুষ্ঠিত।

: 'বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ'-এর আজীবন সদস্য মনোনীত।

১৯৭৯ ॥ ১৩৮৫-৮৬ ॥ বয়স ৮৭

: ১১ই মার্চ বোলপুর সংস্কৃতি পরিষদ-এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত দোলমেলার উদ্বোধক।

১৯৭৯ ॥ ১৩৮৫-৮৬ ॥ বয়স ৮৭

: ২২শে মার্চ উত্তরায়ণে অনুষ্ঠিত 'আন্তর্জাতিক সমাজবিজ্ঞান কংগ্রেস'-এর উদ্বোধক।

: ১১ই এপ্রিল বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ-পূর্তি উৎসব উপলক্ষে আয়োজিত প্রদর্শনীর উদ্বোধক।

: ১৫ই এপ্রিল আম্রকুঞ্জে রবীন্দ্রজন্মোৎসবে যোগদান।

: ২৭শে মে কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের 'ব্রাহ্ম যুব-সমিতি' কর্তৃক নিজ বাসভবনে সম্বর্ধিত।

: ২৭শে জুলাই বোলপুর সাহিত্য সংসদ কর্তৃক জন্মদিবসে সম্বর্ধিত।

: ১৯শে আগষ্ট 'রবিবাসর' কর্তৃক শান্তিনিকেতনে সম্বর্ধিত।

: সেপ্টেম্বর মাসে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক 'ডি লিট' উপাধি প্রদান।

রচনা-পঞ্জী

১৯০৯ ॥ ১৩১৬

ইতিহাসের গল্প। সোপান (শিশুপাঠ্য পত্রিকা), ১৯০৯, ঢাকা।

১৯১০ ॥ ১৩১৭

ম্যাডাম গঁ্যায়ো। ভারতমহিলা, ৬ষ্ঠ বর্ষ, ১—৩ সংখ্যা, পৃ. ১৩-১৫, ৪৯-৫১, ৮৭-৯০।

১৯১১ ॥ ১৩১৮

কুমীর পোষা (সচিত্র সংকলন)। প্রবাসী, ১৩১৮ কার্তিক, পৃ. ৩৯-৪১।

১৯১২ ॥ ১৩১৯

এবোলার্ড ও হিলোইসি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩১৯।

যুদ্ধে জাতীয় অধঃপতন (সংকলন)। প্রবাসী, ১৩১৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৩৭-৩৮।

প্রাচীন ইতিহাসের গল্প।

প্রকাশক শ্রীহেমেন্দ্রনাথ দত্ত। সাধনা লাইব্রেরী, উয়ারী, ঢাকা। মূল্য এক টাকা। ভারত-মহিলা মেসিন প্রেসে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত। মোট পৃষ্ঠা ১৯৫। সচিত্র।

উৎসর্গ— "স্বর্গীয় পিতৃদেবের চরণে"।

ভূমিকা— শ্রীযদুনাথ সরকার, এম, এ, পি, আর, এস :

"....আজ ৪ বৎসর হইল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এই প্রাচীন জ্ঞানের ক্ষেত্রটিকে ইতিহাসে এম, এ পরীক্ষার একটি অঙ্গ

করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু বাঙ্গলা সাহিত্য জগতে ইহার উল্লেখযোগ্য চর্চা আরম্ভ হয় নাই; লেখক ও পাঠক কেহই এদিকে তাকান না। সেইজন্য শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের গ্রন্থখানিকে এই পথে প্রথম চেষ্টা বলিয়া আমি উৎসাহের উপযুক্ত মনে করি।...”

সূচী— মিশর, বাবিলন, আসিরিয়া, বাবিলনের দ্বিতীয় সাম্রাজ্য, ইহুদী জাতি, পারসিক জাতি, ফিনিক জাতি।

১৯১৩ ॥ ১৩২০

আবেলার্ড ও মধ্যযুগের ইউরোপ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৪৫-৫০।

বিশ্বসংবাদ। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫৪-৫৫।

প্রাচীন ভারতবর্ষে অন্ত্যজ জাতি। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ আষাঢ়, পৃ. ৬০-৬১।

সাধু বার্ণাড। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ আষাঢ়, পৃ. ৭৫-৭৮।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে দণ্ডবিধি (সংকলন)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ শ্রাবণ, পৃ. ৯৮-১০২।

মন্তেসরি শিক্ষা-প্রণালী। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ ভাদ্র, পৃ. ১২৪-২৮।

অপরাধের কারণ ও নিরাকরণ (সংকলন)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২০ কার্তিক, পৃ. ১৫৭-৫৯।

১৯১৪ ॥ ১৩২১

পানামা খাল (সংকলন)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২১ শ্রাবণ, পৃ. ৭৬।

বৈজ্ঞানিক পর্যবেক্ষণ ও আবিষ্কার (সংকলন)। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা, ১৩২১ ভাদ্র, পৃ. ৯৩।

১৯১৭ ॥ ১৩২৪

Railways and Indians and Anglo-Indians Modern Review, September 1917, P. 304-305.

১৯১৮ ॥ ১৩২৪

The Labour Problem in Bengal —Modern Review 1918, P. 358-63.

The Labour Problem in India —Modern Review 1918, P. 37-40.

Pension system in Schools —Modern Review, August 1918, P. 124-28.

Leprosy in India —Modern Review, 1918 January, P. 37-40.

১৯১৯ ॥ ১৩২৬

Need of Hindu inter-caste marriage —Modern Review 1919, P. 266-70.

১৯২০ ॥ ১৩২৭

জাপানের শিল্পোন্নতি। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৭ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১০৬-১০৯।

কোড়াজাতি। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৭ শ্রাবণ, পৃ. ২২৩-২৭।

প্রথম মুসলমান গণতন্ত্র। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৭ শ্রাবণ, পৃ. ২৪৯-৫৩।

১৯২০ ॥ ১৩২৭

ইংরেজি গ্রন্থ-সমালোচনা :

Boroda Library Movement ; By Janardan S. Kudalkar —Modern Review, 1920 February, P. 169-70.

A Satisfied Atlas of the Boroda State ; By Rao Bahadur Gobinda Bhai H. Desai. —Modern Review, 1920 January, P. 84.

A Catalogue of Sanskrit, Prakrita and Hindi Works in the Jaina Siddhanta Bhavana, Arrah. Edited by Upershiva Dasgupta. —Modern Review, 1920 October, P. 401-2

১৯২১ ॥ ১৩২৮

মরণরে তুহুঁ মম শ্যাম সমান। বিজলী (সাপ্তাহিক), ১৩২৮।

ভারত পরিচয়।

হৃষীকেশ সিরিজ/৩॥ প্রকাশক বেঙ্গল বুক কোম্পানী, ৩০ নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মুদ্রণে—সংস্কৃত প্রেস ১২৪/২/১, মানিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মোট পৃষ্ঠা ৬০৭। মূল্য দু'টাকা চোদ্দ আনা।

উৎসর্গ—"...জননী ও জন্মভূমিকে দিলাম।"

ভূমিকা—শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র রায় :

"ভারত-পরিচয় আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিয়াছি। এতগুলি অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের একত্র সমাবেশ প্রায় দেখা যায় না। ...এ প্রকার গ্রন্থ বঙ্গভাষায় এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই।..." ২৭শে সেপ্টেম্বর ১৯২১। সায়েন্স কলেজ, কলিকাতা।

১৯২১ ॥ ১৩২৮

সংক্ষিপ্ত সূচী—প্রথম ভাগ : প্রাকৃতিক। দ্বিতীয় ভাগ : ঐতিহাসিক ও সামাজিক। তৃতীয় ভাগ : শাসন বিষয়ক। চতুর্থ ভাগ : অর্থ নৈতিক।

১৯২২ ॥ ১৩২৯

ধর্ম্মপূজা। প্রবাসী, ১৩২৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ· ১৫৮-৬২। আষাঢ়, পৃ· ৩২১-২৪। ভাদ্র, পৃ· ৬৫৫-৫৮।

১৯২৩ ॥ ১৩৩০

আয়ুর্বেদ সাহিত্য। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩০ ফাল্গুন, পৃ· ১৮৪-৮৬।

১৯২৪ ॥ ১৩৩১

প্রাচীন ভারতের আবহাওয়া তত্ত্ব। প্রকৃতি, ১৯২৪, পৃ· ১৩৫-৩৬।
যবদ্বীপ ও মালয় দ্বীপাবলীতে ভারতীয় ধর্ম। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩১ পৌষ, পৃ· ১৬৬-৬৪।

১৯২৫ ॥ ১৩৩২

Central Asian Discoveries —Modern Review, June 1925, P. 641-46.

ভারতে জাতীয় আন্দোলন।
প্রকাশক শিশিরকুমার নিয়োগী। বরদা এজেন্সী, ১২/১ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, ১৯২৫। শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। মুদ্রাকর—শ্রীজগদানন্দ রায়। মোট পৃষ্ঠা ৩১৫। মূল্য আড়াই টাকা।

উৎসর্গ— "···আমার ছেলেদের ও দেশের ছেলেদের হাতে দিলাম।"

১৯২৫ ॥ ১৩৩২

ভূমিকা— শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় :

"গ্রন্থখানি রচনার জন্য লেখককে বহু তথ্য ও সংবাদ সংগ্রহ করিতে হইয়াছে। বহিখানিতে এমন অনেক কথা দেখিলাম, যাহা আমি জানিতাম না; যাহা জানিতাম কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছিলাম। ইহাও বুঝিতে পারিতেছি, যে, সম্পাদকীয় কাজ করিবার সময় এইরূপ একখানি বহি নিকটে থাকিলে দুর্ব্বল স্মৃতি অনেক সাহায্য পাইবে।...

রাষ্ট্রনৈতিক প্রচেষ্টাকে সুপথে চালিত করিতে এই পুস্তক পরোক্ষভাবে সাহায্য করিবে বলিয়া আমার মনে হয়, গ্রন্থকার ইহা লিখিতে পরিশ্রম করিয়া ভালই করিয়াছেন।"

৩ ফাল্গুন, ১৩৩১।

সূচী— প্রথমখণ্ড : জাতীয় আন্দোলনের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয় খণ্ড : ভারতে বিপ্লববাদের ইতিহাস। তৃতীয় খণ্ড : মোসলেম ভারত। চতুর্থ খণ্ড : প্রবাসী ভারতবাসী।

১৯২৬ ॥ ১৩৩৩

কুংফুৎসু। প্রবাসী, ১৩৩৩ বৈশাখ, পৃ. ১০১-৫, ৬০০-২।

বিশ্বভারতী আদর্শ। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩৩৩ আশ্বিন--কার্তিক, পৃ ১৪৯-৫৩।

১৯২৭ ॥ ১৩৩৪

বহির্ভারতে হিন্দুসভ্যতা ও সাহিত্য। উড়োখই, ১৩৩৪ চৈত্র, পৃ. ২০১-৭।

মূল ইংরেজি রচনা থেকে সুধাময়ী দেবী কর্তৃক অনূদিত। দ্র. **Indian Literature in China and the Far East (1931).**

১৯২৭ ॥ ১৩৩৪

Indian Literature Abroad (China).
—Orient Press, 1927, P. 97.

১৯২৮ ॥ ১৩৩৪-৩৫

চীনে হিন্দু সাহিত্য। বিচিত্রা, ১৩৩৪ মাঘ, পৃ. ২৩৮-৪৫। ফাল্গুন, পৃ. ৪১৪-২১। চৈত্র, পৃ. ৫৬৬-৭১।
১৩৩৫ বৈশাখ, পৃ. ৬৮৬-৮৯। জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৭৯৫-৮০০। আষাঢ়, পৃ. ১৪৪-৫০। শ্রাবণ, পৃ. ২৬০-৬৭। ভাদ্র, পৃ. ৩৮৬-৯১। অগ্রহায়ণ, পৃ. ৮৫৯-৯০১।

মূল ইংরেজি রচনা থেকে সুধাময়ী দেবী কর্তৃক সম্পাদিত। ১৩৩৪ চৈত্র সংখ্যা থেকে প্রভাতকুমার ও সুধাময়ী দেবীর যৌথ নামে প্রকাশিত।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দুসভ্যতা। মাসিক বসুমতী, ১৩৩৫ আষাঢ়, পৃ. ৩৮৮-৯১। শ্রাবণ, পৃ. ৬৬৯-৭৩।

১৯২৯ ॥ ১৩৩৫-৩৬

চীনে হিন্দু সাহিত্য। বিচিত্রা, ১৩৩৫ মাঘ, পৃ. ২৫০-৫৫। ফাল্গুন, পৃ ৩৩৮-৪২।

কোরিয়া ও জাপানে হিন্দু সাহিত্য। বিচিত্রা, ১৩৩৬ বৈশাখ, পৃ. ৭৪৫-৪৯।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দু সাহিত্য। বিচিত্রা, ১৩৩৬ আষাঢ়, পৃ ২৪-৩২ শ্রাবণ, পৃ. ২৭৩-৮৫।

মধ্য এশিয়ায় হিন্দু রাজত্ব। বিচিত্রা, ১৩৩৬ ভাদ্র, পৃ ৪৩০-৩৭।
তুখার রাজ্যে হিন্দুসভ্যতা। বিচিত্রা, ১৩৩৬ পৌষ।

১৯৩১ ॥ ১৩৩৮

ধম্মপদ ও উদানবর্গ (চারিটি চীনা অনুবাদ, তিব্বতী অনুবাদ, মূল সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ধম্মপদের তুলনামূলক সমালোচনা)। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৯৩১, পৃ. ৩৯-৬৪।

ধম্মপদ ও উদানবর্গের ইংরেজি অনুবাদ। **Indian Historical Quarterly, 1935**

ইতিহাসের গল্প : পুরাণো ভারত।

ছোটদের উপযোগী প্রাচীন ভারতের ইতিহাস।

প্রকাশক শ্রীগিরীন্দ্রনাথ মিত্র। দি বুক কোম্পানী লিমিটেড, ৪/৩ বি, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। জ্যৈষ্ঠ ১৩৩৮। মোট পৃষ্ঠা ১৫০। সচিত্র। মূল্য এক টাকা।

উৎসর্গ— "স্নেহের টুনু ও বাবলু, তোমাদের ও 'হাতে খড়ি'র লেখক-লেখিকাদের হাতে দিলাম।..."

রবীন্দ্র-জয়ন্তী (পুস্তিকা)।

২৫শে বৈশাখ, শুক্রবার ১৩৩৮ (৮ই মে ১৯৩১)। "বর্ষপঞ্জী বা রবীন্দ্রনাথের জীবনের সত্তর বৎসরের প্রধান প্রধান ঘটনা ও প্রকাশিত সকল গ্রন্থের কালানুক্রমিক তালিকা।" প্রকাশক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, ১২০/২, আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীসজনীকান্ত দাস। মোট পৃষ্ঠা ১৭। মূল্য চার আনা।

উপহার— "রবীন্দ্রনাথের সত্তর বৎসর বয়সের জয়ন্তী স্মরণ করিবার জন্য শ্রী.........কে এই 'বর্ষপঞ্জী'খানি দিলাম।"

১৯৩১ ॥ ১৩৩৮

Indian Literature in China and the Far East.

Greater India Society. 120-2, Upper Circular Road, Calcutta. Printed and Published by M. C. Das at the Prabasi Press, Calcutta. Total pages—366.

To — "Sri Rabindranath / কত অজানারে জানাইলে তুমি···। রবীন্দ্র জয়ন্তী, ২৫ বৈশাখ ১৩৩৮।"

Foreworded by Kalidas Nag—

".. We congratulate the author on his success in presenting to the general reader a simple and well-documented narrative of Sino-Indian collaboration for over one thousand years and he deserves our sincere thanks for that"

Portions of this book were delivered as lectures under the auspices of the National Council of Education, Bengal, between 1927 and 1930.

১৯৩২ ॥ ১৩৩৯

রবীন্দ্র গ্রন্থপঞ্জী

বিশ্বভারতী-শান্তিনিকেতন। কলিকাতায় ব্রাহ্মমিশন প্রেসে মুদ্রিত। মূল্য বার আনা। মোট পৃষ্ঠা ৭৯।

উৎসর্গ—'বন্ধুবর শ্রীযুক্ত পৃথ্বীসিং নাহার মহাশয়ের করকমলে।'

১৯৩৩ ॥ ১৩৪০

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক

প্রথম খণ্ড (১৮৬১-১৯১২)। প্রকাশক প্রভাত কুমার

১৯৩৩ ॥ ১৩৪০

মুখোপাধ্যায়। **বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।** প্রভাত-কুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত।

"এই গ্রন্থের একমাত্র বিক্রেতা **বিশ্বভারতী** পুস্তকালয়। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা। ১৩৪০।" মূল্য চার টাকা ও সচিত্র বাঁধাই পাঁচ টাকা। মোট পৃষ্ঠা ৫৬৩।

উৎসর্গ— "শ্রীমহিতকুমার মুখোপাধ্যায় / দাদাকে দিলাম।" শান্তিনিকেতন ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৩৩/ ১লা আশ্বিন, ১৩৪০।

১৯৩৪ ॥ ১৩৪১

আজকের ইউরোপ। দেশ, ১৯৩৪ মে ২৬, পৃ. ৩৬-৩৮।
ঐতিহাসিকের পত্র। দেশ, ১৯৩৪ জুন ২৫, পৃ. ৩৪-৩৫।

১৯৩৫ ॥ ১৩৪১-৪২

The Dhammapada and the Udanavarga —Indian historical quarterly, Calcutta, 1935.

বাংলা দশমিক বর্গীকরণ।

Melvil Dewey প্রবর্তিত **Decimal classification** অনুসারে বাংলা লাইব্রেরী গ্রন্থবর্গীকরণ পদ্ধতি। শান্তিনিকেতন ১৯৩৫, মোট পৃষ্ঠা ১০২। মূল্য এক টাকা।

১৯৩৬ ॥ ১৩৪৩

স্কুল লাইব্রেরী। Proceedings of the Bengal education week. Vol-I, 1936. P. 328-39. Edited by Dr. Muhammad Qudrat-I-Khuda.

বঙ্গ পরিচয়।

প্রথম খণ্ড। হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৯। কলিকাতা ৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনের কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস থেকে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোট পৃষ্ঠা ৩১০। মূল্য আড়াই টাকা।

উৎসর্গ— "ডক্টর শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ লাহা মহাশয়ের করকমলে।" শান্তিনিকেতন, ১১ই শ্রাবণ ১৩৪৩।

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য প্রবেশক।

দ্বিতীয় খণ্ড (১৯১২-১৯৩৬)। শান্তিনিকেতন ১৩৪৩। প্রকাশক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় কর্তৃক শান্তিনিকেতন প্রেসে মুদ্রিত। মোট পৃষ্ঠা ৫০৪। মূল্য তিন টাকা ও সচিত্র চার টাকা (১ম ও ২য় খণ্ড একত্রে ছয় টাকা)।

উৎসর্গ— "শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীমতী প্রতিমা দেবী / করকমলে।" শান্তিনিকেতন, ৩০শে আশ্বিন, ১৩৪৩।

১৯৪০ ॥ ১৩৪৭

জ্ঞানভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ।

প্রথম খণ্ড (অ-ঋ)। প্রকাশক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ন্যাশনাল লিটারেচার কোম্পানী, ১০৫ কটন্

স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সেন, ট্রুথ প্রেস, ৩ নন্দন রোড, কলিকাতা। জুলাই ১৯৪০। মোট পৃষ্ঠা ৪৮৬।

ভূমিকা—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর:

"জ্ঞানভারতীর সম্পাদনায় শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমারের অধ্যবসায় সার্থক হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের শব্দভাণ্ডারে এই গ্রন্থের সংগ্রহ আদরণীয়।" ২৫ আষাঢ়, ১৩৪৭।

১৯৪১ ॥ ১৩৪৮

Rabindranath Tagore : A chronicle of eighty years (1861-1941). —**The Calcutta Municipal Gazette, Tagore Birthday splecial supplement, 17 May 1941.**

A Tagore Chronicle —Visva-Bharati Quarterly. Tagore Birthday Number. May-October 1941, P. 259-92.

১৯৪২ ॥ ১৩৪৮-৪৯

জ্ঞানভারতী বা সংক্ষিপ্ত বিশ্বকোষ।

দ্বিতীয় খণ্ড: প্রথম ভাগ (ট-পিসা'র তোরণ)। প্রকাশক শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, দি ন্যাশন্যাল লিটারেচার কোম্পানী, ১০৫ কটন স্ট্রীট, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীসুধাংশুরঞ্জন সেন, ট্রুথ প্রেস, ৩ নন্দন রোড, কলিকাতা। মাঘ ১৩৪৮। ফেব্রুয়ারী ১৯৪২। মোট পৃষ্ঠা ১৩৬। মূল্য—শোভন চার টাকা, সুলভ তিন টাকা।

বঙ্গ-পরিচয়

দ্বিতীয় খণ্ড / হৃষীকেশ সিরিজ নং ১৯। কলিকাতা ৯

নং পঞ্চানন ঘোষ লেনের ওরিয়েন্টাল প্রেস থেকে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র সরখেল কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। মোট পৃষ্ঠা ৩৬৩। মূল্য আড়াই টাকা।

১৯৪৩ ॥ ১৩৫০

রবীন্দ্রনাথের প্রাথমিক অভিনয়। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫০ বৈশাখ, পৃ. ৬৪০-৪৩।

১৯৪৫ ॥ ১৩৫২

রবীন্দ্র-সাহিত্যের সঙ্গী ও সমালোচক। গায়ত্রী, ১৩৫২ নববর্ষ সংখ্যা, পৃ ১৮৪-১৯০।

১৯৪৬ ॥ ১৩৫৩

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক। প্রথম খণ্ড (১৮৬১-১৯০১)। পরিবর্ধিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৫৩। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, বীরভূম। মোট পৃষ্ঠা ৪১৩। মূল্য সাড়ে আট টাকা।

১৯৪৭ ॥ ১৩৫৪

ভারত ও জাপান। দেশ, ১৯৪৭ মে ১০, পৃ. ১৫-১৮।

রবীন্দ্রনাথের নাট্য-কাব্য। দেশ, ১৯৪৭ মে ৩১। পৃ. ১৬৬-৬৮।

Buddhist Literature in Mongolia —The Sino-Indian Journal (Edited by Tan-Yun-San), 1947 July, P. 58-76.

১৯৪৮ ॥ ১৩৫৫

আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। দেশ, ১৯৪৮ মে ৮, পৃ. ৩৯-৪২।

রবীন্দ্রনাথের ধর্মবোধ। দেশ, ১৯৪৮ নভেম্বর ৬, পৃ. ১১-১৩।

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক।

দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০১-১৯১৮)। পরিবর্ধিত সংস্করণ ১৩৫৫ মাঘ। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুরের গলি, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, বীরভূম। মোট পৃষ্ঠা ৫৩৫। মূল্য দশ টাকা।

১৯৪৯ ॥ ১৩৫৬

রবীন্দ্রনাথের আর্ট কি। দেশ, ১৯৪৯ মে ৭, পৃ. ২৫-২৯।

পালকি বেহারার গান। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৫৬ কার্তিক-পৌষ, পৃ. ১৫৪।

১৯৫০ ॥ ১৩৫৭

হিন্দী দশমিক বর্গীকরণ।

সম্পাদক— প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও ভূপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রকাশক হিন্দী সাহিত্য সম্মেলন, প্রয়াগ। মুদ্রাকর রামপ্রতাপ ত্রিপাঠি, সম্মেলন মুদ্রণালয়, প্রয়াগ। মোট পৃষ্ঠা ১০১। মূল্য দু-টাকা।

১৯৫২ ॥ ১৩৫৯

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক।

তৃতীয় খণ্ড (১৯১৯-১৯৩৪)। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন,

কলিকাতা ৭। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, শান্তিনিকেতন প্রেস, শান্তিনিকেতন, বীরভূম। মোট পৃষ্ঠা ৪২৯। মূল্য

উৎসর্গ— 'শ্রীসুধাময়ী দেবীকে'। ২ জুলাই, ১৯৫২।

১৯৫৩ ॥ ১৩৬০

একটি পত্র। শিক্ষাব্রতী ৪/১৯৫৩, পৃ. ১২-১৩।

তর্জমা-আকাদামি। গ্রন্থাবলী ২/২/১৯৫৩, পৃ. ১-৫।

রাণাঘাটের স্মৃতি (আলোক চিত্রসহ)। **Ranaghat P.C. High School, Nadia, Centenary Commemorative Volume, 1853-1953, P. 66-68.**

১৯৫৪ ॥ ১৩৬১

বুনিয়াদী শিক্ষা ও শিক্ষাসত্র। শিক্ষাব্রতী, ১৩৬১ বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ (রবীন্দ্র সংখ্যা), পৃ. ৪১-৫৯।

রবীন্দ্রনাথ ও শিক্ষা-সমস্যা। ক্রান্তি, ৩/৩/১৯৫৪, পৃ. ১৭৯-৮৩।

অভিমত (চিত্তরঞ্জন পাণ্ডার 'ঠাকুরবাড়ী' গ্রন্থের ভূমিকা)। ১৯৫৫ জানুয়ারী ২৩।

১৯৫৫ ॥ ১৩৬২

গ্রন্থাগার ও পাঠকসাধারণ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২ বৈশাখ ২, শনিবার।

বঙ্গভঙ্গ ও রবীন্দ্রনাথ। আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬২ বৈশাখ, পৃ. ২৪।

পত্র। গ্রন্থবাণী, ১৩৬২ বৈশাখ, পৃ ১০-১৬।

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব। ভারত-তীর্থ, ১৩৬২ বৈশাখ, পৃ. ২০৬।

মূল সভাপতির অভিভাষণ (বঙ্গীয় গ্রন্থাগার পরিষদের নবম গ্রন্থাগার সম্মেলনে প্রদত্ত)। গ্রন্থাগার, ১৩৬২। পৃ. ৩-১১।

কাজ চাই। গ্রন্থবাণী, ১৩৬২ শারদীয়া সংখ্যা, পৃ. ১-৪।

নালন্দায় (মুসাফির ছদ্মনামে)। উত্তরা, ১৩৬২ অগ্রহায়ণ,

ফরমাইস। প্রজ্ঞা, ১৩৬২ মাঘ, ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, পৃ. ৪।

রবীন্দ্রনাথের সহচরবৃন্দ। মাসিক বসুমতী, ৪৪ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ১৩৬২।

১৯৫৬ ॥ ১৩৬৩

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক।

চতুর্থ খণ্ড (১৯৩৫-১৯৪১)। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন, বিশ্বভারতী ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। মুদ্রাকর শ্রীবিদ্যুৎরঞ্জন বসু, শান্তিনিকেতন প্রেস, বীরভূম। প্রকাশ ১৩৬৩ শ্রাবণ।

উৎসর্গ— "রবীন্দ্রসাহিত্য-আলোচনার পথিকৃৎ বিদেশী বন্ধু অজিত কুমার চক্রবর্ত্তীর স্মরণে ও রবীন্দ্র-জীবনী-আলোচনার পথিকৃৎ কৈশোরের বন্ধু শ্রীপ্রশান্ত-চন্দ্র মহলানবীশের করকমলে।" ১১ শ্রাবণ ১৩৬৩। মোট পৃষ্ঠা ৩৯৬। মূল্য দশ টাকা।

তর্জমা-আকাদামি (পত্র)। গ্রন্থবাণী, ১৩৬৩ শ্রাবণ, পৃ. ১-৫।

বুদ্ধগয়ায় (মুসাফির ছদ্মনামে)। উত্তরা, ১৩৬৩ ভাদ্র, পৃ. ৭১-
-৭৪।

পত্র (সম্পাদক সমীপে)। মিতালি, ১৩৬৩ শারদীয়া সংখ্যা,
পৃ. ১২-১৩।

সহযাত্রী* (মুসাফির ছদ্মনামে)। পরিচয়, ১৩৬৩ অগ্রহায়ণ,
পৃ. ৩৭৩-৮৫।

শিক্ষার সঙ্কট। দেশ, ১৩৬৩ পৌষ ১৪, পৃ. ৫৯৮-৬০০।

প্রাচীন ভারতে প্রাণী-বিজ্ঞান। জ্ঞান ও বিজ্ঞান ১৩৬৩,
পৃ. ৫০৩-১৪।

১৯৫৭ ॥ ১৩৬৩-৬৪

লাট্টুর চিঠি* (১)। খেয়ালী, ১৩৬৩ চৈত্র, পৃ. ৭-৮।

শান্তিনিকেতন ও বিশ্বভারতীর ইতিহাস প্রণয়নের জন্য আবেদন।
আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৩৬৪ বৈশাখ ২৫। যুগান্তর,
১৩৬৪ বৈশাখ ১৬। জনসেবক, ১৩৬৪ বৈশাখ ৩০।

জীবনে গানের স্থান। দেশ, ১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ ৪, পৃ. ২৫৯-৬৩।

রবীন্দ্রনাথের প্রাক্-পরিবেশ। নবারুণ, ১৩৬৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬-৮।

রবীন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী। ভারত-চীন, ১৩৬৪। পৃ. ২৫৫-৫৭।

ছিন্নপত্র। দেশ, ১৩৬৪ শারদীয়া, পৃ. ১৫৬-৫৭।

সাহিত্য সমারোহ (চিঠিপত্র)। বেতার জগৎ, ১৩৬৪ অগ্রহায়ণ
(১৯৫৭ ডিসেম্বর ১-১৫), পৃ. ১১৫৮ খ।

---

* চিহ্নিতগুলি রম্যরচনা।

নব জ্ঞান-ভারতী (ভৌগোলিক কোষ)।

প্রকাশক শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস এম, এ। জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। মুদ্রাকর শ্রীসুরেশচন্দ্র দাস, এম. এ। অবিনাশ প্রেস, ১১৯ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। ছাত্র সংস্করণ। ৭ই আগষ্ট ১৯৫৭। মোট পৃষ্ঠা ৬২২। মূল্য দশ টাকা।

লাট্টুর চিঠি* (২)। খেয়ালী, ১৩৬৪ পৌষ, ৩য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা।

১৯৫৮ ॥ ১৩৬৪-৬৫

অজানা* (শ্রীহীন মুসাফির ছদ্মনামে)। গল্পভারতী, ১৩৬৪ মাঘ। পৃ. ৫৭০-৭৪।

মুসাফিরের ডায়ারি*। উত্তরা, ১৩৬৪ মাঘ, পৃ. ২৭১-৭৭।

কালো বিড়াল* (মুসাফির ছদ্মনামে)। মৌচাক, ১৩৬৪ মাঘ, পৃ. ৫১২-১৫।

ট্রেনের কামরায়* (মুসাফির ছদ্মনামে)। পরিচয়, ১৩৬৪ ফাল্গুন, পৃ. ৩৮১-৯২।

আবর্জনা* (মুসাফির ছদ্মনামে)। উত্তরা, ১৩৬৫ অগ্রহায়ণ, পৃ. ২১৫-১৭।

১৯৫৯ ॥ ১৩৬৫-৬৬

সমগ্র মানুষের সন্ধানে। যুগান্তর, ১৩৬৫ চৈত্র ১১।

উদ্বোধনী ভাষণ (ত্রয়োদশ বঙ্গীয় গ্রন্থাগার সম্মেলনে)। গ্রন্থাগার, ১৩৬৫ চৈত্র, পৃ. ৩১৩-১৫।

শান্তিনিকেতনের প্রথম স্পর্শ। দেশ, সাহিত্য সংখ্যা ১৩৬৬, পৃ. ৮৫-৯১।

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। গল্পভারতী, ১৩৬৬ বৈশাখ, পৃ. ২৮-২৯।

বাস্তববাদী রবীন্দ্রনাথ। জয়শ্রী, ১৩৬৬ বৈশাখ, পৃ ৯-১৪।

প্রথম কবি-সাক্ষাৎ। উত্তরা, ১৩৬৬ বৈশাখ, পৃ. ৩৯০-৯২।

শ্রীহীন মুসাফিরের ডায়ারী থেকে*। গল্পভারতী, ১৩৬৬ আশ্বিন, পৃ. ২১৭-২২৪।

ভবিষ্যৎ যাদের হাতে। জনসেবক, ১৩৬৬ শারদীয়া সংখ্যা, পৃ. ৬৭-৬৯।

বাঁশরী ও তার পটভূমি। রবিবারের যুগান্তর, ১৩৬৬ পৌষ ১১, পৃ. ক-খ।

পিকিঙের পথে রবীন্দ্রনাথ। ভারত-চীন, ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা ১৩৬৬, পৃ. ১৭-২২।

ইতিহাস কি? —The Journal of the Visva-Bharati Study Circle, Vol. I, No. 1, 1959, P.R – 13.

বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ

দশমিক প্রথায় বাংলা গ্রন্থের বর্গীকরণ পদ্ধতি। প্রকাশক শ্রীপ্রহ্লাদকুমার প্রামাণিক, ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,

১৯৫৯ ॥ ১৩৬৬

কলিকাতা ১২। মুদ্রাকর শ্রীধনঞ্জয় প্রামাণিক, সাধারণ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৫ এ. ক্ষুদিরাম বসু রোড, কলিকাতা-৬। প্রথম প্রকাশ ১৯৫৯, মোট পৃষ্ঠা ৪১৫। মূল্য দশ টাকা।

উৎসর্গ— 'শ্রীবি. এস. কেশবন বন্ধুবরেষু'। ২৭মে ১৯৫৯।

রবীন্দ্রজীবনকথা।

রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি গ্রন্থমালা / রবীন্দ্র-পরিচিতি। প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন। বিশ্বভারতী, ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাপসী প্রেস, ৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রকাশ : ভাদ্র ১৩৬৬। মোট পৃষ্ঠা ৩০৩। মূল্য ছয় টাকা।

উৎসর্গ— 'শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায় করকমলেষু'।

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭

কস্মৈ দেবায়। কথাসাহিত্য, ১৩৬৭ বৈশাখ, পৃ. ৬৩৮-৪০।

মুসাফিরের পত্র। উত্তরা, ১৩৬৭ বৈশাখ, পৃ. ৪১৬-৪১৮।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইতিবৃত্ত। রম্যবীণা, ১৩৬৭ বৈশাখ।

আকাশবাণী কলিকাতা কেন্দ্রের পক্ষ থেকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭

সহিত সাক্ষাৎকার। বেতার জগৎ, ১৯৬০ আগষ্ট ১-১৫, পৃ. ৫৭৯।

মি-লর্ডের এজলাসে* (শ্রীহীন মুসাফির ছদ্মনামে)। উত্তরা, ১৩৬৭ আশ্বিন, পৃ. ১৪৯-৫৭।

জনমত (শ্রীহীন মুসাফির ছদ্মনামে)। জনমত, ১৩৬৭ শারদীয়া, পৃ. ১-১।

আদিম জন্তু মরবে না। সোমপ্রকাশ, ১৩৬৭ আশ্বিন-কার্ত্তিক, পৃ. ১৬১-৬৩।

পড়ুয়া কবি। গ্রন্থজগৎ, ১৯৬০ চতুর্থ বর্ষ, প্রথম সংখ্যা। পৃ. ৫-৬।

নদীয়া জেলায় রবীন্দ্রনাথ। রবি-তর্পণ, ১৩৬৭, পৃ. ২৭-১৯।

পিকিঙে রবীন্দ্রনাথ। ভারত-চীন, ১৩৬৭, পৃ. ১-১০।

রবীন্দ্রনাথের নাটকের ধারা (ঐতিহাসিক আলোচনা)। শনিবারের চিঠি, ৩১ বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৯৬০, পৃ. ৩৫-৩৮।

কবি বাতায়নিক। সপ্তর্ষি ১৩৬৭, পৃ. ১-৭।

জাতীয় শিক্ষায় রবীন্দ্রনাথের স্থান। বসুধারা ১৩৬৭, পৃ. ১-৬।

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭

ভারতে জাতীয় আন্দোলন।

প্রকাশক প্রকাশচন্দ্র সাহা। গ্রন্থম। ২২/১ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মুদ্রাকর শ্রীসূর্যনারায়ণ ভট্টাচার্য। তাপসী প্রেস, ৩০ কর্ণওআলিস স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। মুদ্রণে— রিপ্রোডাকসন সিণ্ডিকেট, কলিকাতা। প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ১৯২৫। প্রথম গ্রন্থম সংস্করণ ৪ঠা আশ্বিন (মহালয়া), ১৩৬৭। মোট পৃষ্ঠা ৪২৮। মূল্য দশ টাকা পঁচাত্তর নয়া পয়সা।

উৎসর্গ— "আমার স্নেহাস্পদ পুত্রদের ও বধূমাতাদের হস্তে এই বইখানি সমর্পণ করলাম···।" ১১ শ্রাবণ ১৩৬৭।

মুখবন্ধ— শ্রীরমেশচন্দ্র মজুমদার :

···"শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এই ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা করিয়া সকলের ধন্যবাদ অর্জন করিবেন সন্দেহ নাই। কারণ এইরূপ বিস্তারিত জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস শুধু বাংলাভাষায় কেন ইংরেজী ভাষায়ও কোন একখানি গ্রন্থে নাই।···

গ্রন্থখানির প্রধান বিশেষত্ব এই যে, ইহার রচয়িতা গতানুগতিকভাবে আলোচনা বা মামুলি বচন না আওড়াইয়া স্বাধীনভাবে অনেক সমস্যা বুঝিতে এবং নিজের মতামত প্রকাশ করিতে সাহসী হইয়াছেন।··· এই গ্রন্থের নানাস্থানে প্রচলিত মতবাদের বিরুদ্ধে গ্রন্থকার যাহা বলিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে অনুধাবনার যোগ্য।···

ভারতের জাতীয় আন্দোলন সম্বন্ধে যাঁহারা বিস্তৃতভাবে জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা এই গ্রন্থ পাঠে বিশেষ উপকৃত হইবেন।"

১৯৬০ ॥ ১৩৬৭

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক।
প্রথম খণ্ড (১৮৬১-১৯০১)। প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা ৯। সংশোধিত সংস্করণ, পৌষ ১৩৬৭। মোট পৃষ্ঠা ৫১৯। মূল্য পনের টাকা।
উৎসর্গ— 'ভাই সু ও বোন কাতুর স্মরণে।'

১৯৬১ ॥ ১৩৬৭-৬৮

সাময়িক পত্রিকা ও রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, ষষ্টি-বার্ষিকী স্মারক-গ্রন্থ, ১৩৬৭ চৈত্র, পৃ. ৫২-৫৯।

ভূমিকা (মীরা ভট্টাচার্যের 'বালক' গ্রন্থের)। ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৬১।

কবি বাতায়নিক। সপ্তর্ষি, ১৩৬৮ রবীন্দ্রসংখ্যা, পৃ. ৩-৭।

শিশু কবি। রবীন্দ্রস্মৃতি, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ৯-১২।

গল্পবলায় রবীন্দ্রনাথ। গল্পভারতী, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ৭৩৭-৪১।

মানবদরদী রবীন্দ্রনাথ। সোভিয়েট দেশ, ১৩৬৮ রবীন্দ্রসংখ্যা, পৃ. ২২-৩৮।

বাণী। শেওড়াফুলি 'মধুচক্র সাহিত্য সংসদে'র মুখপত্র, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ৩।

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮

রবীন্দ্রনাথের ধর্মের বুনিয়াদ। খড়্গাপুর কলেজ পত্রিকা (রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা) ১৯৬১, পৃ. ৮–১৩।

রবীন্দ্রনাথের সমাজচেতনা। খড়্গাপুর কলেজ পত্রিকা (রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা) ১৯৬১, পৃ. ১৪–১৮।

রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শ। খড়্গাপুর কলেজ পত্রিকা (রবীন্দ্র-স্মরণ সংখ্যা) ১৯৬১, পৃ. ১৯–২৫।

আত্মশক্তি ও সমবায়মূর্তি। মাসের খবর (রবীন্দ্র-সংখ্যা) ১৩৬৮, পৃ. ৮৯–৯২।

Presidential Address. —Rabindranath Tagore birth centenary celebrations; proceedings of conferences, Vol. I. Visva-Bharati 1961, P. 94-98.

আমেরিকা সফর। **Rabindranath the traveller life line. Rabindra Centenary Issue, P. 31.**

রবীন্দ্রনাথের নাটকে পথ। গীতবিতান পত্রিকা (রবীন্দ্র শতবার্ষিকী জয়ন্তী সংখ্যা), ১৩৬৮ বৈশাখ ২৫, পৃ. ৭–১০।

রবীন্দ্রনাথের গান—নাটক ও উপন্যাসে। 'দক্ষিণী'র পত্রিকা, ১৯৬১ রবীন্দ্র জন্মোৎসব সংখ্যা, পৃ. ৫–১১।

রবীন্দ্রনাথের অর্থনীতিক চিন্তার ভূমিকা। স্বাধীনতা, শারদীয় সংখ্যা ১৯৬১, পৃ. ১২–১৩।

রবীন্দ্রজীবন। বেতার জগৎ, ১৯৬১ এপ্রিল ২২, পৃ. ৩২৫–২৬, ৩৭৪–৭৬।

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮

বিশ্বভারতী। পরিচয়, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ৯৪১-৫৭।

নিয়মে বাঁধা ডানপিটেমি। সাপ্তাহিক ডানপিটের আসর, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ২-৩।*

রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্রে ঠাকুরদা ষষ্ঠীচরণ ও নাতি নবীনকিশোর। কথাসাহিত্য, ১৩৬৮ বৈশাখ, পৃ. ৮০১-৪।

In memorium Rabindranath Tagore. —Visva-Bharati News, 1961 July, P. 3.

বনমহোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ। অমৃত, ১৯৬১ অক্টোবর, পৃ. ৮২৯-৩০।

Basis of Tagore's Religion. —Cultural Forum, 1961, Tagore number, P. 69-71.

Rabindranath Tagore : A chroniole of Eighty years 1861-1941. (By Probhat Kumar Mukhopadhaya & Kshitish Roy). —A Centenary Volume (1861-1941), Rabindranath Tagore. Sahitya Akademi, New Delhi, 1961. P. 447-503.

রবীন্দ্রনাথ ও রাজনীতি। রবীন্দ্রনাথ (দেবীপদ ভট্টাচার্য সম্পাদিত গ্রন্থ) পৃ. ১৩১-১৩৫।

জাতীয়তা ও আন্তর্জাতীয়তা। আন্তর্জাতিক, ১৯৬১ ৫ম বর্ষ, ১১-১২ সংখ্যা, পৃ. ৯৯৪-১০০১।

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক।

দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০১-১৯১৮)। প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীবাণেশ্বর মুখোপাধ্যায়। কালিকা প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ২৫ ডি.এল. রায় স্ট্রীট, কলিকাতা-৫। পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৬৮। মোট পৃষ্ঠা ৫৮৪। মূল্য পনের টাকা।

রবি-কথা।

রবীন্দ্রশতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত। প্রকাশক শ্রীজিতেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়। ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ। ৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা। মুদ্রণী, ৭১ কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রকাশ নভেম্বর ১৯৬১। মোট পৃষ্ঠা ১৩০। মূল্য তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা।

উৎসর্গ— 'আ-কৈশোরের বন্ধু শ্রীঅমল হোমকে।'

ভূমিকায় লেখক বলেছেন (১১ নভেম্বর, ১৯৬১)—
রবি-কথা লিখবার জন্য অনুরোধ আসে কলকাতা আকাশবাণী থেকে।...

রেডিওতে বেতাররূপ দিয়েছিলেন আমার নাম-অপহারক অজানা মিতা প্রভাত মুখোপাধ্যায়। বেতাররূপটি লোকের ভাল লেগেছিল জেনেই এটি প্রকাশনের ব্যবস্থা করি।”

১৯৬১ ॥ ১৩৬৮

রবীন্দ্রজীবনকথা।

ওড়িয়া ভাষায় অনূদিত। অনুবাদক ভাবগ্রাহী মিশ্র। প্রকাশিকা শ্রীমতী সেবতী দেবী, কটক ১৯৬১। মোট পৃ. ৩৪৬। মূল্য আট টাকা।

রবীন্দ্রজীবনকথা।

রবীন্দ্র শতবর্ষ পূর্তি গ্রন্থমালা/রবীন্দ্র-পরিচিতি। প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী, ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার। শ্রীগোপাল প্রেস, ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা -৪। পরিবর্ধিত সংস্করণ, কার্তিক ১৩৬৮। মূল্য আট টাকা।

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক।

তৃতীয় খণ্ড (১৯১৯-১৯৩৪)। প্রকাশক শ্রীকানাই সামন্ত। বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ। ৬/৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীকার্তিকচন্দ্র পাণ্ডা। মুদ্রণী, ৭১ কৈলাস বোস স্ট্রীট। কলিকাতা-৬। দ্বিতীয় সংস্করণ, অগ্রহায়ণ ১৩৬৮। মোট পৃষ্ঠা ৫৬২। মূল্য পনের টাকা।

১৯৬২ ॥ ১৩৬৮-৬৯

আদর্শ ও বাস্তব। পরিচয়, ১৩৬৮ ফাল্গুন, পৃ. ৭৭৩-৭৫।

পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার। দেশ, ১৯৬২ মে ৫, রবীন্দ্র শতবর্ষপূর্তি সংখ্যা, পৃ. ১৬৭-৮২।

১৯৬২ ॥ ১৩৬৯

রবীন্দ্রনাথ, গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন। কলিকাতা মিউনিসিপ্যাল গেজেট, ১৩৬৯, রবীন্দ্র শত বার্ষিক সংখ্যা, পৃ. ২২-২৫।

শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী।

প্রথম খণ্ড। প্রকাশক শ্রীজানকীনাথ বসু। বুকল্যাণ্ড প্রাইভেট লিমিটেড, ১ শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬। মুদ্রাকর শ্রীগৌরীশঙ্কর রায়চৌধুরী। বসুশ্রী প্রেস, ৮০।৬, গ্রে স্ট্রীট, কলিকাতা-৬। প্রকাশ ১১ শ্রাবণ ১৩৬৯। মোট পৃষ্ঠা ২৮৮। মূল্য পাঁচ টাকা।

উৎসর্গ— "জ্ঞানতপস্বী, ছাত্রবৎসল শ্রীনিত্যানন্দ বিনোদ গোস্বামীর হস্তে এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি সপ্রীতি অর্পিত হইল।"

ভবিষ্যৎ যাদের হাতে। জনসেবক, ১৩৬৯ শারদীয়া সংখ্যা।

বাসাভাঙা।* মৌচাক, ১৩৬৯ পৌষ, পৃ. ৪১১-১২।

রবীন্দ্রবর্ষপঞ্জী।

প্রকাশক শ্রীশ্রীশকুমার কুণ্ডু। জিজ্ঞাসা। ১৩৩এ, রাসবিহারী অ্যাভিনিউ। কলিকাতা-২৯। / ৩৩, কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মুদ্রাকর শ্রীইন্দ্রজিৎ পোদ্দার। শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা-৪। প্রথম সংস্করণ ১৩৬৯ পৌষ। মোট পৃষ্ঠা ১৮৬। মূল্য চার টাকা।

১৯৬২ ॥ ১৩৬৯

শ্রীপুলিনবিহারী সেন, শ্রীক্ষিতীশ রায় ও শ্রীকৃষ্ণ কৃপালনীকে 'স্নেহ-উপহার'। ৭ পৌষ ১৩৬৯।

গ্রন্থশেষে 'ঠাকুর গোষ্ঠীর বংশলতা' সন্নিবেশিত হয়েছে।

১৯৬৩ ॥ ১৩৬৯-৭০

রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ।

প্রকাশক শ্রীবাসুদেব লাহিড়ী। ইষ্টলাইট বুক হাউস। ২০ ষ্ট্রাণ্ড রোড, কলিকাতা-১। মুদ্রাকর শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী। লয়াল আর্ট প্রেস প্রাঃ লিঃ, ১৬৪ ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা-১৩। প্রকাশ দোলপূর্ণিমা ১৩৬৯ (১০ মার্চ ১৯৬৩)। মোট পৃষ্ঠা ১৫০। মূল্য ছয় টাকা।

উৎসর্গ — 'শ্রীমান প্রমথনাথ বিশী'কে।

গ্রন্থশেষে সন্নিবেশিত হয়েছে "রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যাঁদের পত্র ব্যবহার হয়েছিল তাঁদের নাম-তালিকা।"

রবীন্দ্র বিশ্ববিদ্যালয় : একটি প্রস্তাব। যুগান্তর, ১৩৬৯ ফাল্গুন ২৯।

হাঁসফাঁস*। মৌচাক, ১৩৬৯ চৈত্র, পৃ. ৫৫৯-৬১।

সোবিয়েত সফর। প্রবাসী, ১৩৭০ বৈশাখ, পৃ. ৬৫-৭০। জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ২১১-২১৬। আষাঢ়, পৃ. ৩৬৮-৭৪। শ্রাবণ, পৃ. ৪২৪-৪৩৩। ভাদ্র, পৃ. ৫১৭-৫২৪। আশ্বিন, পৃ. ৬৫৫-৬৯। অগ্রহায়ণ, পৃ. ২৭১-২৮৩। পৌষ, পৃ. ৩১২-৩১৯।

১৯৬৩ ॥ ১৩৭০

দ্র. সোভিয়েত সফর। রাইটার্স ফোরাম প্রাইভেট লিমিটেড। ১৯৬৫। কলিকাতা।

কালান্তর ও মানুষের ধর্ম। কালান্তর, ১৩৭০ বৈশাখ।

চিড়িয়াখানা। মৌচাক, ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৬১-৬৪।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধ্যানরূপ। দেশ, ১৩৭০ জ্যৈষ্ঠ ১০, পৃ. ৪০৫-৪১১।

বৈবাহিক* (শ্রীসুধাময় দেব ছদ্মনামে)। উত্তরা, ১৩৭০ আষাঢ়, পৃ. ১৭-১৮।

স্বামী বিবেকানন্দ ও রবীন্দ্রনাথ। প্রবাসী, ১৩৭০ আষাঢ়, পৃ. ৩৯৭-৪০১।

রবি কবির ঘটনা। শারদীয়া বসুমতী ১৩৭০, পৃ. ১৭১।

বোলপুর ডাক-বাংলোর মাঠ। ধূসর মাটি, ১৩৭০ শারদীয়া, পৃ. ১২-১৪।

ব্রাহ্মসম্মিলনী (পুস্তিকা) কালনায় অনুষ্ঠিত (৩০ অক্টোবর—৩রা নভেম্বর) ব্রাহ্ম সম্মেলনে সভাপতির ভাষণ।

দুষ্টু সরস্বতী*। মৌচাক, ১৩৭০ কার্তিক, পৃ. ৩০৫-৮।

তথ্য ও তত্ত্বের সম্বন্ধ নির্ণয়। অমৃত, ১৩৭০ অগ্রহায়ণ ৫, পৃ. ২৮১-৮৩। অগ্রহায়ণ ১২, পৃ. ৩৩২-৩৪। অগ্রহায়ণ ১৯, পৃ. ৪৪২-৪৪। অগ্রহায়ণ ২৬, পৃ. ৫২৫-২৮।

১৯৬৩ ॥ ১৩৭০

রিক্সতে আধঘণ্টা* (শ্রীহীন মুসাফির ছদ্মনামে)। মাসিক বসুমতী, ১৩৭০ অগ্রহায়ণ, পৃ ২৭৭-৮০।

১৯৬৪ ॥ ১৩৭১

পত্র (শেওড়াফুলি 'মধুচক্র সাহিত্য সংসদে'র সম্পাদককে)। স্মরণিকা ১৯৬৪, পৃ ৪।

নামে গোল* (শ্রীহীন মুসাফির ছদ্মনামে)। মৌচাক, ১৩৭১ বৈশাখ, পৃ. ১৩-১৬।

সঙ্কট। কুলটি 'মিলনী' ক্লাবের মুখপত্র। ১৩৭১ বৈশাখ-আষাঢ়।

গড়াইকে টেনে তুলেছে*। শারদীয়া বসুমতী, ১৩৭১, পৃ. ১৯-৩০।

সমাজ ও সঙ্কট। কালান্তর, ১৩৭১ শারদীয়া, পৃ. ২৫-২৭।

রামমোহন ও তলস্তয়। পরিচয়, ১৩৭১ আশ্বিন, পৃ. ২৯৭-৩০৫।

অ্যালসেশিয়ান রাখা না হাতী পোষা*। মৌচাক, ১৩৭১ কার্তিক, পৃ. ৩৩১-৩৭।

Ramananda Chatterjee. —Visva-Bharati Quarterly, Vol. 30, No. 3, 1964-65, P. 197-204.

১৯৬৫ ॥ ১৩৭১-৭২

পরিচায়িকা। 'নৌকাডুবির পরে' (রবীন্দ্রনাথের 'নৌকাডুবি'

১৯৬৫ ॥ ১৩৭১-৭২

উপন্যাসের উপসংহার রূপে হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক রচিত এবং রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত। জিজ্ঞাসা। মার্চ ১৯৬৫) গ্রন্থে লেখক-পরিচিতি। পৃ. ৭-১১।

ছানিকাটা*। মৌচাক, ১৩৭২ বৈশাখ, পৃ. ১৩-১৭।

স্রষ্টা ও সমালোচক রবীন্দ্রনাথ। অমৃত, ১৩৭২ বৈশাখ ২৪, পৃ. ৯-১২।

রামমোহন কি শঙ্করের প্রতিধ্বনি? তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৩৩-৩৫।

রামানন্দ। প্রবাসী, ১৩৭২ আষাঢ়, পৃ. ৩৬৭-৬৯।

রবীন্দ্রনাথের বাল্যরচনা: কালানুক্রমিক সূচী। রবীন্দ্র-জিজ্ঞাসা, প্রথম খণ্ড (বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত)। ১৯৬৫, পৃ. ২২৮-১৬৫।

ভাদ্রোৎসব। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭২ ভাদ্র, পৃ. ৭৩-৭৫।

রবীন্দ্রনাথের সহচরবৃন্দ। বসুমতী, ১৩৭২ কার্তিক, পৃ. ৫-৭। অগ্রহায়ণ, পৃ. ১৭৯-৮০। পৌষ, পৃ. ৩৫৬-৫৮।

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। কথাসাহিত্য, ১৩৭২ অগ্রহায়ণ, পৃ. ১১২৯-৩১।

শ্রীহীনের স্মৃতিরোমন্থন। কথাসাহিত্য, ১৩৭২ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৩৪৭-৫৪।

১৯৬৫ ॥ ১৩৭২

পুস্তক-পরিচয় (প্রভাতচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়ের 'ভারতীয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাসের খসড়া' গ্রন্থের)। তত্ত্বকৌমুদী, ১৯৬৫ নভেম্বর ১০।

১৯৬৬ ॥ ১৩৭২

ব্রজেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ। কথাসাহিত্য, ১৩৭২ পৌষ, পৃ. ১২৪৩-৪৯।

জাতীয় জীবনে সাময়িকপত্রের প্রভাব। বিষ্ণুপুর রামানন্দ মহাবিদ্যালয় পত্রিকা (রামানন্দ জন্মশতবার্ষিকী সংখ্যা) ১৩৭২, পৃ. ৯৬-১০০।

লালবাহাদুর। রোশনাই, ১৩৭২ মাঘ-ফাল্গুন, পৃ. ২৯৪-৯৫।

সোভিয়েত সফর।

প্রকাশক শ্রীজ্যোতিষচন্দ্র ঘোষ। রাইটার্স ফোরাম প্রাইভেট লিমিটেড। ২২ ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১। মুদ্রাকর শ্রীরণজিৎকুমার দত্ত, নবশক্তি প্রেস, ১২৩ আচার্য জগদীশ বোস রোড। কলিকাতা ১৪। প্রকাশ ফাল্গুন ১৩৭২। মোট পৃষ্ঠা ১৯৩। মূল্য ৫·৫০ টাকা।

উৎসর্গ— 'স্নেহাস্পদ শুভময় ঘোষ স্মরণে।'

সভাপতির ভাষণ (রাণাঘাট পৌরসভা শতবর্ষ পূর্তি উৎসব উপলক্ষে)। বার্ত্তাবহ, ১৩৭২ ফাল্গুন ৪।

দিল্লী চলো—দিল্লী চলো (শ্রীহীন মুসাফিরের সফর)। উত্তরা, ১৩৭২ চৈত্র, পৃ. ৩৪৪-৪৭।

১৯৬৬ ॥ ১৩৭৩

খাদ্য সঙ্কটে তোমরা কি করতে পার। মৌচাক, ১৩৭৩ বৈশাখ, পৃ. ৩-৬।

রবীন্দ্রনাথের ধর্ম। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭৩ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১৬-১৮।

গ্রন্থ-সমালোচনা (শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহের 'কাঠের কাজ' গ্রন্থের)। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩ আষাঢ়, পৃ. ১২২০-২৩।

ভাদ্রোৎসব। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭৩ ভাদ্র, পৃ. ৭৩-৭৫।

Literary Criticism of Tagore's Literatures : Plea for objectivity. —The Sunday Search Light. 1966 October 9.

গল্প হলেও সত্য*। রোশনাই, ১৩৭৩ শারদীয়া, পৃ. ২৮-৩১।

রবীন্দ্রসাহিত্য-চর্চায় রবীন্দ্রনাথ। দৈনিক বসুমতী, ১৩৭৩ শারদীয়া, পৃ. ১৬১।

প্রিয়নাথ সেন। কথাসাহিত্য, ১৩৭৩ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪২৫-৩০।

নবনাটক ও অভিনয় ('ষ্টার' রঙ্গমঞ্চে বিমল মিত্রের 'একক দশক শতক' অভিনয়ের শততম রজনীর স্মারক-উৎসব উপলক্ষে রচিত)। মাসিক বসুমতী, ১৩৭৩ অগ্রহায়ণ-পৌষ, পৃ. ৫১৭-১৯।

ছাত্রশাসনতন্ত্র (প্রেসিডেন্সী কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে কর্তৃপক্ষের বিরোধের ভিত্তিতে লিখিত)। কালান্তর, ১৩৭৩ অগ্রহায়ণ।

পৃথিবীর ইতিহাস।

প্রথম খণ্ড (প্রাচীন ও মধ্যযুগ)। প্রকাশক প্রকাশচন্দ্র

১৯৬৬ ॥ ১৩৭৩

স্বাহা। ২২/১ বিধান সরণী, কলিকাতা-৬। মুদ্রাকর এ. মিত্র। নিউ মিত্র প্রিন্টার্স ১২-২ এ বলরাম ঘোষ স্ট্রীট, কলিকাতা-৪। প্রকাশ ১লা পৌষ, ১৩৭৩। মোট পৃষ্ঠা ৩৮১। মূল্য ষোলো টাকা।

উৎসর্গ— "সায়ন, সুমন্ত্র, উদয়ন, প্রিয়দর্শী ও সুপ্রতীক আর কাবেরীকে / তোমাদের হাতে দিলাম আমার এই ইতিহাসের বইটি / দাদাই।"

১৯৬৭ ॥ ১৩৭৩-৭৪

রবীন্দ্রজীবনকথা।

প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা ৭। মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়, শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড। ৫ চিন্তামণি দাস লেন, কলিকাতা-৯। পুনর্মুদ্রণ ১৩৭৩ ফাল্গুন। মোট পৃষ্ঠ ৩৩০। মূল্য সাত টাকা।

কালমৃগয়ার বনদেবীগণ। কথাসাহিত্য, ১৩৭৪ বৈশাখ, পৃ. ৭৮১-৭৯২।

রবীন্দ্রনাথের অর্থ নৈতিক চিন্তার ভূমিকা। আলোক সরণি, ১ম বর্ষ ১৯৬৭ মে, পৃ.৭৪৭-৪৯।

রবীন্দ্রজয়ন্তী উপলক্ষে শুভেচ্ছাবাণী। 'মধুচক্র সাহিত্য সংসদে'র মুখপত্র, ১৯৬৭ মে।

শান্তিনিকেতন স্মৃতির এক অধ্যায়। কথাসাহিত্য, ১৩৭৪ শ্রাবণ, পৃ. ৩৫-৪৫।

১৯৬৭ ॥ ১৩৭৪

রবীন্দ্রজীবনীকারের আশীর্বাণী (শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্রকে)। রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিষদ পত্রিকা, ১৯৬৭ সেপ্টেম্বর ২৭।

বাণী। মহুয়াপাড়া সার্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মুখপত্র, ১৯৬৭ অক্টোবর ১৫।

Rabindranath and Santiniketan—Visva-Bharati. —Concept of National Education in India, 1967. National Council of Education, Bengal, Cal.-32. P. 75-82.

১৯৬৮ ॥ ১৩৭৫

শুভেচ্ছাবাণী। বিধানচন্দ্র সব পেয়েছির আসরের মুখপত্র। মহাকালহাটী, ইসলামপুর, হাওড়া, ১৩৭৫ বৈশাখ ১৭।

ধর্ম ও বিশ্বশান্তি। প্রবর্ত্তক, ১৩৭৫ বৈশাখ, পৃ. ৯-১২।

পত্র। শিক্ষাসত্র পত্রিকা (সাহিত্য বুলেটিন) ১ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ১৩৭৫ আষাঢ় ১।

১৯৬৯ ॥ ১৩৭৫

সভামুখ্যর ভাষণ (৮ই পৌষ বিশ্বভারতীর প্রতিষ্ঠা দিবসে)। **—Visva-Bharati News, 1969 January, P. 179-83.**

মাঘোৎসব। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭৫ মাঘ ১ ও ১৬, পৃ. ২২৬-৩১।

১৯৬৯ ॥ ১৩৭৬

রবীন্দ্রনাথের গান : কালক্রমিক সূচী।

প্রথমখণ্ড। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ভুবননগর, বোলপুর। মুদ্রাকর শ্রীকালীপদ মুখোপাধ্যায়, নিউ আর্ট প্রেস, শান্তিনিকেতন রোড, বোলপুর। প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৩৭৬। মোট পৃষ্ঠা ৩৮। মূল্য ১.৫০।

গ্রন্থকার লিখেছেন— "রবীন্দ্ররচনাবলীর উৎস-সন্ধানের উদ্দেশ্যে কবি জীবনের ঘটনা ও রচনার যে বিরাট তালিকার খসড়া করেছি, এই গানের তালিকাকে তারই চুম্বক বলা যেতে পারে। গীতবিতানে ভাবের অনুষঙ্গতা রক্ষা করে কবি স্বয়ং তাঁর গানের শ্রেণীকরণ করেন। আমরা এখানে কবির যে-বয়সে যা রচিত, তারই তালিকা প্রস্তুত করেছি। ১২৮১ থেকে ১২৯১ [১৮৭৫-১৮৮৪] অর্থাৎ ১৩ বৎসর হতে ২৩ বৎসর পর্যন্ত ৩২০টি গানের তথ্যাদি এই খণ্ডে দিয়েছি।"

এই গ্রন্থের পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' নামে প্রকাশিত (১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০)।

রবিচ্ছায়া। কালি ও কলম, ১৩৭৬ বৈশাখ, পৃ. ১০০৭-১০২২।

ছেলেমেয়েদের সেই চোখ যেন খোলে। 'শিশুমেলা' শারদীয়া সংখ্যা (তিলুটী, বীরভূম) ১৩৭৬, পৃ. ৫।

শিক্ষাসত্র ও বুনিয়াদী বিদ্যালয়। —Gandhi Centenary Volume, 1969, Visva-Bharati, P. 182-192.

অনুবাদ। বসুমতী, ১৩৭৬ শারদীয়া, পৃ. ৩৯-৪২।

১৯৭০ ॥ ১৩৭৭

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক।

প্রথম খণ্ড (১৮৬১-১৯০১)। চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ ১৩৭৭। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগ। ৫ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন, কলিকাতা-৭। মুদ্রাকর শ্রীগোপাল চন্দ্র রায়, নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ। কলিকাতা ১৩। মোট পৃষ্ঠা ৬১৪। মূল্য ত্রিশ টাকা।

উৎসর্গ— "দাদা মহিতকুমার, ভ্রাতা সুহৃৎকুমার (সু), ভগ্নী কাত্যায়নী (কাতু)র স্মরণে।"

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। গল্পভারতী, ১৩৭৭ বৈশাখ, পৃ. ৯৬৯-৭৫। জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১১১১-১৮। আষাঢ়, পৃ. ১৮-২৪। শ্রাবণ, পৃ. ১৭১-৭৬। ভাদ্র, পৃ. ২৯৭-৩০২। কার্তিক, পৃ. ৪০৭-১২। অগ্রহায়ণ, পৃ. ৫২৫-৩০। পৌষ, পৃ. ৬২৯-৩৭। মাঘ, পৃ. ৭৫৩-৫৮। ফাল্গুন, পৃ. ৮৫৫-৬০। চৈত্র, পৃ. ৯৬১-৬৩।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। সাপ্তাহিক বসুমতী, ১৯৭০ মে ৭। পৃ. ২৮৬০-৬২।

গান্ধীজী ও শান্তিনিকেতন (১৯১৫)। বেতার জগৎ, ১৯৭০ জুন ২২, পৃ. ৫৬৫-৬৬।

কবির নির্মম আদেশ। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, ১৩৭৭ কবিস্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ১৫-১৬।

সাতই পৌষেই মেলা। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, ১৩৭৭ শীত-সংখ্যা, পৃ. ১৬-১৮।

১৯৭০ ॥ ১৩৭৭

বাংলার লোকসংস্কৃতি। পশ্চিমবঙ্গ, ৫ম বর্ষ, ১৩৭৭ পৌষ ১৬।

১৯৭১ ॥ ১৩৭৭-৭৮

দীনবন্ধু এণ্ডরুজ। বিশ্বভারতী পত্রিকা, ১৩৭৭ মাঘ-চৈত্র, পৃ. ২৩৫-৩৮।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। গল্পভারতী, ১৩৭৮ বৈশাখ পৃ. ১০৪৩-৫০। জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১১৫৯-৬৪। আষাঢ়, পৃ. ৩২ ৪৮। শ্রাবণ, পৃ. ১৭৮-৮২। ভাদ্র, পৃ. ২৮১-৮৮। অগ্রহায়ণ, পৃ. ৫১২-১৬। পৌষ, পৃ. ৬৭০-৭৬। ফাল্গুন, পৃ. ৮৫৩-৫৮।

স্টিফেন ফিলিপস ও রবীন্দ্রনাথ। কালি ও কলম, ১৩৭৮ বৈশাখ, পৃ. ১১৪৯-৫৯।

রামমোহনের 'বেদান্ত-প্রতিপাদ্যধর্ম' ও দেবেন্দ্রনাথের 'ব্রাহ্মধর্ম'। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৭৮ ভাদ্র ১-১৬, পৃ. ১১২-২৩।

রথীন্দ্র-স্মৃতি। দ্র. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত 'পিতৃস্মৃতি' (জিজ্ঞাসা। কলিকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৭৮) গ্রন্থ। পৃ. ৩০৯-৩১২।

রবীন্দ্রনাথের 'ইচ্ছাপূরণ' গল্পের উৎস। কালি ও কলম, ১৩৭৮ পৌষ, পৃ. ৮৪৯-৫১।

১৯৭২ ॥ ১৩৭৮-৭৯

শুভেচ্ছা-বাণী। শান্তিনিকেতন পাঠভবন : প্রাক্তন ও বর্তমান

১৯৭২ ॥ ১৩৭৮-৭৯

পুনর্মিলন উৎসবের মুখপত্র, ১৩৭৮ মাঘ।

পশ্চিমবঙ্গের নামকরণ প্রসঙ্গে (পত্র)। আনন্দবাজার, ১৩৭৮ চৈত্র ২৩।

রবীন্দ্রনাথ ও কৃত্তিবাস। কৃত্তিবাস সাহিত্য পরিষদের মুখপত্র 'স্মরণিকা', ১৩৭৯ বৈশাখ।

রবীন্দ্রনাথ (স্মরণীয় সাক্ষাৎকার)। গল্পভারতী, ১৩৭৯ বৈশাখ, পৃ. ৩-৪।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। গল্পভারতী, ১৩৭৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ১০৫৪-৬১। আষাঢ়।

সূর্য চক্রবর্তী। **Visva-Bharati News, 1972 May, P 266.**

ষাট বৎসরের পুরাতন স্মৃতিকথা। মাসিক বাঙলাদেশ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা, ১৩৭৯ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৯-১১।

রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য।
প্রকাশক রণজিৎ রায়। বিশ্বভারতী ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা ১৬। মুদ্রাকর শ্রীনারায়ণ লাহিড়ী। লয়াল আর্ট প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড, ১৬৪ লেনিন সরণি। কলিকাতা ১৩। প্রকাশ জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৯। মোট পৃষ্ঠা ৫১৬। মূল্য—বারো টাকা; শোভন সংস্করণ পনেরো টাকা।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। মাসিক বসুমতী, ১৩৭৯ আষাঢ়, পৃ. ৪৩১-৩৭। শ্রাবণ, পৃ. ৬১-৩৭।

১৯৭২ ॥ ১৩৭৯

সুরেন্দ্রনাথ ও বিশ্বভারতী। সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর শতবার্ষিক সংকলন, ১৯৭২ জুলাই ১৫, পৃ. ১২২-২৪।

প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ (১৮৯৩ জুন ২৯—১৯৭২ জুন ২৮)। —**Visva-Bharati News, 1972 July-August, P. 3-4.**

সুধীরচন্দ্র করকে আশীর্ব্বাদ। দ্র. সুধীরচন্দ্র কর লিখিত 'জনগণ-মন-অধিনায়ক' গ্রন্থ (সেপ্টেম্বর ১৯৭২), পৃ. [১১]।

দার্জিলিঙে নানা পথে চারবার (স্মৃতিকথা)। মাসিক বাঙলাদেশ, ১৩৭৯ শ্রাবণ, পৃ. ১৮১-৮৪। ভাদ্র, পৃ. ২৬৯-৭৩।

'পশ্চিমবঙ্গ' পত্রিকা প্রসঙ্গে (পত্র)। পশ্চিমবঙ্গ, ১৯৭২ সেপ্টেম্বর ২২, পৃ. ১৭২।

একখানি শুভেচ্ছা-লিপি। আমাদের ত্রিপুরা, ১৩৭৯ শ্রাবণ, পৃ. ৫৯।

তর্জমা একাডেমি। লা-পয়েজি, ১৩৭৯ শারদ-সংকলন, পৃ. ৪০৩-৪০৬।

১৯৭৩ ॥ ১৩৭৯-৮০

কবির সঙ্গে ভ্রমণ (স্মৃতিকথা)। মাসিক বাঙলাদেশ, ১৩৭৯ পৌষ, পৃ. ৬৬৫-৬৬, ৭৪৪-৪৫। মাঘ, পৃ. ৭৭৩-৭৬, ৭৮।

১৯৭৩ ॥ ১৩৭৯-৮০

রবীন্দ্রজীবনীকারের আশীর্বাণী (প্রবীরকুমার দেবনাথ ও দিলীপ কুমার দত্তকে)। উদয়ন, ১ম বর্ষ ১ম সংকলন, ১৩৭৯ ফাল্গুন।

শান্তিনিকেতনে বসন্তোৎসব। দেহাত, ১৩৮০ বৈশাখ।

বলরাজ সাহানী স্মরণে। উদয়ন, ১৩৮০ বৈশাখ।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। গল্পভারতী, ১৩৮০ বৈশাখ, পৃ. ৫২৩।

অপরাধী রামমোহন। কালি ও কলম, ১৩৮০ বৈশাখ, পৃ. ১১৪৭-৫১।

ফ্যাসিষ্ট বিরোধী রবীন্দ্রনাথ। মাসিক বাংলাদেশ, ১৩৮০ বৈশাখ, পৃ. ১০১৬।

কবিতা না গান (শ্রীনীহারবিন্দু সেনকে পত্র)। গীতবিতান পত্রিকা, ১৩৮০ বৈশাখ।

ধর্মের রূপান্তর। সাহিত্য ও সংস্কৃতি, ১৩৮০ বৈশাখ-আষাঢ়, পৃ. ২৩-২৪।

আশীর্বাণী (শ্রীবরুণ রায়কে)। দেহাত, ১৩৮০ জ্যৈষ্ঠ।

অনাদিকুমার। দ্র. শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার (সত্তর বৎসর-পূর্তি উপলক্ষে শ্রদ্ধার্ঘ্য। ইন্দিরা সংগীত-শিক্ষায়তন কর্তৃক প্রকাশিত। জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০)। পৃ. ৪০-৪১।

গীতবিতান: কালানুক্রমিক সূচী।

প্রথম খণ্ড (১৮৭৫-১৯১১ মে ১৪)। প্রকাশক প্রভাত

১৯৭৩ ॥ ১৩৮০

কুমার মুখোপাধ্যায়, বোলপুর-শান্তিনিকেতন। মুদ্রাকর শ্রীগোকুলানন্দ দাস, উদয়ন প্রেস, বোলপুর। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত দ্বিতীয় সংস্করণ, ১৩ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৮০। মোট পৃষ্ঠা ২৩২। মূল্য আট টাকা মাত্র।

উৎসর্গ— "রবীন্দ্রসঙ্গীতের সার্থক ধারক ও বাহক পরম স্নেহভাজন শ্রীঅনাদিকুমার দস্তিদার ও শ্রীশান্তিদেব ঘোষ-এর হস্তে গ্রন্থখানি অর্পিত হইল। ...২৫ বৈশাখ ১৩৮০।"

'ভূমিকা'য় রবীন্দ্রনাথের গীত-গ্রন্থ সম্পর্কে আলোচনা আছে। এছাড়া 'রবীন্দ্র-গ্রন্থের গীতসংখ্যা'র তালিকাটিও মূল্যবান সংযোজন।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের খোলা চিঠি। গণশক্তি, ১৯৭৩ জুন ১৪।

Rammohan and Tolstoy (English Translation by Kshitish Roy). —Mainstream, 1973 June.

জনতা ও রবীন্দ্রনাথ। ধূসরমাটি, ১৩৮০ শ্রাবণ।

পাঠভবন আশ্রম-সম্মিলনীর সম্বর্ধনার প্রত্যুত্তর (জুলাই ২৭)। **—Visva-Bharati News, 1973 August, P. 25-26** দ্র. স্মৃতি। পাঠভবনের চিঠি, ১৩৮০ পৌষ-চৈত্র।

উদ্বোধনী ভাষণ (বীরভূম বর্ধমান ডেলীপ্যাসেঞ্জারস্ এসোসিয়েশন-এর প্রথম সম্মেলনে)। স্মারক-পুস্তিকা, ১৯৭৩ ডিসেম্বর ২।

১৯৭৩ ॥ ১৩৮০

ধর্ম ও বিশ্বশান্তি। শারদীয়া ময়ূরাক্ষী, ১৩৮০ পৃ. ১৯-২৩।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ভারতকোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪০৫-৭।

শান্তিনিকেতন। ভারতকোষ (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ), ৫ম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮-৮৯।

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আশীর্বাণী (৩ পৌষ ১৩৮০)। দ্র. যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়: গ্রন্থাগার বিজ্ঞান শিক্ষণ বিভাগ ও গ্রন্থাগারের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত আলোচনা-চক্রের স্মরণিকা। পৃ. ২৫-২৬।

১৯৭৪ ॥ ১৩৮০-৮১

'পল্লীশ্রী' পত্রিকা প্রসঙ্গে। পল্লীশ্রী, ১৩৮০ পৌষ ২৬।

কবি ও নোবেল পুরস্কার। সন্দেশ, ১৩৮০ পৌষ, পৃ. ৫৬৭-৬৮।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। গল্পভারতী, ১৩৮০ মাঘ, পৃ. ৫০-৫৬। চৈত্র, পৃ. ৪০-৪২।

চিঠি (ভূইয়া ইকবালকে)। অস্তিকা (দ্বিমাসিক বাংলা সাহিত্য পত্রিকা চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ), ১৩৮০ চৈত্র।

চিঠি (সম্পাদককে)। মাসিক বাঙলাদেশ, ১৩৮১ বৈশাখ।

ইতিহাস কথা হয়। সন্দেশ, ১৩৮১ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫০-৫২। শ্রাবণ, পৃ. ৫১।

১৯৭৪ ॥ ১৩৮১

দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের চিঠি (শ্রীরমানাথ সিংহকে)। দৈনিক চন্দ্রভাগা, ১৯৭৪ জুলাই ৯, পৃ. ২।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। মাসিক বাঙলা দেশ, ১৩৮১ শ্রাবণ, পৃ. ১৭৪। ভাদ্র।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। সপ্তাহ, ৮ম বর্ষ ৩য় সংখ্যা, ১৯৭৪ আগষ্ট ৩০। ৪র্থ—৬ষ্ঠ সংখ্যা (ধারাবাহিক), সেপ্টেম্বর।

রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে। লা-পয়েজি, ১৩৮১ শ্রাবণ-আশ্বিন, পৃ. ৩৯৫।

আশীর্বাণী। ঝরা বকুল, ১৩৮১ শারদীয়া।

আপন কাজে অচল হলে চলবে না। ময়ূরাক্ষী, ১৩৮১ শারদীয়া, পৃ. ২৪।

কিছু কথা। ধূসর মাটি, ১৩৮১ শারদ সংকলন, পৃ. ১৪।

ফিরে ফিরে চাই (স্মৃতিকথা)। মাসিক বাঙলাদেশ, ১৩৮১ অগ্রহায়ণ, পৃ. ৪৯৭। পৌষ, পৃ. ৫৬৯।

১৯৭৫ ॥ ১৩৮১-৮২

রবীন্দ্রজননী সারদাদেবী। অমৃত, ১৫ বর্ষ, ১৪ সংখ্যা, পৃ. ১৯- ০।

১৯৭৫ ॥ ১৩৮১-৮২

Life of Tagore.

Translated by Sisirkumar Ghosh from 'Rabindra Jivan-Khata'. Published by Indian Book Company, 36 C, Connaught Place, New Delhi 110001 and printed at Dhawan printing Works, 26-A, Mayapuri, Phase 1, New Delhi 11027. Total Page 208. Price Rs. 35-00.

In memory of C. F Andrews, W. W. Pearson, L. K. Elmhirst.

ময়ূরাক্ষী সম্পর্কে। ময়ূরাক্ষী, ১৩৮১ মাঘ ৯, পৃ. ৬।

সুভাষচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ। দক্ষিণী বার্তা, ১৩৮১ মাঘ (নেতাজী সংকলন), পৃ. ৯৩।

স্মৃতি-তর্পণ। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু 'শ্রদ্ধাঞ্জলি' পুস্তিকা, ১৩৮১ আষাঢ় ৭।

মনে পড়ে। শারদীয়া সাহিত্যরূপা, ১৩৮১, পৃ. ক/১-৪।

গ্রন্থ-সমালোচনা (অমিত্রসূদন ভট্টাচার্যের 'বঙ্কিমচন্দ্র-কৃত সাহিত্য সমালোচনা : দুষ্প্রাপ্য রচনা সংগ্রহ' গ্রন্থের)। দেশ, ২০ ডিসেম্বর ১৯৭৫, পৃ. ৫৯৯-৬০০।

১৯৭৬ ॥ ১৩৮২-৮৩

প্রিয় সম্পাদক। দক্ষিণী বার্তা, ১৩৮২ পৌষ ১৩।

ভূমিকা (উপনিষদ, দ্বিতীয় খণ্ড / দ্বিতীয় সংস্করণ, হরফ প্রকাশনী জানুয়ারী ১৯৭৬)। দ্র. পৃ. [২০]-[৩০]।

১৯৭৬ ॥ ১৩৮২-৮৩

রাখি-বন্ধন। দক্ষিণী বার্তা, ১৩৮২ (নেতাজী সংকলন), পৃ. ৪৯-৫০।

প্রশান্তচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গে। দেশ, ১৯৭৬ মার্চ ৬, পৃ. ৬৭৩-৭৭। মে ১, পৃ. ৪৫-৪৮। জুন ২, পৃ. ৪৬৭-৭০। সেপ্টেম্বর ৪, পৃ. ৪২৭-২৯।

ওঁ মণিপদ্মে হুঁ। উদয় অভিযান (বর্ধমান), ২৫ জুন ১৯৭৬।

কি গান গাব যে (স্মৃতিকথা)। দক্ষিণী বার্তা, ১৩৮৩ শারদীয়া, পৃ. ১৫-২৬।

একটি কাহিনী। গল্পভারতী, ১৩৮৩ শারদীয়া, পৃ. ৩৫১-৫৪।

অভিমত। 'পণপ্রথা উচ্ছেদের বাস্তবপন্থা' শীর্ষক পুস্তিকা, পৃ. ১৫।

সিউড়ি মেলা ও রবীন্দ্রনাথ। বীরভূম প্রদর্শনী ও মেলা ৯৭৬-৭৭, স্মারক-পত্রিকা।

'চেতনিক' সম্পর্কে অভিমত। চেতনিক, ৪র্থ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, ১৯৭৬-৭৭।

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৩-৮৪

অমল হোম। —**Calcutta Municipal Gazette, 13 January 1977.**

নবজ্ঞান ভারতী (ভৌগোলিক)।

প্রথম খণ্ড। 'অ'—'ঝ'। প্রকাশক শ্রীমদন সিংহ, সাক্ষরতা প্রকাশন। বিদ্যাসাগর সাক্ষরতা ভবন, ৬০

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৩

পটুয়াটোলা লেন, কলিকাতা-৯। মুদ্রাকর শ্রীঅভয় সাহা মণ্ডল। ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্ট প্রেস। ১৭৩, রমেশ দত্ত স্ট্রীট কলিকাতা-৬। দ্বিতীয় সংস্করণ (প্রথম সাক্ষরতা সংস্করণ) ২রা ফাল্গুন, ১৩৮৩। মোট পৃষ্ঠা ৩৫৯। মূল্য— দুই খণ্ডে একত্রে ২৫ টাকা; গ্রাহক-মূল্য ১৮ টাকা।

Life of Tagore.

Translated by Sisir Kumar Ghosh From 'Rabindra Jivan-Katha' Second paper-back edition, 1977. Published by Hind Pocket Books (P.) Ltd. G.T. Road, Delhi 110032. Printed in India at I.B.C. Press. G.T. Road, Delhi 110032. Total Pages 264. Price Rs. 8/-.

রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য-প্রবেশক।

দ্বিতীয় খণ্ড (১৯০১-১৯১৮)। প্রকাশক রণজিৎ রায়। বিশ্বভারতী। ১০ প্রিটোরিয়া স্ট্রীট, কলিকাতা ৭১। মুদ্রাকর শ্রীসুনীলকৃষ্ণ পোদ্দার। শ্রীগোপাল প্রেস। ১২১ রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট। কলিকাতা-৪। পরিবর্ধিত চতুর্থ সংস্করণ, চৈত্র ১৩৮৩। মোট পৃষ্ঠা ৬৮৭। মূল্য পঞ্চাশ টাকা।

উৎসর্গ— "প্রয়াত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও প্রয়াতা প্রতিমা দেবী স্মরণে। / এই গ্রন্থখণ্ড স্নেহের ও শ্রদ্ধার নিদর্শন-স্বরূপ শ্রীপুলিনবিহারী সেন শ্রীকানাই সামন্ত/

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৩-৮৪

শ্রীশোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়/ করকমলে অর্পণ করিলাম। ৬ ভাদ্র ১৩৮৩।"

ভূমিকা (দিলীপ মজুমদারের 'বন্দীহত্যা বন্দীমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থের)। ৭ মে ১৯৭৭।

ইতিহাস কেমন করে লেখা হল। কল্লবাণী, ১৩৮৪ জ্যৈষ্ঠ, পৃ. ৫-৬।

'অভিনব অগ্রণী' প্রসঙ্গে। অভিনব অগ্রণী, ১৩৮৪ শ্রাবণ।

'ছন্দোবতী' সাংস্কৃতিক সংস্থা প্রসঙ্গে (তপনকুমার দেবনাথ স্নেহভাজনেষু)। ১ ভাদ্র ১৩৮৪। দ্র. সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত "কবিগুরুর গানে পূজার্চনা"।

মানবধর্মের উপাসক রাজা রামমোহন। বীরভূমের কথা, ১৯৭৭ সেপ্টেম্বর ২৫।

শ্রীনিকেতন ও গ্রামসেবা। বীরভূমি, ১৩৮৪ শারদ সংকলন, পৃ. ৫০-৫১।

নবাগত সাহিত্যসেবীদের উদ্দেশে। তীর্থভূমি, ১৩৮৪ শারদ সংকলন, পৃ. ৬-৭।

একটি প্রস্তাব। শারদীয়া চন্দ্রভাগা ১৩৮৪, পৃ. ২-৩।

জাতীয় জীবনে বিস্মৃত একটি দিন। সপ্তাহ, শারদীয় ১৩৮৪, পৃ. ৭১-৭৩।

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৪

গ্রন্থ-সমালোচনা (অতুলপ্রসাদ সেনের 'শতাব্দীর সাধনা' গ্রন্থের)। রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা, ১৩৮৪ কার্তিক-পৌষ, পৃ. ৩৫৭।

রথীন্দ্রস্মৃতি। 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকা, ১৩৮৪ অগ্রহায়ণ ১৩।

রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর (রথীন্দ্রনাথের জন্মদিনে কথিত)। —Visva-Bharati News, 1977 December, P. 63-65.

শুভেচ্ছা-বাণী। জঙ্গীপুর সংস্কৃতিমেলা স্মারক-গ্রন্থ, ১৩৮৪।

শুভেচ্ছা-বাণী। পটভূমি রজতজয়ন্তী স্মারক সংখ্যা, ১৩৮৪ পৌষ ৫।

নোবেল পুরস্কার প্রাপকগণ ও রবীন্দ্রনাথ। দৈনিক বসুমতী, ১৩৮৪ পৌষ ৯।

সেকালের পৌষমেলা। বীরভূমের কথা, ১৯৭৭ পৌষমেলা সংখ্যা, পৃ. ১-২।

১৯৭৮ ॥ ১৩৮৪

চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য।

প্রকাশক শ্রীখগেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী, সম্পাদক বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ, কলিকাতা-৭০০০৩২। মুদ্রাকর উপেন্দ্রমোহন বিশ্বাস, আই. এন. এ. প্রেস, কলিকাতা ৭০০০৩২। প্রথম প্রকাশ পউষ ১৩৮৪। জানুয়ারি ১৯৭৮। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষাপরিষদ কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মোট পৃষ্ঠা ২১৮। মূল্য পনের টাকা।

১৯৭৮ ॥ ১৩৮৪-৮৫

নিকোলাস রোএরিখ ও রবীন্দ্রনাথ দেশ, ১৩৮৪ পৌষ ২৩, পৃ. ১১-১৫। দ্র. হিমপ্রস্থ (হিন্দী অনুবাদ), ১৯৭৮ এপ্রিল, পৃ. ৪১।

শুভেচ্ছাবাণী। **Santiniketan Sanphilex exhibition '78/Souvenir.**

বোলপুর দোলমেলা ও যুব উৎসব। পলাশ, ১৩৮৪ ফাল্গুন।

শ্রদ্ধাঞ্জলি। বিশ্বনবী স্মরণিকা, শম্ভুনাথ কলেজ, লাভপুর ১৯৭৮ এপ্রিল, পৃ. ৭।

ফিরে ফিরে চাই।

প্রথম খণ্ড। প্রকাশক এস. এন. রায়। মিত্র ও ঘোষ প্রাঃ লিমিটেড, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। মুদ্রাকর পি. কে পাল, সারদা প্রেস, ৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট, কলিকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ বৈশাখ ১৩৮৫। মোট পৃষ্ঠা ২৯০। মূল্য ষোলো টাকা।

সুখে দুঃখে সমে কৃত্বা। দেশ, ১৩৮৫ সাহিত্য সংখ্যা, পৃ ৫৭-৬২।

পঙ্কজ [মল্লিক] স্মরণে। রবীন্দ্রভাবনা, ১৯৭৮ এপ্রিল, পৃ. ৩১।

শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগার ও রবীন্দ্রনাথ। গল্পভারতী, ১৩৮৫ রবীন্দ্র-সংখ্যা, পৃ. ২।

বিশ্বভারতী ও রবীন্দ্রনাথের বিশ্ববোধ। পশ্চিমবঙ্গ, ১৩৮৫ বৈশাখ ২৫ (রবীন্দ্রসংখ্যা), পৃ. ৯৪৯-৯৫১।

১৯৭৮ ॥ ১৩৮৫

নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। স্মরণিকা, ১৩৮৫ আষাঢ় ৩।

ভূমিকা ('ধম্মপদ' গ্রন্থের। হরফ প্রকাশনী, ২৯ শ্রাবণ ১৩৮৫)। পৃ. ৯-১২।

জীবনের পাঠশালা। পরিচয়, ১৩৮৫ শ্রাবণ, পৃ. ১৫০।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ শতবার্ষিকী। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৮৫ শ্রাবণ-আশ্বিন (৭-১২ সংখ্যা)।

দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের শুভেচ্ছা। দ্র. বোলপুর সংস্কৃতি পরিষদ : শুভ-উদ্বোধন অনুষ্ঠান (৩০ আগষ্ট ১৯৭৮), পৃ. ২।

কবিকে প্রথম দেখা। শারদীয়া সত্যযুগ, ১৩৮৫ আশ্বিন, পৃ. ১৪-১৮।

আশীর্বাণী (জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়ের 'মহাপ্রহরী রবীন্দ্রনাথ' গ্রন্থে)। মহালয়া ১৩৮৫, পৃ. V.

সাংবাদিকের ধর্ম। শারদীয়া পল্লীশ্রী, ১৩৮৫।

আশীর্বাণী। তীর্থভূমি, ১৩৮৫ শারদ সংকলন, পৃ. ১।

প্রান্তিক। শারদীয়া প্রান্তিক ১৩৮৫, পৃ. ১৫-১৬।

শান্তিনিকেতন থেকে। শারদীয়া সাহিত্যরূপা ১৩৮৫, পৃ. ১-২।

হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবী। মিত্রাঞ্জলি, শারদ অর্ঘ্য ১৩৮৫ আশ্বিন-কার্তিক, পৃ. ১৯-২০।

১৯৭৯ ॥ ১৩৮৫-৮৬

প্রথম ভ্রমণ। কদমখণ্ডী, ১৩৮৫ পৌষ ২৮, পৃ. ১-৬।

অবিস্মরণীয় কেদারনাথ দাশগুপ্ত। কথাসাহিত্য, ১৩৮৫ মাঘ, পৃ. ৪৫৯-৪৬৬।

বোলপুর দোলমেলা। পলাশ, ১৩৮৫ ফাল্গুন।

রাজধানী। অঙ্গিরা, ১৩৮৬ বৈশাখ, ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা পৃ. ৯-১২।

আশীর্বাণী (প্রাণকৃষ্ণ দেবনাথকে পত্র)। রবীন্দ্রায়ণ, কবিপ্রণাম সংখ্যা ১৩৮৬।

বোলপুর উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষপূর্তি প্রসঙ্গে। দ্র. শতবর্ষ স্মারক-পত্র (১৮৭৮-১৯৭৮)। ১৩৮৬ বৈশাখ, পৃ. ২ (খ)।

বিদ্রোহ ও বিপ্লব—রবীন্দ্র সাহিত্যে। সপ্তাহ, ১৯৭৯ মে ৪, পৃ. ৩-৪।

বিশ্বভারতী গ্রন্থাগার প্রাকপর্ব। প্রাতিস্বিক, ১৩৮৬ কবিপক্ষ সংকলন।

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি।

জাতীয়গ্রন্থ-২। প্রকাশক খগেন্দ্রমোহন চক্রবর্তী। সম্পাদক বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, কলিকাতা। মুদ্রণে— আই. এন. এ. প্রেস, যাদবপুর। প্রথম প্রকাশ: জুলাই ১৯৭৯। মোট পৃষ্ঠা ৩২। মূল্য আট টাকা।

১৯৭৯ ॥ ১৩৮৬

বাঙ্গালীমাত্রই বসুমতী সাহিত্য মন্দিরের কাছে কৃতজ্ঞ। (বসুমতী শুভার্থী সম্মেলনে কথিত)। দৈনিক বসুমতী, ১৯৭৯ সেপ্টেম্বর ৫।

বিদ্রোহ ও বিপ্লব। ঘরোয়া, ১৩৮৬ শারদীয়া।

জন্মদিনে। তীর্থভূমি, ১৩৮৬ শারদ সংকলন, পৃ. ১।

ব্রাহ্মসমাজ কোথায় যাচ্ছে। তত্ত্বকৌমুদী, ১৩৮৬ আশ্বিন (১-১৬) —কার্তিক (১-১৬)। পৃ. ৮৫-৮৬।

'জীবন-পঞ্জী'র উত্তর-টীকা

১ শান্তিনিকেতন থেকে রবীন্দ্রনাথ লিখছেন— "…সংসারের অভাব মোচনের সংকল্প লইয়া তোমাকে আশ্রম ত্যাগ করিয়া যাইতে বাধ্য হইতে হইয়াছে। ইহার মধ্য দিয়া ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করিবেন সন্দেহ নাই। কর্তব্যের কঠিন পথে চলিতে গিয়া তুমি মানুষ হইয়া উঠিবে।… তুমি যে সংসারের সংগ্রামক্ষেত্রে কোমর বাঁধিয়া প্রবেশ করিয়াছ ইহাতে আমি খুসি হইয়াছি। তোমার জীবনতরীর সমস্ত পালগুলি উৎসাহের সহিত আকাশে তুলিয়া দাও—তাহাতে ঈশ্বরের প্রসাদবায়ু লাগিতে থাক্—পূর্ণবলে নির্ভয়চিত্তে সুখদুঃখের সমস্ত ঢেউ কাটাইয়া বন্দরের দিকে চলিয়া যাও। সংসারের উত্থান-পতন আছেই—অনেক আশায় হতাশ হইতে হইবে—অনেক প্রতিকূলতা তোমাকে আক্রমণ করিবে—কিন্তু অন্তর যদি পূর্ণ থাকে তবে আর ভয় নাই—সকলের চেয়ে বড় যিনি তাঁহার হাতে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ কর তাহা হইলে অন্তরে বাহিরে ছোটর হাত হইতে রক্ষা পাইবে।

এই আশ্রমের আশীর্ব্বাদ তোমার উপর রহিল ইহা নিশ্চয় জানিবে। ইতি—২৯শে জ্যৈষ্ঠ ১৩১৭।"

২ "আমাদের এই আশ্রমবাসী আমার একজন তরুণ বন্ধু এসে বললেন, 'আজ আমার জন্মদিন; আজ আমি আঠারো পেরিয়ে উনিশ বছরে পড়েছি।'

তাঁর সেই যৌবনকালের আরম্ভ, আর আমার এই প্রৌঢ়বয়সের প্রান্ত—এই দুই সীমার মাঝখানকার কালটিকে কত দীর্ঘ বলেই মনে হয়।…

…আমার পরিণত বয়সের সমস্ত অভিজ্ঞতা ও চিত্তবিস্তার সত্ত্বেও আমি আমার উনিশ বছরের বন্ধুটিকে তাঁর তারুণ্য নিয়ে অবজ্ঞা করতে পারি নে। বস্তুত তাঁর এই বয়সে যত অভাব ও অপরিণতি আছে, তারাই সব চেয়ে বড়ো হয়ে আমার চোখে পড়ছে না;

এই বয়সের মধ্যে যে একটি সম্পূর্ণতা ও সৌন্দর্য আছে, সেইটেই আমার কাছে আজ উজ্জ্বল হয়ে দেখা দিচ্ছে।...

আমার তরুণ বন্ধুর জন্মদিনে...আমি দেখছি, তিনি একটি বয়ঃসন্ধিতে দাঁড়িয়েছেন—তাঁর সামনে একটি অভাবনীয় তাঁকে নবনব প্রত্যাশার পথে আহ্বান করছে।" —দ্র. পূর্ণ (শান্তিনিকেতন)। রবীন্দ্র-রচনাবলী ১৫, পৃ. ৪৭৯।

ওঁ

৩ প্রভাতের পরে দক্ষিণ করে
রবির আশীর্বাদ—
নূতন জনমে নব নব দিন
তোমার জীবন করুক নবীন,
অমল আলোকে দূরে হোক্ লীন
রজনীর অবসাদ।

১১ই শ্রাবণ
১৩২১

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শান্তিনিকেতন

৪ "...ইংরেজি পড়াইবার, লাইব্রেরি দেখিবার লোকের দরকার। আপাতত আমিই পড়াইতেছি। আমার পড়ানোর প্রণালী কঠিন, কাহাকেও তৈরি করিয়া লইতে চাই। নূতন লোককে সহসা ডাকিতে সাহস হয় না। তাই ভাবিয়াছিলাম তোমাকে তৈরি করিয়া লইব।... একবার দুই একদিনের জন্য যদি আসিতে পার তবে বিস্তারিত আলোচনা সম্ভব হয়। আমার সময় অতি অল্প।"

৫ সুধাময়ী দেবী ১৮৯৬ সালের ২ জুলাই কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। পিতা বিশিষ্ট দার্শনিক পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ। ১৯১৭ সালে বেথুন কলেজ থেকে কৃতিত্বের সঙ্গে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

শিক্ষকতা শুরু করেন ব্রাহ্মবালিকা বিদ্যালয়ে। তারপর কিছুকাল গিরিডিতেও শিক্ষকতা করেন। শান্তিনিকেতন শিক্ষাভবন ও পাঠ-ভবনেও অধ্যাপনা করেন কিছুকাল। বিশ্বভারতীর সূচনাপর্বের ছাত্রী। বোলপুর উচ্চবালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাত্রী ও প্রধান শিক্ষয়িত্রী (১৯৩৫-১৯৫৪)। শান্তিনিকেতন 'আলাপিনী' মহিলা সমিতির 'ঘরোয়া' পত্রিকার সম্পাদিকা ছিলেন। বহু পত্র-পত্রিকার লেখিকা।

৬ রবীন্দ্রনাথ এক পত্রে কন্যা মীরা দেবীকে লিখছেন—"ভরতপুরে যাব না স্থির করেছিলুম। কিন্তু যখন কথা দিয়েছি তখন কোনোমতে কথা রক্ষা করা চাই।... ভরতপুরের কাজ সেরে অর্থ সংগ্রহের জন্য আমেদাবাদ প্রভৃতি দুই এক জায়গায় যেতে হবে।... এবার আমার সঙ্গে প্রভাতকুমার যাবে, কারণ, ভিক্ষা করা সম্বন্ধে সে নির্লজ্জ।" —চিঠিপত্র ৪, পত্র নং [৫৪]। পৃ. ১২৯।

৭ দ্র. 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য'। বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। কলিকাতা ১৯৭৮।

৮ এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—"আমাদের বিশ্বভারতীর সেবাব্রতী-গণ নিজেদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য-অনুসারে নিকটবর্তী পল্লীগ্রামের অভাব দূর করবার চেষ্টা করছেন। এদের মধ্যে একজনের নাম করতে পারি, প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি এই সম্মুখের বিস্তীর্ণ জলাশয়ের পঙ্কোদ্ধার করতে কী অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন, অনেকেই তা জানেন।" —ভুবনডাঙ্গায় জলাশয়-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কথিত। দ্র. জলোৎসর্গ। পল্লীপ্রকৃতি (১৯৬২), পৃ. ১৬৩-৬৪।

৯ রাহুল সাংকৃত্যায়ন তাঁর 'বৌদ্ধ-সংস্কৃতি' গ্রন্থখানি "বিশ্বভারতীস্থ শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়" কে উৎসর্গ করেন।

১০ অবসরগ্রহণের পর প্রভাতকুমার নিজগৃহে 'রবীন্দ্র অকাদেমী' প্রতিষ্ঠা করেন। রবীন্দ্র অকাদেমী গ্রন্থাগারই তাঁর রবীন্দ্রচর্চার কেন্দ্র। বহু রবীন্দ্রানুরাগী ও গবেষক এই অকাদেমীর মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন।

১১ "...পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রবর্তিত রবীন্দ্র পুরস্কার রাজ্যপালের অনুমতি ক্রমে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে প্রদত্ত হইল। সন ১৯৫৬-৫৭ ॥"

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিক উৎসবের সময় (১৯৬১) এই মানপত্র প্রদান করেন প্রধান মন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু। সভা অনুষ্ঠিত হয় জোড়াসাঁকোর মহর্ষিভবনে।

১২ দ্র. 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ'। ইষ্টলাইট বুকহাউস, কলকাতা। ১৯৬৩।

১৩ দ্র. 'সোভিয়েত সফর'। রাইটার্স ফোরাম, কলকাতা, ১৯৬৫।

১৪ এই ভাষণ ১৩৭০ (১৯৬৩) সালের ৫ই অগ্রহায়ণ থেকে 'অমৃত' সাপ্তাহিকে ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়।

১৫ দ্র. 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য।' বিশ্বভারতী ১৯৭২।

১৬ প্রভাতকুমারের জীবন ও রচনার বর্ষপঞ্জী (পৃ. ৪৬-৬৪) সংকলন করেন বাণী বসু। এছাড়া প্রভাতকুমার সম্পর্কে কয়েকটি প্রবন্ধও এই সংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

১৭ বলা বাহুল্য, কোনো ব্যক্তিবিশেষের ক্ষেত্রে এই ধরনের সহায়তা বিরল। প্রভাতকুমার এজন্য নানাভাবে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেছেন।

এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—"আমার এই গবেষণামূলক কাজে ১৯৬৮ সাল থেকে বিশ্বভারতীর সহায়তা পেয়ে আসছি—রবীন্দ্র-জীবনের তথ্যাদি সংগ্রহ ও রবীন্দ্র-চর্চায় সার্বিক সহায়তালাভের জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ দুজন রবীন্দ্র-সাহিত্যানুরাগী তরুণ সহায়ক নিয়ে কাজ করবার সুযোগ আমাকে দিয়েছেন। এই দুজন হচ্ছেন বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ ও শ্রীদিলীপ-কুমার দত্ত।··· আমার এই বয়সে এই তরুণদ্বয়ের সহায়তা ব্যতীত কাজ করা সম্ভব নয়।···" —সম্পাদকের নিবেদন, গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী, প্রথম খণ্ড। ১৯৭৩।

১৮ প্রথমদিন ভাষণদানের পর প্রভাতকুমার অসুস্থ হয়ে পড়েন। পরবর্তী ভাষণ তিনটি (লিখিত) পাঠ করেন শ্রীমানবেন্দ্র পাল। প্রভাতকুমার প্রায় কুড়িদিন পরে বোলপুর প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯ প্রভাতকুমারের অনুপস্থিতিতে তাঁর লিখিত ভাষণটি পাঠ করেন তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় এবং তিনিই প্রভাতকুমারের পক্ষে উপাধি-পত্র গ্রহণ করেন।

২০ দ্র. শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক প্রকাশিত 'আচার্যের আশীর্ভাষণ' পুস্তিকা। উদয়ন, শান্তিনিকেতন, ৭ই পৌষ, ১৩৮০। অপিচ দ্র. Visva-Bharati News, 1974 January.

২১ কলকাতায় পার্ক হোটেলে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রভাতকুমারের পক্ষে এই পুরস্কার গ্রহণ করেন তাঁর পৌত্র শ্রীসুমন্ত্র মুখোপাধ্যায়।

২২ ১৯৭৮ সালের ২৭শে জুলাই (১১ শ্রাবণ) প্রভাতকুমারের জন্মদিনে উদয়নে আয়োজিত বিশেষ এক অনুষ্ঠানে এই পুরস্কার প্রদান করেন তৎকালীন উপাচার্য শ্রীসুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়।

আশীর্বাদ । অভিনন্দন । শ্রদ্ধাঞ্জলি

ঠানদির আশীর্বাদ

কিরণবালা সেন

যবে থেকে শান্তিনিকেতনে এসেছি প্রভাতবাবুকে আত্মীয় বোলেই জেনেছি। আমার স্বামী তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। প্রভাতবাবুর রূপ এবং গুণের কথা যখনই আমার স্বামী বলতেন তখনই তাঁর কথার সুরে বেশ একটু যেন গর্বের ভাব থাকত। "প্রভাতবাবু তো পরীক্ষা দেন নি, তবে ?"—এমন কটাক্ষ যদি কখনো কেউ কোরতেন আমার স্বামী ক্রুদ্ধ হয়ে উঠতেন ; বলতেন "বহু পাস করা বিদ্বান প্রভাতের কাছাকাছিও এসে দাঁড়াতে পারে না। প্রভাতের বিদ্যা ও জ্ঞানের কি পরিসীমা আছে ?" প্রভাতবাবু আমাদের সকলেরই গর্বের জন।

প্রভাতবাবু সুধাকে যেদিন বিয়ে কোরে আনলেন তখন আমরাই তো তাকে বরণ কোরে ঘরে তুলেছিলাম। সেই প্রথম আমাদের মধ্যে একজন বিদুষী মেয়ে এল। বিদুষী বোলেই তার উপর গুরুদেবের দাবীর অন্ত ছিল না। লক্ষ্মী মেয়ে সুধা সংসারের সব কাজ সুন্দর ভাবে কোরে গুরুদেবের দাবী মিটিয়ে বিদ্যালয়ে পড়ানোর কাজেও তো সাহায্য করেছে।

আগে তো গুরুপল্লীতে সবাই আমরা এক পরিবারের মতোই থাকতাম। এখন সবাই আমরা দূরে দূরে যে যার বাড়িতে থাকি। সকলেরই বয়স যে অনেক হয়েছে, তাই পরস্পরের দেখা সাক্ষাতও কমে এসেছে। কিন্তু বাড়িতে বসে যখনি প্রভাতবাবুকে কোনো সম্মানে সম্মানিত করার খবর শুনি কতো ভাল লাগে। দূরে দূরে থাকলেও আত্মীয়তার বন্ধন কি কখনো এতোটুকু শিথিল হয় ? প্রভাতবাবু ও সুধাকে আমার আশীর্বাদ জানাই।

ঠানদির আশীর্বাদ

যারা প্রভাতবাবুর সঙ্গে দীর্ঘদিন ধোরে কাজ করেছে, প্রভাতবাবুর স্নেহ পেয়েছে, তারা আজ প্রভাতবাবুকে ভালবেসে তাঁকে শ্রদ্ধার্ঘ দেবার আয়োজন করেছে তাতে আমিও আনন্দিত। প্রভাতবাবুর কাছে শেখা পদ্ধতিতে তারা কর্মপথে এগিয়ে চলুক—এই আমার আশীর্বাদ।

জ্ঞানযোগী

হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

পুরোনো দিনের প্রবাসী পত্রিকার কথা যাঁদের মনে আছে তাঁরা জানেন, ঐ পত্রিকায় এক সময় সংকলন ও সমালোচন নামে একটি বিশেষ বিভাগ ছিল। বিদেশী পত্র পত্রিকা থেকে নানা জ্ঞাতব্য বিষয় সংগ্রহ করে তার বাংলা অনুবাদ ঐ বিভাগ ছুটিতে ছাপা হত। রবীন্দ্রনাথের নির্দেশ মত শান্তিনিকেতনের কোন কোন অধ্যাপক ঐ অনুবাদকার্যের ভার নিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ নিজেই প্রসঙ্গ নির্বাচন করে দিতেন এবং প্রয়োজন মত লেখা সংশোধন করেও দিতেন। অনুবাদক-দের মধ্যে ছিলেন অজিতকুমার চক্রবর্ত্তী এবং জ্ঞানেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। প্রত্যেকটি প্রসঙ্গের তলায় লেখকের নামের আদ্য অক্ষরটি ছাপা হত—অজিতবাবুর 'অ' এবং জ্ঞানবাবুর 'জ্ঞ'। রবীন্দ্রনাথ এই নিয়ে তামাশা করে বলতেন, প্রবাসীর বড় দুর্দিন পড়েছে—যত সব 'অজ্ঞ'রা লিখতে শুরু করেছে। কিছুদিন পরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসে শান্তিনিকেতনের কাজে যোগ দিলেন এবং এঁদের সঙ্গে তিনিও পঞ্চশস্য সংগ্রহে লেগে গেলেন। তাঁর লেখার নীচে ছাপা হত 'প্র'। রবীন্দ্রনাথ পূর্বোক্ত পরিহাসের সূত্র ধরে বলেছিলেন, যাক্, প্রবাসী এবার রক্ষা পেল, অজ্ঞরা এতদিনে প্রাজ্ঞ হল। যে বয়সে এঁরা লিখতে আরম্ভ করেছিলেন সে বয়সে বেশির ভাগ মানুষ অজ্ঞই থাকেন; কিন্তু অভিনিবেশগুণে অজ্ঞরাও যে প্রাজ্ঞ হতে পারেন এঁরা তা প্রমাণ করে দিয়েছেন। বাস্তবিকপক্ষে প্রজ্ঞা জিনিষটা প্রাক্তন-জন্ম-বিদ্যা নয়, এই জীবনেই নিজগুণে তা অর্জন করতে হয়।

যখনকার কথা বলছি তখন প্রভাতদা নিতান্তই বালক, বয়স বোধ করি আঠারো উনিশের বেশী নয়। শিক্ষানবীশিটা হয়েছিল বড় ওস্তাদের হাতে, সে কথা বলাই বাহুল্য। তথাপি মনে রাখা প্রয়োজন যে লেখার ব্যাপারে শিক্ষার চাইতে চর্চা বড় কথা। কারণ ওস্তাদ শুধু ক্ষমতাকে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন কিন্তু ক্ষমতাকে আয়ত্ত করতে হয় যার যার নিজ চেষ্টায়। প্রভাতদা সেই ক্ষমতা আয়ত্ত করেছিলেন অচিরে। অনেকে জানেন না যে তাঁর প্রথম গ্রন্থ 'প্রাচীন ইতিহাসের গল্প' উনিশ বছর বয়সের রচনা, কুড়ি বছর বয়সে প্রকাশিত। স্যার যদুনাথ তার ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। কাজেই গোড়াতেই বলে নেওয়া ভাল যে প্রভাতদার বর্তমান প্রতিষ্ঠা কেবলমাত্র গুরু-কৃপায় হয় নি; এ প্রতিষ্ঠা তাঁর আপন নিষ্ঠা, উদ্যম ও অধ্যবসায় দ্বারা অর্জিত। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর অপরিসীম ঋণ তিনি কোন কালেই অস্বীকার করেন নি, কারণ লেখার হাতে-খড়ি তাঁর কাছেই হয়েছিল। তারও চাইতে বড় কথা, তাঁর কাছে সকল কাজে উৎসাহ পেয়েছেন আজীবন। বিদেশ থেকে নানা পত্র-পত্রিকা পাঠিয়ে দিতেন পড়ে দেখবার জন্য। সেই কত-কাল আগে একবার মন্তেসরী সম্পর্কে একটি চটি বই বিলেত থেকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন প্রভাতদার কাছে। সেটি অবলম্বন করে প্রভাতদা মন্তেসরী সম্পর্কে এক প্রবন্ধ লেখেন তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায়। আমাকে গর্ব করে বলেছিলেন, জ্ঞান, মন্তেসরী সম্পর্কে এ দেশে ঐ প্রথম আলোচনা। এর আগে এ দেশে কেউ তাঁর নামও শোনে নি।

যাক, যে কথা বলছিলাম। সেই যে বালক বয়সে রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাবধানে লেখার হাতে-খড়ি হয়েছিল, সেই

লেখা আজ পর্যন্ত চলে আসছে অবিশ্রান্ত গতিতে। এমন নিরলস কর্মী আমার জীবনে আমি দেখি নি। আজ অষ্টআশি বৎসর বয়সেও একটি মুহূর্ত তাঁকে অযথা ব্যয় করতে দেখা যায় না। পশ্চিমী মনীষী প্রতিভার যে সংজ্ঞা দিয়েছেন— *Capacity for taking infinite pains*—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সেই প্রতিভার জীবন্ত দৃষ্টান্ত। আমরা মানুষকে বুদ্ধিজীবী ও শ্রমজীবী—দুই ভাগে ভাগ করে রেখেছি। ধরেই নিয়েছি যে বুদ্ধি ও শ্রমের মিলন সচরাচর ঘটে না। কিন্তু দৈবাৎ কোন ক্ষেত্রে যদি ঘটে তাহলে যে কৃতকর্মা পুরুষের সৃষ্টি হয় তাঁরই নাম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় অর্থাৎ বুদ্ধি ও শ্রম সাধনার ক্ষেত্রে প্রভাতদা প্রবাদবাক্যে পরিণত হয়েছেন। প্রথম থেকেই কতগুলো শুভ যোগাযোগ ঘটেছিল। এ দেশে ডিগ্রী লাভের প্রাণপণ চেষ্টায় এত বেশী কালক্ষেপ হয় যে ডিগ্রী লাভ যদি বা হল বিদ্যালাভের অবকাশ আর হয় না। প্রভাতদার বেলায় সে দুর্দৈব ঘটে নি। তিনি প্রথমাবধি ডিগ্রীলোভহীন নিষ্কাম নির্জলা বিদ্যাচর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। এ বিষয়ে তিনি গুরুদেবের সুযোগ্য শিষ্য। তিনি কাজ করেছেন গ্রন্থাগারিকের। বসে বসে শুধু বই পাহারা দেন নি, বই পড়েছেন, পড়ে শিখেছেন এবং শিখে তা কাজে লাগিয়েছেন। কার্লাইল বলেছিলেন, লাইব্রেরীই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। প্রভাতদা সেই প্রকৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। ওদিকে অধ্যয়ন ছাড়া অধ্যাপনার কাজও তাঁকে করতে হয়েছে; কিন্তু তাই বলে গ্রন্থপরিচর্যার কাজে কোন কালে কোন ত্রুটি ঘটে নি—কারণ সকল কাজেই তাঁর সমান নিষ্ঠা। অথচ লাইব্রেরীর কাজে ট্রেনিং কিংবা পূর্বের কোন অভিজ্ঞতাও ছিল

না। ট্রেনিং-এর অভাব অভিনিবেশের দ্বারা পূরণ করেছেন। হাতে-কলমে কাজ করে গ্রন্থের যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ, যত্ন, শুশ্রূষা করেছেন। প্রত্যেকটি বইকে দেখে শুনে চোখে চিনে রেখেছিলেন। শেষ পর্যন্ত লাইব্রেরী-বিজ্ঞানে টেকনিকেল জ্ঞানও অর্জন করেছিলেন। এ দেশের গ্রন্থাগার আন্দোলনে তাঁর নিজস্ব দানও কম নয়। দীর্ঘকাল নিখিল বঙ্গ গ্রন্থাগার সমিতির সভাপতি এবং সর্বভারতীয় সমিতির সহ-সভাপতিরূপে কাজ করেছেন।

ইতিহাসের প্রতি তাঁর বিশেষ অনুরাগ ; কিন্তু অধ্যয়ন অনুশীলন কেবলমাত্র ইতিহাসেই সীমাবদ্ধ নয়—বিদ্যাচর্চার নানা শাখায় তা বিস্তৃত। প্রভাতদা সর্বসমেত ত্রিশ-বত্রিশখানা গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন, তার কোনটিই হাল্কা নয়—না বিষয়ে, না আয়তনে। এক 'রবীন্দ্রজীবনী'তেই তো এক জীবন লেগে যাওয়ার কথা। এ ছাড়া যে কার্য একক চেষ্টায় সমাধা হবার কথা নয়, সে চেষ্টাও করেছেন 'জ্ঞানভারতী' নামক বিশ্বকোষ রচনায়। বাংলাদেশে যে স্বল্পসংখ্যক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি ধর্মকর্মের ন্যায় একান্তমনে বিদ্যাচর্চায় নিযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁদের অন্যতম। ইতিপূর্বে বিশ্বভারতী তার সর্বোচ্চ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দ্বারা তাঁকে সম্মানিত করেছেন, তাঁর গুণানুরাগীদের কাছে এটিও বিশেষ তৃপ্তিদায়ক। পরেও একাধিক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি সম্মানসূচক 'ডি.লিট' উপাধি লাভ করেছেন।

দেশিকোত্তম প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শিক্ষিত বাঙালী সমাজে সুপণ্ডিত বলে পরিচিত ; কিন্তু আমাদের কাছে তাঁর পরিচয়টি অত্যন্ত ঘরোয়া ধরণের, তিনি আমাদের প্রভাতদা। প্রভাতদার এক মহৎগুণ, তাঁর বয়েস হয়েছে কিন্তু তিনি বৃদ্ধ হন নি। সকলের সঙ্গেই তিনি সমবয়সীর মত মিশতে পারেন।

পাণ্ডিত্যের সঙ্গে হৃদয়ের মিলন হলে তবে ছোট বড় সকলের সঙ্গে এমন সহজ আত্মীয়তা স্থাপন সম্ভব হয়। বয়স এবং পাণ্ডিত্য দুই-ই গুরুভার। এর যে কোন একটির ভারেই অনেককে নুয়ে পড়তে দেখি। কিন্তু দুটি মিলেও প্রভাতদাকে কাবু করতে পারে নি। সুদর্শন প্রসন্নমূর্তি—বয়সের ক্ষতচিহ্ন নেই দেহে, পাণ্ডিত্যের শুষ্ক কাঠিন্য নেই মনে। হাস্য-পরিহাসে গল্প-গুজবে লোভনীয় তাঁর সঙ্গ। প্রভাতদার সঙ্গে আমার একটি ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে। আমার পিতার সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল, সেই সুবাদে তিনি আমাকে বরাবর স্নেহের চোখে দেখেছেন। অবশ্য সেই স্নেহ তিরস্কারের ভাষাতেই বেশির ভাগ সময় প্রকাশ পায়। আমি সারাক্ষণ ঘুরে বেড়াই, যেখানে সেখানে বসে আড্ডা জমাই—এটা কোন কালেই তাঁর পছন্দ নয়। তিনি আমার এই রোগের নাম দিয়েছিলেন 'ঘুর-ঘুরে ব্যারাম'। এখনও দেখা হলেই আমাকে কুঁড়ে, অকর্মণ্য ইত্যাদি বিশেষণে ভূষিত করেন। বলা বাহুল্য তাতে আমার স্বভাবের কিছু মাত্র পরিবর্তন হয় নি। তবে এ কথাও সত্য, তাঁর তিরস্কা-রের ভাষায় আমাকে যতখানি পুরস্কৃত করেছেন এমন আর কেউ করেন নি। একবার আমাকে বলেছিলেন, জান, তোমার মত কলমের জোর থাকলে আমি বাংলাদেশকে নেড়েচেড়ে দিতে পারতাম। আমি হেসে বলেছিলাম, বাংলাদেশের চামড়া পুরু, কলমের খোঁচা তার গায়েই লাগে না, এ জন্য লেখায় আমার উৎসাহ নেই। সেই থেকে প্রভাতদা আমার আশা একেবারেই ছেড়ে দিয়েছেন। আসল কথা, প্রভাতদাই প্রকৃত-পক্ষে বাংলাদেশকে নেড়েচেড়ে দিয়েছেন। তিনি যে কাজ করে রেখেছেন তাতেই বাংলাদেশকে এখনও বহুকাল ঘুরে

ফিরে তাঁর দ্বারস্থ হতে হবে। আর কিছু না হোক, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে ভবিষ্যতে যিনিই কাজ করতে যাবেন তাঁকেই 'রবীন্দ্রজীবনী'র দোরে ধরণা দিতে হবে।

প্রভাতদা সম্পর্কে একটি কথা সর্বদাই আমার মনে হয়—তিনি সব দিক থেকে অতি ভাগ্যবান পুরুষ। অল্প-বিস্তর বিদ্যার্জন আমরা সকলেই করেছি। কিন্তু আমাদের যেমন অনেক জঞ্জাল ঠেলে পরীক্ষার এবড়ো থেবড়ো রাস্তায় হোঁচট খেতে খেতে এগোতে হয়েছে, প্রভাতদাকে তা করতে হয় নি। তিনি মুক্ত প্রান্তরে আপন ইচ্ছা মতো খুশি মনে কোঁচড় ভর্তি করে মেঠো ফুল তুলতে তুলতে অগ্রসর হয়েছেন। ইস্কুল-প্রাঙ্গণের শিক্ষার চাইতে মুক্তাঙ্গনের শিক্ষা ঢের বেশী প্রাণবন্ত। সেখানে পড়াশুনা পরীক্ষার তাগিদে নয়। শিখবার জানবার তাগিদে। সেজন্য আমাদের শিক্ষার চাইতে তাঁর শিক্ষাটা ঢের বেশী কার্যকরী হয়েছে। আমরা চান করেছি তোলা জলে, তিনি অবগাহন করেছেন স্রোতের জলে। সে কারণে আমাদের চাইতে তাঁর বিদ্যা গভীরতর; তার প্রমাণ তিনি দিয়েছেন বিদ্যার নানা ক্ষেত্রে। বিদ্যার্জনের পরে জীবিকার্জন। জীবন ধারণের জন্যে সকলকেই একটা জীবিকা অবলম্বন করতে হয়। মনোমত জীবিকা অনেকের ভাগ্যেই জোটে না। প্রভাতদা সেখানেও ভাগ্যবান। গ্রন্থ-প্রেমিক হলেন গ্রন্থাগারিক। গ্রন্থের পরিচর্যা, পঠন-পাঠন, লালন-পালন, গ্রন্থ-রচনা—সারা জীবন তিনি এই করেই কাটিয়ে দিলেন। বাকী রইল সংসার ধর্ম। বিয়ে-থা করে সকলেই সংসারী হয়, প্রভাতদাও হয়েছেন। 'অমিয় সায়রে সিনান করিতে' অনেকের বেলাতেই 'সকলই গরল ভেল' না হলেও নাকানি

ডুবুনি যথেষ্টই খেতে হয়। কিন্তু প্রভাতদা সংসার সায়রে ডুব দিয়ে পেয়ে গেলেন সুধা। সুধাময়ী দেবী আদর্শ গৃহিণী। মৃদুভাষী বিদুষী মহিলা, স্বামীর বিদ্যাচর্চায় সহযোগিনী। আগেই বলেছি প্রভাতদা আমাকে অলস অকর্মণ্য, অপদার্থ ইত্যাদি বলে অনেক গালমন্দ দিয়েছেন। আমিও আড়ালে তাঁর নিন্দাবাদ করে তার শোধ তুলেছি। সকলের কাছে বলে বেড়িয়েছি যে, প্রভাতদা যা করেছেন তার সমস্তই সুধা বৌদি'র দৌলতে। সুধাদির ন্যায় অর্ধাঙ্গিনী না পেলে প্রভাতদা এর আদ্ধেকও করতে পারতেন না। সত্যি বলতে কি, সুধাদিকে বাদ দিয়ে প্রভাতদার কথা বলতে গেলে জিনিসটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়।

জ্ঞানেগুণে, ধনেজনে, মানেসম্মানে প্রভাতদার পরিপূর্ণ জীবন—দেখতে ভালো লাগে, ভাবতে ভালো লাগে। খুব কম লোকের ভাগ্যে এমন সৌভাগ্য ঘটে। এ সমস্তই নিষ্ঠা এবং অধ্যবসায়ের পুরস্কার। মনে পড়ছে অনেকদিন আগে শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী পুরোনো কাগজপত্র আমাকে দেখিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি হিসাবের ফর্দ ছিল, তাতে প্রভাতদা সমেত তখনকার দিনের কর্মীদের মাইনের অঙ্ক লেখা ছিল। প্রত্যেকের ক্ষেত্রে সে অঙ্ক এতই সামান্য যে আজকের দিনে কেউ শুনলেও তা বিশ্বাস করবে না। এই কথাটি উল্লেখ করবার বিশেষ কারণ আছে। শান্তিনিকেতন জীবনের এই এক মহিমা আমি লক্ষ্য করেছি—সেদিনের দারিদ্র্যকে উপেক্ষা করে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে এখানে লেগে থেকেছেন শেষ পর্যান্ত তাঁদের কারোই লোকসান হয় নি—না অর্থের দিক থেকে, না পরমার্থের। অন্যত্র গেলে তন্মুহূর্তে

অবশ্যই অধিকতর উপার্জনের আশা ছিল। তাঁরা সে লোভ সম্বরণ করেছেন; অধিকের আশায় অধিকন্তুকে ছাড়েন নি। শান্তিনিকেতন জীবনে সব সময়েই কিছু উপরি পাওনা ছিল। এখানকার জ্ঞানচর্চা, সৌন্দর্যচর্চা, আনন্দচর্চা, গুণীজনের সাহচর্য—এ সবই ছিল সেই উপরি পাওনা। এ যুগের ভাষায় একে বলা চলে বিশ্বভারতীর নিঃস্ব যুগের *dearness allowance* বা অভাব মোচনের উপকরণ। তাঁরা ঐ পাওনা নিয়েই সন্তুষ্ট ছিলেন। আশ্রম-দেবতা প্রসন্ন হয়ে তাঁদের বর দিয়েছেন, আজ কোনদিকে তাঁদের কোন অভাব নেই। এঁরাই শান্তিনিকেতনের বরপুত্র—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিঃসন্দেহে তাঁদের অন্যতম।

প্রভাতদা

লীলা মজুমদার

প্রভাতদাকে প্রথম দেখেছিলাম ১৯৩১ সালে, গরমের ছুটির পর যখন আমি সবে এম্-এ, পাস করে শান্তিনিকেতনে এলাম, অধ্যাপনা করতে। আমার তখন ২৩ বছর বয়স। তখন বিশেষ কেউ আমার নামও যেমন জানত না, প্রভাতদার-ও জানত না। হিসেব করে দেখছি ওঁর বয়স তখনো ৪০ পেরোয় নি। কিন্তু আমার মনে হয়েছিল আধাবয়সী ভদ্রলোক, বেশ কড়া মেজাজের। অসময়ে, অচেনা আমাকে দেখে খুব একটা যে খুসি হলেন, তাও মনে হল না। কি যেন লিখছিলেন। আমি যেতেই ঘর থেকে বেরিয়ে এসে-ছিলেন। বিদায় নিতে, মনে হল সন্তুষ্ট হয়ে নিজের কাজে ফিরে গেলেন। সত্যি কথা বলতে কি, আমার-ও যে মানুষটাকে খুব একটা পছন্দ হল, তা নয়।

ফরসা রং, কুচ্‌কুচে কালো চুল-দাড়ি, চুলটা একটু লম্বা-প্যাটার্ণের, সাধারণ লং-ক্লথের পাঞ্জাবী আর মোটা ধুতি গায়। একটু খাটো করে পরা, বোধহয় ধুলোর হাত থেকে কাপড়টা বাঁচাবার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা। সেকালে শান্তিনিকেতনের এবং সমস্ত বীরভূমের পথে এত লাল ধুলো উড়ত যে তালগাছের মগ্‌ডালে-ও লাল রং ধরত। প্রভাতদা যে সুন্দর দেখতে, সেদিন সে-কথা সন্দেহ-ও করি নি। পরে ভাবতাম উনি নিজেও বোধ হয় সে কথা জানেন না। এখন সে ভুল ভেঙেছে, ওঁর 'ফিরে ফিরে চাই' বইখানি পড়ে

দেখছি নিজের রূপ সম্বন্ধে ভদ্রলোক ছোটবেলা থেকেই যথেষ্ট সচেতন। সে যাই হোক, এ সব অনেক পরের কথা।

ঐ প্রথম দিন কারো সঙ্গে গিয়েছিলাম, তারপর যেদিন গেলাম, একাই গেলাম। গিয়ে বললাম, "বইগুলো একটু ঘুরে দেখি?" প্রভাতদা অমনি অন্য মানুষ হয়ে গেলেন। নিজের কাজকর্ম ফেলে হাসিমুখে আমার সঙ্গে ঘুরতে লাগলেন। প্রত্যেকটি বইয়ের ইতিহাস দেখলাম নখাগ্রে। মানুষটা একে-বারে বই-পাগলা। অনেকদিন অবধি আমার বিশ্বাস ছিল প্রভাতদা নিশ্চয় খুব পাস-টাস করে বড় বড় খেতাব নিয়েছেন, পি-এইচ্-ডি তো নিশ্চয়ই। কিন্তু একমাত্র নিজের বিষয়ে উৎসাহ নয়, সব বিষয়ে সমান আগ্রহ। তাই দেখে অবাক হয়েছিলাম। ভবিষ্যতে জ্ঞানভারতীর বীজটি তখন চিনতে পারি নি। ছোটবেলা থেকে কনভেণ্টে ফরাসী পড়েছিলাম। গ্রন্থাগারে ইন্দিরাদেবীর ও প্রমথ চৌধুরীর ফরাসী বইয়ের সংগ্রহে আমার কৌতূহল দেখে প্রভাতদা কি খুসি! বললেন, "এ বই কেউ খুলেও দেখে না।" আমি চলে আসবার সময় আমাকে বিকেলে চায়ে নেমন্তন্ন করলেন। তবে চা-পার্টিতে চা থাকবে না, তাও বললেন। যথা সময়ে হাজির হলাম। সেকালে গৌরপ্রাঙ্গণ ঘিরে আশ্রমের ছাত্রদের জীবন ঘুরপাক খেত। সেখানেই বিখ্যাত লাইন হত, খেলা হত, তার-ই এক ধারের পুরনো লাইব্রেরির বারান্দা ও তার সুমুখে সকালে বৈতালিক হত। গেটের গায়ে জগদানন্দবাবু ক্লাস নিতেন তাঁর পাশে মহুয়া-তলায় আমি ক্লাস নিতাম আর আশ্চর্য হয়ে তাঁর হাঁকডাক শুনতাম।

গৌরপ্রাঙ্গণের পূবদিকে প্রভাতদার বাড়ি। মনে আছে সেই প্রথম যাওয়ার দিন চিড়ে ভাজা, মুড়ি, আরো কি কি ভাজা মিশিয়ে চমৎকার একটা জিনিস খেয়েছিলাম। আমার খুব ভাল লেগেছিল। প্রভাতদার বাড়িভরা ছেলে দেখে আমার কলকাতায় ফেলে-আসা পাঁচটা ভাইয়ের জন্য মন-কেমন-করা কমে গেছিল। প্রভাতদা আর বৌদি আমাকে তাঁদের নিজের লোক বানিয়ে ফেলেছিলেন।

হয়তো সারদারঞ্জন, উপেন্দ্রকিশোর যে আমার জ্যাঠা-মশাই সে-কথা জানতেন। রবীন্দ্রনাথের কাছেই শুনে থাকবেন। আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাম-করা ছাত্রী তাও হয়তো জানতেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস প্রভাতদা সেজন্য আমাকে তাঁর স্নেহের ভাগ দেন নি। সে সময় সোনার মেডেল পাওয়া ঢের লোক ছিল এখানে, যারা আমার চেয়ে ঢের বেশী খ্যাতিমান। ঢের বেশী গুণী।

তখন 'সন্দেশে' মাসে মাসে আমার একটি করে গল্প ছাপা হত। পড়তেন কি না জানি না। উনি নিজে একটু সময় পেলেই তন্ময় হয়ে কি লেখেন জিজ্ঞাসা করাতে, শুনলাম উনি গুরুদেবের জীবনী লিখছেন। আরেকটু শুনেই টের পেলাম এটি একটি প্রামাণিক গ্রন্থ হবে। রোজ যা লিখতেন, বিকেলে কবির কাছে গিয়ে দেখিয়ে নিতেন, যদি কোন ভুলচুক থেকে গিয়ে থাকে। সাহিত্যিক হবার স্বপ্ন তখনো দেখতাম, কিন্তু এ-ও বুঝতে পারতাম যে যত ভালো গল্প কবিতা নাটিকা-ই লিখি না কেন, এমন একদিন আসবে যখন আমার লেখার আদর ক্রমে ক্রমে কমতে থাকবে, কিন্তু প্রভাতদার ঐ জীবনীর আদর কমা দূরের কথা, বছরে

দৌড়ে ভবনে ফিরে সেই ঘূর্ণিত আয়নায় নিজের মুখ দেখে বেগে কেঁদে একাকার করল। তবু প্রভাতদাকে আসল ব্যাপার বলবার সাহস হল না। সে বললাম গিয়ে আমরা দেখা গেল তাঁর চোখ মিট মিট করছে।

লোকটি নেহাৎ বেরসিক ছিলেন না। মনে অছে অধ্যাপকদের সঙ্গে ছাত্রদের ফুটবল খেলা হয়েছিল, তা তাঁরা খেলতে পারুন আর নাই পারুন। অবিশ্যি তাঁদের একটু সুবিধার জন্য নিয়ম করা হয়েছিল যারা বেশি গোল খাবে, তাদেরি জিত! বলা বাহুল্য অধ্যাপক মহাশয়রা প্রশংসনীয় ভাবে জিতেছিলেন। তার কারণ গোঁসাইজি ছিলেন গোলে এবং বল তেড়ে আসছে দেখলেই মুখ ঢেকে বসে পড়ছিলেন; আর যদ্দূর মনে হয় প্রভাতদা তখন যাকে বলা হত ফরওয়ার্ডে খেলছিলেন। মালকোঁচা দিয়ে খাটো করে ধুতি পড়ে ছুটো-ছুটি করতে মন্দ দেখাচ্ছিল না। তখনো মাথার সুদৃশ্য টুপি বা ভালো জোব্বা কেনার সামর্থ্য তাঁর ছিল না। এই মানুষটি সারা জীবনে যা করেছেন সব-ই নিজের চেষ্টায়। গ্রন্থাগারে কাজ করতে হচ্ছে, অতএব সে বিষয়ে যা কিছু তথ্য জ্ঞাতব্য সব নখাগ্রে জড়ো করে তবে ছাড়লেন। যত সরল জীবন-যাপন করুন না কেন, আত্ম-সম্মান ছিল পর্বত প্রমাণ। অন্য আশ্রমবাসী কারো কারো অযোগ্য মন্তব্যের ফলে, আশ্রম থেকে সেই যে বাস উঠিয়ে ভুবনডাঙ্গায় চলে গেলেন আর আশ্রমে রাত কাটালেন না। রোজ ঐ মাইল খানেক পায়ে হেঁটে কাজে আসতেন। অমন তীরের মতন সোজা মানুষ কম দেখেছি।

এই প্রভাতদার স্নেহ পেয়েছি বলে আমি গৌরবান্বিতা হয়েছি। এখন যত সম্বর্ধনা, সুখ্যাতি, খেতাব, মাল্যদান,

অর্ঘ্যদান দেখি, আমার হাসি পায়। এগুলি তাঁকে দেওয়া উচিৎ ছিল ২০ বছর আগে। এখন আর এসবের তাঁর প্রয়োজন নেই। তিনি নিজের আলোতেই ভাস্বর। যত দিন কাটবে, পণ্ডিতগণ তাঁর কাছে তত বেশি ঋণী হবেন।

প্র কু মু

উপেন্দ্রকুমার দাস

ঠিক পঞ্চাশ বছর আগের কথা। শিক্ষাভবনে বি.এ ক্লাসে এসে ভর্তি হয়েছি মাত্র কয়েকদিন আগে। থাকি কলেজ হোস্টেলে। ইতিহাসের ছাত্র আমার এক সহপাঠী বন্ধুকে কি একটা কাজের কথা বলতে গেছি একদিন। বন্ধুটি বললে—দাঁড়াও ভাই, আগে প্রকুমুর ক্লাসটি করে আসি, তারপর তোমার কথা শুনব।

—প্রকুমু? তিনি আবার কে হে? কোনো জাপানী অধ্যাপক বুঝি?

আমার অজ্ঞতায় বন্ধুটি হেসে লুটোপুটি। বললে—দুর বাঙ্গাল। জাপানী হতে যাবেন কেন? প্রকুমু প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, আমাদের প্রভাতদা।

বাংলা হরফে লেখা নাম যে এরকম সংক্ষেপে লেখা যায় তখন আমি তা জানতাম না। সেইজন্য, প্রকুমু কার নাম বুঝতে পারি নি।

বন্ধুটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—এখানে বুঝি অধ্যাপকরা এই রকম বাংলা হরফে সংক্ষেপে নাম লেখেন? বন্ধু বললে—আর কেউ লেখেন কিনা জানি না। তবে প্রভাতদা লেখেন।

খুবই সামান্য ঘটনা। কিন্তু এ থেকে আমার ধারণা হল প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঠিক আর পাঁচ জনের মতো নন। এঁর একটি প্রবল ব্যক্তিত্ব আছে। নৈলে, অন্য কেউ যা করেন না তা তিনি করতে পারতেন না এমনি ভাবে।

এই ধারণাটি যে ভ্রান্ত নয় তা প্রভাতদাকে যাঁরা চেনেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন।

প্রভাতদা ছিলেন গ্রন্থাগারিক। তবে ইতিহাসের অধ্যাপনাও করতেন। কলেজে ইতিহাস আমার পাঠ্য বিষয় ছিল না বলে প্রভাতদার অধ্যাপনা সম্পর্কে কোনো প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আমার নেই। ইতিহাসের ছাত্র বন্ধুদের কাছে শুনেছি প্রভাতদা ভাল অধ্যাপক। ভাল অধ্যাপক যে তার প্রমাণ তাঁর ক্লাস কেউ কামাই করতে চাইত না।

পরে প্রভাতদার সঙ্গে যখন পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল তখন শুধু ইতিহাস নয়, জ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহ ও অনুসন্ধিৎসা লক্ষ্য করেছি। নানা বিষয়ে তিনি যে প্রচুর পড়াশোনা করতেন তার প্রমাণ গ্রন্থাগারে বিভিন্ন বিষয়ে যে-সব প্রামাণ্য গ্রন্থ ছিল প্রভাতদা সে সব সম্পর্কে সর্বদা ওয়াকিবহাল থাকতেন। কোনো বিষয়ে ছাত্রছাত্রীরা কেউ পড়াশোনা করছে জানলে তিনি অনেক সময় উপযাচক হয়ে ভাল ভাল বইয়ের সন্ধান দিতেন। শুধু কার্ড দেখে এরূপ সন্ধান পাওয়া যায় না। এ ব্যাপারে প্রভাতদার মতো গ্রন্থাগারিক দুর্লভ।

যখনই গ্রন্থাগারে প্রভাতদার ঘরে গেছি কোনো কাজে, দেখেছি তিনি পড়াশোনা করছেন কিংবা লিখছেন কিংবা কারো সঙ্গে কথাবার্তা বলছেন। নিরলস মানুষ। সব সময়ই কিছু না কিছু করছেন।

এই নিরলসতার সঙ্গে যুক্ত ছিল তাঁর নিয়মনিষ্ঠতা ও কর্মনিষ্ঠতা। এগুলি সেদিনকার শান্তিনিকেতনের প্রবীণ অধ্যাপকদের বৈশিষ্ট্য ছিল বলা যায়। এই প্রসঙ্গে বিশেষ করে মনে পড়ছে আচার্য বিধুশেখর শাস্ত্রী, আচার্য ক্ষিতিমোহন

সেন ও আচার্য হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের কথা। এঁরা প্রভাতদার বয়োজ্যেষ্ঠ। এক দিক্ দিয়ে বলা যায় প্রভাতদা এঁদের ধারার মানুষ। আর অনুসন্ধান করলে দেখা যাবে স্বয়ং গুরুদেব রয়েছেন এই ধারার মূলে। তিনিই ছিলেন এঁদের আদর্শ।

ঢিলেঢালা স্বভাবের মানুষ আমরা। এঁদের দেখে রীতিমত ঘাবড়ে যেতাম। তবে, সত্যি কথা বলতে কি, ঐ সঙ্গে একটু একটু ভরসাও পেতাম এই ভেবে যে, চেষ্টা করলে আমরাও হয়ত এঁদের পথে খানিকটা চলতে পারব। শিষ্যদের মনে এরূপ ভরসা জাগানো, আমাদের ত মনে হয়, এইটি গুরুদের অন্যতম প্রধান সার্থকতার নিদর্শন।

আজ ৮৮ বছর বয়সেও প্রভাতদার সারস্বত কর্ম অব্যাহত রয়েছে তাঁর অভ্যস্ত নিরলস কর্মনিষ্ঠতা ও নিয়মনিষ্ঠতার সঙ্গে একইভাবে। এক্ষেত্রেও প্রভাতদার মতো মানুষ বিরল। তিনি অনন্যসাধারণ।

পূর্বেই বলেছি আমরা ইতিহাসের ছাত্র ছিলাম না। তাই প্রভাতদার ক্লাসে পড়ার সৌভাগ্য আমাদের হয় নি। কিন্তু তাঁকে আমরাও আমাদের অধ্যাপক মনে করেছি। আমরা জানি প্রভাতদাও আমাদের নিজের ছাত্রদের থেকে ভিন্ন মনে করেন নি। সে যুগের শান্তিনিকেতনের এটাই ছিল অন্যতম বিশেষত্ব।

ছাত্ররা লেখাপড়া করার সঙ্গে সঙ্গে চরিত্রগঠন করবে, কর্মঠ, স্বাবলম্বী, উদ্যোগপরায়ণ হবে, নিজেদের ভবিষ্যৎ জীবনের জন্য তৈরী করবে, যতটা মনে পড়ে, অধ্যাপকদের মধ্যে একমাত্র প্রভাতদাই এই সব ব্যাপারে তাদের নানাভাবে উৎসাহিত করতেন।

এ সম্পর্কে একটি সামান্য ঘটনার কথা মনে পড়ছে। তখন 'দ্বারিক' নামের বাড়ীটি (এখন তার চিহ্নও নেই; তারই সংলগ্ন স্থানে তৈরী হয়েছে বর্তমান 'মৃণালিনী' ছাত্রীনিবাস) ছিল বড় মেয়েদের হোস্টেল। 'শ্রীসদন' বড় করে তৈরী করা হলে পর মেয়েরা সেখানে চলে গেল। 'দ্বারিক'কে করা হল শিক্ষাভবনের (কলেজের) ছেলেদের হোস্টেল। প্রভাতদা হলেন হোস্টেলের ওয়ার্ডেন। তাঁর সহকারী হিসাবে দুজন অধ্যাপক হলেন সুপারিন্‌টেন্‌ডেণ্ট। তাঁরা দুজন কিছুকাল আমাদের সঙ্গে দ্বারিকের দুটি কামরায় বাস করেছেন।

প্রভাতদা আমাদের ডেকে বললেন—এবার থেকে কলেজ হোস্টেলেই তোমাদের খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে আলাদা মেস করে। রান্নাঘরে (*General Kitchen*) আর তোমাদের খেতে দেওয়া হবে না।

শুনে ত আমাদের মাথায় বজ্রাঘাত। ঘণ্টা পড়লেই রান্না-ঘরে গিয়ে খেয়ে আসি। কোনো দায়দায়িত্ব নেই, ঝুটঝামেলা নেই। এ আবার কি ফেসাদ রে বাবা! উপস্থিত সবাই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলাম—ওরে বাবা রে, এ আমরা পারব না, প্রভাতদা! তারপর প্রস্তাবিত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সম্ভাব্য সব যুক্তি দেখালাম। প্রভাতদার সঙ্গে এ নিয়ে অনেক কথা-বার্তা হল। কিন্তু তাঁকে তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে টলাতে পারলাম না। ওঁর শেষ কথা, বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কহীন যে-শিক্ষা তা অসম্পূর্ণ। বাস্তব জীবনের সঙ্গে কিঞ্চিৎ যোগ হোক তোমাদের। আখেরে তোমরাই লাভবান হবে।

মেস আমাদের করতে হয়েছিল। কিন্তু ছ মাসের বেশী তা চলে নি নানা কারণে। সে অন্য কাহিনী। এখানে অবান্তর।

নিজের বাঁধাধরা কাজের বাইরে কেউ নিঃস্বার্থভাবে অপরের কল্যাণকর কোনো কাজের প্রয়াস করলে অথবা কোনো প্রচলিত কাজ নূতন ধরণে করতে চাইলে তাঁর সম্বন্ধে আড়ালে বলা হত অমুকের মাথায় পোকা আছে। বলা বাহুল্য, প্রভাতদা সম্বন্ধেও আড়ালে এরূপ মন্তব্য করা হত। বিশেষ করে ঐ মেস করার ঘটনার পর আমরা কলেজ-ওয়ালারাও এ বিষয়ে নিঃসন্দেহ হয়েছিলাম।

আড়ালে যাকে বলা হয় মাথায় পোকা থাকা প্রকাশ্যে তাকে বলা হয় আদর্শবাদ। প্রভাতদাকে আমরা এক ধরণের আদর্শবাদীই মনে করতাম।

কোনো বাঞ্ছিত বস্তু লাভের জন্য একনিষ্ঠ যে অধ্যবসায় তাকেই বলা যায় সাধনা। জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে এরূপ সাধনায় নিরত ছিলেন সেদিনের শান্তিনিকেতনের কয়েকজন প্রবীণ অধ্যাপক। পূর্বে যে-আচার্যদের নাম করা হয়েছে এক্ষেত্রেও তাঁরাই শীর্ষস্থানীয়। প্রভাতদাও আছেন এঁদের সঙ্গে। প্রভাতদার সাধনা তাঁর এই ৮৮ বৎসর বয়সেও সমানে চলেছে একথা পূর্বেই আমরা বলেছি। সময় পরিমাপের দিক্ দিয়ে প্রভাতদার সাধনা অতুলনীয়।

যদি বলা যায় প্রথিতযশা রবীন্দ্রজীবনীকার মনীষী প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনের সৃষ্টি তা হলে সম্ভবতঃ ভুল বলা হবে না। যতদূর মনে পড়ে স্বয়ং প্রভাতদার মুখেও এরূপ কথা শুনেছি। তবে এরকম বলা দ্বারা কিন্তু প্রভাতকুমার সম্বন্ধে সব কথা বলা হয় না। ভিতরে পদার্থ না থাকলে শুধু গুরু বা পরিবেশের কারণে সাধারণ অসাধারণ হয় না একথা যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রই বলবেন। প্রভাত-কুমারের মধ্যে পদার্থ ছিল. তাই. তিনি যা তিনি তাই হয়েছেন।

প্রক্রম্

এক দিক দিয়ে বলা যায় তিনি স্বয়ং-গড়ে-ওঠা মানুষ, ইংরেজিতে যাকে বলে *Selfmade man.* একাধিক বিচারে কথাটা প্রভাতদা সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

প্রভাতদাকে আমরা যুক্তিবাদী ও প্রগতিশীল মনে করতাম। সম্ভবতঃ যুক্তিবাদী বলেই তিনি প্রগতিশীল। বিচার করে যা যুক্তিযুক্ত মনে হয় তাই তিনি মানেন ও গ্রহণ করেন। এই সঙ্গে লক্ষ্য করেছি তাঁর নির্ভীকতা। আমরা জানি স্বয়ং গুরুদেবেরও কোনো কথা বা সিদ্ধান্ত যুক্তিযুক্ত মনে না হলে প্রভাতদা, এমনকি প্রকাশ্য সভাতেও, গুরুদেবকে সেকথা বলার সাহস রাখতেন। গুরুশিষ্যে মতান্তর হত কিন্তু মনান্তরের কথা কখনো শুনি নি।

মনে পড়ে বিশ্বভারতীর কাজে যোগ দেওয়ার পর আমরাও যখন একাধিক সভাসমিতির সদস্য হয়েছি এবং প্রভাতদাও সে সবে রয়েছেন তখন প্রভাতদার সঙ্গে আমাদের মতো ক্ষুদ্র ব্যক্তিরও কোন কোনো বিষয়ে যুক্তিগত মতভেদ হয়েছে। জোর তর্কবিতর্ক চলেছে। বিচারে মতভেদ হয়ত দূর হয় নি। কিন্তু তার জন্য অধ্যাপক ছাত্রের চিরন্তন সম্বন্ধ কখনো এতটুকু ক্ষুণ্ণ হয় নি।

সম্ভবতঃ এই যুক্তিনিষ্ঠতার জন্যই হিন্দু ধর্মের তথা সমাজের বহু আচার-অনুষ্ঠান, ক্রিয়াকর্ম, সংস্কার ইত্যাদি অযৌক্তিক মনে করে প্রভাতদা হিন্দুদের সম্বন্ধে কঠোর মন্তব্য করতেন। অনেকে কিন্তু তা মনে করতেন না। তাঁদের মতে প্রভাতদা গোঁড়া ব্রাহ্ম, কেউ কেউ আড়ালে বলতেন ভয়ঙ্কর (*ferocious*) ব্রাহ্ম, সেইজন্য, তিনি হিন্দুদের নিন্দা করেন। হিন্দু ধর্ম তথা সমাজের মূল লক্ষ্য এবং মর্মগত তত্ত্ব সম্বন্ধে নিরপেক্ষ

মন নিয়ে তিনি অনুসন্ধানই করেন নি কখনো। প্রভাতদা তাঁর ব্রাহ্ম সংস্কার ও সাম্প্রদায়িকতার উর্দ্ধে উঠতে পারেন নি।

এ সব মতামতের বিচার এখানে সম্ভব নয়। তবে এ থেকে একটা জিনিস লক্ষ্য করা যায়। সেকালে প্রভাতদার গুণগ্রাহী যেমন অনেক ছিলেন, তেমনি তাঁর বিরুদ্ধ সমালোচনা করার লোকেরও অভাব ছিল না। সংসারে এমনটিই ঘটে। খ্যাতির সঙ্গে নিন্দা পাশাপাশি চলে।

পূর্বেই বলেছি প্রভাতদাকে আমরা আদর্শবাদী মানুষ মনে করতাম। কিন্তু এ সম্বন্ধেও মন্তব্য শুনেছি—আদর্শবাদী ঠিকই, তবে নিজের স্বার্থটি ষোল আনা বজায় রাখার পর।

বলা বাহুল্য, এর পর এই ধরণের কথা কাটাকাটি প্রায়ই কলহে পৌঁছে যেত।

অনেকের ধারণা, যাঁরা জ্ঞানসাধনায় নিমগ্ন থাকেন তাঁরা সাংসারিক বিষয়ে একেবারে অকর্মণ্য হন। পুরনো দিনের শান্তিনিকেতনেও এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল ছিল না। কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তার অসংখ্য প্রমাণ প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত সর্বত্র ছড়িয়ে আছে। সাংসারিক বিষয়ে যাঁরা অকর্মণ্য তাঁরা জ্ঞানসাধনায় রত না হলেও অকর্মণ্যই হবেন। জ্ঞানসাধনার সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে অকর্মণ্যতার কোন কার্যকারণ সম্পর্ক নেই।

যতটা শুনেছি, প্রভাতদা একরকম শূন্য হাতেই সংসার আরম্ভ করেছিলেন। তারপর সুযোগ্যা সহধর্মিণী আমাদের সুধাদির সহযোগিতায় এবং নিজের বুদ্ধি খাটিয়ে শান্তিনিকেতনের সামান্য আয় থেকেই যেটুকু পার্থিব সম্পদ তিনি অর্জন করেছেন তা নিঃসন্দেহে তাঁর কৃতিত্বের পরিচায়ক এবং জ্ঞানসাধনার সঙ্গে সাংসারিক বিষয়ে অকর্মণ্যতার যে কোনো

কার্যকারণ সম্বন্ধ নেই তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রভাতদা কৃতী গৃহস্থ।

সুধাদির কথা উঠল। অল্পকালের জন্য সুধাদি ছিলেন আমাদের বাংলার অধ্যাপিকা। এই বিদুষী স্নেহময়ী মহিলার কথা সেদিনের শান্তিনিকেতনের কলেজের ছেলেমেয়েরা কখনো ভুলতে পারবে না। প্রভাতদার গুরুপল্লীর বাড়িতে আমরা অনেকে মাঝে মাঝে গিয়ে হাজির হতাম। আমাদের জন্য প্রভাতদার দ্বার ছিল অবারিত। নানা গল্পগুজব, তর্কবিতর্ক কখনো কখনো গানবাজনাও হত। আর সেই সঙ্গে সুধাদির স্নেহের প্রত্যক্ষ নিদর্শন এক এক কাপ চা এবং খানিকটা খাবারও থাকত। আমাদের দলে বাঙ্গালী অবাঙ্গালী এমন কি অভারতীয়ও ছিল। নিজের মা-বাবা, আত্মীয়-স্বজন থেকে বহুদূরে ছিলাম বলে এই পরিবেশটি আমাদের মন ভরে দিত। শান্তিনিকেতনের বাইরে এমনটি আর কোথাও পাওয়া যেত কিনা জানি না।

গুরুদেব যাঁদের সহযোগিতায় তাঁর শান্তিনিকেতনের ভাবমূর্তিকে সময়োপযোগী বাস্তব রূপ দিতে পেরেছিলেন প্রভাতদা তাঁদের অন্যতম। শান্তিনিকেতনের অধ্যাপকদের বিদ্যাচর্চা সম্বন্ধে গুরুদেবের মনে যে-প্রত্যাশা ছিল প্রভাতদাদের মধ্যে তা পূর্ণ হয়েছে বললে অত্যুক্তি হবে না। আমাদের যতটা জানা, প্রভাতদাই আজ উক্ত অধ্যাপকদের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন প্রভাতদা শুধু লেখাপড়া নিয়েই থাকতেন না। নানা কর্মে তিনি সক্রিয় অংশ গ্রহণ করতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যাক্। একবার প্রভাতদা তালতোড় ইউনিয়ান বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হন। তখন শান্তিনিকেতন

ঐ ইউনিয়ান বোর্ডের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমাদের এই ব্যাপারটি ভারী অদ্ভুত মনে হয়েছিল। তখন ইংরেজ আমল। আমরা প্রভাতদাকে জাতীয়তাবাদী বলে জানতাম। তিনি কিনা শেষে ইংরেজ শাসনের সঙ্গে হাত মেলাতে গেলেন।

এ নিয়ে বেশ রসিকতাও করা হত। একজন হয়ত বললেন—প্রভাতবাবু এবার নির্ঘাত রায়বাহাদুর হবেন, নিদেন পক্ষে, রায়সাহেব। সঙ্গে সঙ্গে আরেকজন ফোড়ন দিতেন—আরে মশাই, ঐ জন্যই ত প্রেসিডেণ্ট হয়েছেন।

এ রসিকতার কথা সম্ভবতঃ প্রভাতদাও জানতেন। আর মনে হয় জেনে উপভোগই করতেন। কেননা, এ ছিল নিছক রসিকতা।

বুঝতে অসুবিধা হয় না যে-কারণে প্রভাতদা একবার তদানীন্তন শান্তিনিকেতন সমবায় ভাণ্ডারের সেক্রেটারী হয়েছিলেন সেই কারণেই ইউনিয়ান বোর্ডেরও প্রেসিডেণ্ট হয়েছিলেন। কারণটি আর কিছু নয়—জনসেবা।

প্রভাতদার জীবন তথা বহুমুখী কর্মের সমীক্ষা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে তাঁর সম্বন্ধে মুখ্যতঃ ছাত্র হিসাবে আমাদের ধারণার কথা মোটামুটি বলার চেষ্টা করেছি।

প্রভাতদারা গুরুদেবের শান্তিনিকেতনের আদর্শ মানুষ। এঁদের জ্ঞানকর্মধারা যদি পরবর্তীদের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয় তা হলেই শান্তিনিকেতনের পরম্পরা রক্ষিত হতে পারে এবং এইভাবে গুরুদেবের শান্তিনিকেতন বেঁচে থাকতে পারে।

সম্ভবতঃ প্রভাতদাই পুরনো শান্তিনিকেতনের শেষ আরতির শিখা। এই শিখাটি আরও দীর্ঘকাল উজ্জ্বল হয়ে থাক্—একান্তমনে এই প্রার্থনা করি।

আচার্য প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

অমিয় চক্রবর্তী

মনে হচ্ছে যেন কত পূর্বযুগের কথা, কিন্তু স্পষ্ট ছবি জাগছে সেই অপরাহ্নের; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় প্রভাতবাবু খাতা-পত্তর এবং বহু প্রশ্নের ভার নিয়ে উপস্থিত। "কী হে প্রভাত, মনের কথা খুলে বলো, ওসব কাগজ পত্র কিসের?" "আমার কাজ কিছু এগিয়েছে কিন্তু আপনার পূর্বপুরুষদের বংশাবলী আরো কিছু চাই।" কবি ব্যতিব্যস্ত হয়ে বললেন "আমার কবিতা আলোচনার জন্যে ঐ সব ঠিকুজির কী দরকার?" আলোচনা চলল, কবি অপ্রসন্ন নন, কিন্তু বললেন, "ঐ এক আধুনিক নেশা। সব খুঁটিনাটি জানতে হবে, কার কবে মাথা ধরলো, কাকা পিসিমার ডাকনাম কী, সেদিন লেখাটা কেন মনে এল, তথ্যে জটিল গোলকধাঁধা সব জানতে হবে। কিন্তু কেন?" তারপর বহুবার ঐ প্রশ্ন, প্রসঙ্গ, ঐতিহাসিক ঘটনার সঙ্গে সৃজনীশক্তির যোগ বিয়োগের কথা হয়েছে। অথচ কেউ জানে না উত্তর। না জানলেই বা ক্ষতি কী? কিন্তু প্রভাতবাবু ছাড়বার লোক নন; ধীরে ধীরে বার বার প্রশ্ন তুলে কিছু কিছু উত্তর পান, তাঁর ধৈর্য, উৎসাহ এবং অসামান্য নিষ্ঠায় কবি সম্পূর্ণ সায় না দিয়েও ক্ষণিক তৃপ্তি পেতেন। অভিযোগ করে বলেন, "দেখ, আমাদের দেশ ইতিহাস-ভোলা; কে ঠিক করে জন্মেছে মরেছে, তাদের আহার-বিহার, চেহারা যদি জানা না থাকে কিম্বদন্তী যোগ করে সাক্ষী তৈরী করা হয়। অন্তর্জীবনের কথা, প্রেরণার রহস্য মুছে

গিয়ে, এমন কি কবিতার ছন্দ বা গল্পের আঙ্গিক অগ্রাহ্য করে নকল কাঠামো রচনার ব্যবসা পশ্চিম দেশের কাছ থেকে শেখা গেল। প্রতিভাবান নারী পুরুষের সম্বন্ধে প্রায় কিছুই জানা হল না। জানবার মনও তৈরী হয় নি। মরেও মানুষ রেহাই পায় না।" প্রভাতবাবু অবিচলিত চিত্তে রবীন্দ্রজীবনীর বহুপর্যায়ী গাঁথনি বেঁধে তুলছিলেন, কবির স্মৃতি-বিস্মৃতির মধ্য দিয়ে তাঁর মনের যে সব চিত্রাবলী আভাসিত হচ্ছে সবই রক্ষা করেছেন। কবিও সাড়া দেন, বিশেষ করে যেখানে মতামত এবং তারও চেয়ে গভীর অনুভূতির কথা উঠেছে। দেশ কাল পাত্রের যোগে কবি-মানসের বহু ইঙ্গিত এবং বিশেষ ঘটনা সম্বন্ধে তাঁর নিভৃত মতামত, তাঁর জীবনে স্থান কালের প্রভাব ধরা পড়্‌ল। সমুদ্রের ঢেউ গণনা করে সমুদ্রকে পাওয়া যায় না; আরোই হারাতে হয়। কিন্তু যাঁরা অভিযানী এবং বৈজ্ঞানিক প্রথায় সিদ্ধহস্ত অথচ যাঁদের জানবার আগ্রহ সত্য দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে নি তাঁরা মহা-সমুদ্রের মানচিত্রকর। প্রভাতবাবুর ধারণায় ঔজ্জ্বল্য আছে, বিশিষ্ট শিল্পীর গাণিতিক মর্যাদাও সুরক্ষিত। বহু ঝরণার ধারা অনুসরণ করে তিনি নদীর প্রবাহে পৌঁছেছেন, রবীন্দ্র-জীবনীর অন্তঃশীল এবং নিত্য প্রকাশিত অধ্যায় তাঁর গ্রন্থে সমাদৃত হয়েছে। কোনো পর্বই বাদ পড়েনি। সেই প্রথম অপরাহ্নের কথা ভেবে দেখি এবং আজকে তাঁর বিরাট গ্রন্থ পরম্পরায় কবির যে পরিচয় শুধু দেশে নয়, বিদেশেও স্বীকৃত হল তার জন্যে গভীর ধন্যতা অনুভব করি।

ভাষ্যকার বা ঐতিহাসিক-সমালোচক অনেক ক্ষেত্রে আদর্শিক পুরুষের সম্মোহে পড়ে স্তুতির সহজ পথ অনুসরণ করেন; *Boswell* এর *Johnson* এবং *Abbot* নেপোলিয়ন গ্রন্থে তা

দেখা গেছে। *Carlyle*-ও আতিশয্য বাদ দেন নি। আমাদের দেশেও এ দৃষ্টান্তের অভাব নেই। কিন্তু প্রভাতবাবুর সত্য-সন্ধিৎসা সহজিয়াপন্থী নয়, কঠিন পরিশ্রম এবং প্রখর বিশ্লেষণ হতে তিনি বিরত হন নি। রবীন্দ্রজীবনে বিরাট সংলগ্নতা এবং সংকল্পের দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও কবি বিবিধ মতা-মতের আকর্ষণে কখনো উদ্‌ভ্রান্ত হন নি বলা চলে না—বিশেষ করে রাষ্ট্রজনিত আন্দোলনের ক্ষেত্রে—কিন্তু তাঁর আদর্শসূত্র কখনো ছিন্ন হয় নি। সেই সৌষম্যের দৃষ্টি দিয়েই প্রভাতবাবু তাঁর আলোচনার গতি নির্ণয় করেছেন—কোথাও দলীয় বা উত্তেজক কোনো বৃত্তিকে মানেন নি। প্রভাতবাবুর গ্রন্থাবলী তাই এত সুগঠিত, এত প্রাঞ্জল, এবং সাহসিক। আবেগ প্রবণতায় রঞ্জিত চিত্র তাঁর বইয়ে নেই, তিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই পূর্ণ সত্যের আকর্ষ রক্ষা করেছেন, দেশ-বিদেশের সর্ববিধ ঘটনার মাত্রা রক্ষা করতে ভোলেন নি। রবীন্দ্রজীবনী তাই সত্যানুসন্ধীর নির্ভীক রচনা।

প্রভাতবাবু চারিত্রিক ইতিবৃত্ত গড়ে তুলেছেন, সহযোগী কল্পনা এবং প্রামাণিক অনুশীলন তারই সঙ্গে মিশেছে; ভক্তি প্রীতির স্পর্শ কোথাও বাদ পড়ে নি। আজকের দিনে, বিশেষত পশ্চিমে দয়াহীন অঙ্গবিচ্ছেদ এবং অন্য দশ জনকে অলীক বা তুচ্ছ সম্পর্কে টেনে আনা তাঁর পক্ষে সম্ভব হল না। কবি-জীবনের কোনো বিশেষ প্রসঙ্গকে বাড়িয়ে তুলে অতিবাদিত্বের প্রশ্রয় দেওয়া প্রভাতবাবুর স্বভাব-বিরুদ্ধ, নিঁখুত সামঞ্জস্য রক্ষার শক্তি তাঁর স্বভাবজাত। গল্পগুজবকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন, সততার মূল্য গ্রহণে দ্বিধা করেন নি। দেশবিদেশের মনীষী-সংঘ ও জনসাধারণ তাঁর চরিত্র-চিত্রণে মর্যাদা পেয়েছে। সংবাদপত্রের বিবিধ সমালোচনা তাঁর লক্ষ্য

এড়ায় নি অথচ কোথাও তাকে অযথা মূল্য দেন নি। মুসোলিনীর ইতালিতে কবিকে নিয়ে যে-সব উদ্‌ভ্রান্ত উচ্চ-নীচ মসীকীর্তন ঘটেছিল তার যথাযথ পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হয়েছে। পূর্বে কোনো ইতিহাসে এমন তথ্যসমৃদ্ধ অথচ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেখি নি। এইখানে আরেকটা কথার পুনরুল্লেখ করতে চাই। ঠাকুর পরিবারের ঠিকুজীর প্রসঙ্গ তুলেছিলাম, এই গ্রন্থে আশ্চর্য বহুধাশক্তি-সমন্বিত আত্মীয় সমাজের আলোচনা জাতীয় জীবনের বিচিত্র ধারার যোগে অঙ্কিত হয়েছে—এমন পরিচ্ছন্ন দৃঢ় বর্ণনা আমরা পূর্বে পড়ি নি। তার পরে ক্রমে ক্রমে রবীন্দ্রনাথের বৃহত্তর 'পরিবার', সামাজিক, জাগতিক পর্যায়ে ব্যক্ত হল, তাঁর বৈশ্বিক অথচ ব্যক্তিগত আখ্যায়িকা পূর্ব-পশ্চিম প্রদক্ষিণ করে আবার শান্তিনিকেতনে পৌঁছল। প্রভাতবাবুর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের জীবন-বৃত্ত দেশ দেশান্তে পরিব্যাপ্ত—আশ্রমের কেন্দ্রও উজ্জ্বল-চিত্রিত। গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র কবির রচনাবলী, যতদূর জানি কবির কোন রচনাই গ্রন্থকারের দৃষ্টি এড়ায় নি; সঙ্গে সঙ্গে সন তারিখ, পরিবেশ, ক্রমিক সূচীপত্র যোগ হয়েছে।

বহু দশক ধরে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে জানার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। বিদেশ বাসের বিঘ্ন সত্ত্বেও এই সম্বন্ধ ম্লান হয় নি, আরো ঐশ্বর্যপূর্ণ হয়েছে। যখনই দেশে যাই তাঁর সঙ্গে আলাপ আলোচনা জমে ওঠে, সভা-সমিতিতে তাঁর সান্নিধ্য পাই, তাঁর নবতর রচনা পাঠ করি। বহুশোভ-মানা মাতৃভূমির, বিশেষ করে শান্তিনিকেতনের, পুণ্য প্রান্তরে আচার্য প্রভাতকুমার যে-আসন পেয়েছেন তার নিয়ত পূর্ণতা কামনা করি।

আমাদের প্রভাতদা

অমিতা সেন

আমার বাবা আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন শান্তিনিকেতনে এলেন ১৯০৮ সালে। শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় এসেছিলেন ১৯০৯ সালে, মাত্র সতের বৎসর বয়স তখন তাঁর। এরও কয়েক বৎসর পরে আমার জন্ম। আমাদের প্রভাতদা এবং তাঁর মা গিরিবালা মাসিমা, দুই বোন কাতুদি ও কল্যাণীদি, ভাই সুহৃদকুমার মুখোপাধ্যায়—আমাদের সুদা মিলে আমরা সবাই একই আশ্রম পরিবারভুক্ত ছিলাম। গুরুদেবসহ অল্পসংখ্যক সেদিনের আশ্রমবাসী আমরা সবাই সবার ছিলাম আপন জন। আমার বাবা প্রভাতদার মায়েরও 'বাবা' ছিলেন। শান্তিনিকেতনে আমার বাবার দুটি কন্যে ছিলেন—একজন প্রভাতদার মা, অন্যজন অজিত চক্রবর্তী মহাশয়ের মা। এঁরা দুজনেই আমার বাবাকে ঠিক আমাদেরই মতো গলা ছেড়ে "বাবা বাবা" বোলে ডেকে কথা বলতেন। আর বাবাও এঁদের অত্যন্ত স্নেহমাখা সুরে 'কন্যে' বোলে সম্বোধন করতেন। তাই আমার ছোটো বেলার সব স্মৃতির মধ্যেই তো প্রভাতদা জড়িয়ে আছেন।

মনে পড়ছে, বিদ্যালয়ে পাঠের শুরুর দিকে আমরা আসন খাতা হাতে ক্লাসে যাই, পড়াশুনো কিন্তু করি না। শুধু বন্ধুরা মিলে আশ্রমে ঘুরে ঘুরে বেড়াই আর গাছের খাদ্য অখাদ্য ফল সংগ্রহ কোরে আনি। ঝিনুক ফুটো কোরে কাঁচা আম ছাড়িয়ে নুন মেখে কারমাইকেল বেদীর উপরে পা ছড়িয়ে বসে খাই, মন্দিরের সিঁড়িতে বসে ইঁট দিয়ে বহেরার বাদাম বার কোরে ইঁটের গুড়ো মাখানো সেই বাদাম খাই, হল্‌দে হল্‌দে পাকা

বকুল ফল খেয়ে তার কষে আমাদের গলা যায় বন্ধ হয়ে, সফেদা পেড়ে চালের ভিতর রেখে দিয়ে ধৈর্য ধরতে পারি না, আধ-পাকা সফেদাই কেটে খেয়ে নিই, কোঁচড় ভরা পেয়ারা তো খাই-ই। বসন্তকালে রসেভরা মহুয়া থেকে আরম্ভ কোরে পোকা-পিঁপড়ে শুদ্ধ ফুলের মধু চুষে চুষে খাওয়া কিছুই বাদ যায় না আমাদের।

কিন্তু আমাদের সব থেকে বেশি লোভ ও আকর্ষণ ছিল প্রভাতদার দেওয়া লজেন্সের উপর—রাজভোগ যেন। সেকালে অফিস বল, লাইব্রেরি বল, কোথাও কোনো সময়েই কারোর যাওয়ায় কোনো বাধা ছিল না। শালবীথিকার ধারে লাইব্রেরির একটি ঘরে চৌকিতে বসে প্রভাতদা লেখাপড়া করেন। লাইব্রেরিতে ঢুকেই আমরা সোজা চলে যেতাম প্রভাতদার ঘরে, লোভাতুর মুখে গুটি গুটি গিয়ে বসতাম তাঁর চৌকির এক পাশে। প্রভাতদার ডাইনে বই, বাঁয়ে বই—ঘরের ছাদ পর্য্যন্ত উঠে গেছে তাকে থরে থরে সাজানো বই। বিশৃঙ্খলায় ছড়ানো ছিটোনো বই-এর মধ্যে তাঁকে কখনো দেখি নি। সুদক্ষ হাতে বিষয়বস্তু বিচারে সাজানো বই-এর মধ্যে ডুবে থাকা প্রভাতদা আমাদের দেখে স্মিত হাস্যে রঙীন লজেন্স ভরা শিশি বার কোরে সস্নেহে আমাদের সবার হাতে একটি কোরে লজেন্স দিতেন। পরে জীবনভোর কতো লজেন্স খেলাম কিন্তু প্রভাতদার দেওয়া অমন টকে মিষ্টিতে মেলানো সুস্বাদু লজেন্স আর কখনো কোথাও খেয়েছি বোলে মনে পড়ে না।

একবার এই লজেন্স খাওয়ায় ভীষণ এক বিপত্তি হ'ল আমার। প্রভাতদার হাত থেকে বড় একটি লজেন্স নিয়ে যেইনা মুখে দিয়েছি, একেবারে আমার গলায় গিয়ে সেটা আট্‌কে গেল, দম বন্ধ হয়ে প্রাণ যায় আর কি। প্রভাতদা ব্যাকুল হয়ে এক

হাতে আমার মাথাটি চেপে ধোরে অন্য হাতে আমার গলা থেকে লজেন্সটি বার কোরে আনলেন। আজ দিদিমা ঠাকুরমা হয়ে গেলাম, এখনো প্রভাতদা এই গল্পটি করতে খুব আমোদ পান। আর আমিও এই গল্পে প্রভাতদার স্নেহস্পর্শ পেয়ে অভিভূত হই।

বিদ্বৎ সমাজে সুপরিচিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের কন্যা সুধা দেবীর সঙ্গে ১৯১৯ সালে প্রভাতদার বিবাহ হ'ল। আশ্রমে শালবীথির দক্ষিণে মস্ত বট গাছ, যেটার উপরে চড়ে আমরা সারাদিন "বাঘা বাঘা" খেলতাম, যে বট গাছের নীচে রবিচ্ছত্রে বসে গুরুদেব ক্লাস নিতেন তার পাশে খড়ের চালাবাড়িটিতে নববধূকে নিয়ে প্রভাতদা এসে উঠলেন। সন্ধ্যায় বধূবরণ হ'ল, অনেক গান হ'ল। সেদিনের স্মৃতি কিছু ঝাপ্‌সা হয়ে এলেও প্লেট সাজানো খাবারের কথা মনে উজ্জ্বল হয়ে আছে।

এই সময় দিয়েই গুরুপল্লী তৈরি হয়েছিল। দেহলী বাড়ির পাশে নতুন বাড়ি ছেড়ে আমরা গুরুপল্লীতে চলে গেলাম। আশ্রম থেকে সোজা রাস্তাটি গুরুপল্লীর যে বাড়িটির সামনে গিয়ে পড়েছে, সেই বাড়িটিতে প্রভাতদাও সুধা বৌদিদের নিয়ে গিয়ে উঠলেন।

সুধা বৌদির হাতের স্পর্শে সেই বাড়ির গোছ গাছে বেশ একটু নতুনত্বের ছোঁওয়া লাগল। উত্তরায়ণকে বাদ দিলে প্রভাতদার বাড়িতেই প্রথম টেবিল চেয়ারে খাবার রেওয়াজ শুরু হয়েছিল। ডাইনিং টেবিল বলতে আজকাল যেমন বার্নিশ করা ঝকঝকে টেবিল বোঝায়, সে-রকম কিন্তু একেবারেই নয়। সস্তা কাঠের টেবিল—যাতে খাওয়াও চলে পড়াশুনোও চলে এবং তেমনি সাধাসিধে চেয়ার। কিন্তু এই টেবিল চেয়ার কি শোভাই-না ধরত যখন বুধবারে বুধবারে সকাল বেলায় টেবিল

ঘিরে চায়ের মজলিস বসত। মিনুদি, বারলীদি, শোভাদি, ইভাদিরা তো থাকতেনই অনাদিদা, বিশীদারাও থাকতেন। চায়ের পেয়ালা সামনে রেখে নানা বিদগ্ধ আলোচনাও চলত, জম-জমাট মজলিশ।

মঙ্গলবারে মঙ্গলবারে প্রভাতদার বাড়িতে সন্ধ্যার আসরে আবার আমরা ছোটোরাই ছিলাম প্রধান। এই আসরে সাহিত্য-সভা, অভিনয়, নাচ গান সব কিছু করাতেন আমাদের সুধা বৌদি। শান্তিনিকেতনের অনুষ্ঠানের যেন একটি ছোটো সংস্করণ। গুরুদেবের সঙ্গে কলকাতার মঞ্চে যে সব বালিকারা অভিনয় নৃত্য গীত কোরে পরে যশস্বী হয়েছে তাদের প্রায় সকলেরই হাতে খড়ি এই প্রভাতদার বাড়িতে সুধা বৌদির উৎসাহ ও উদ্দীপনায়।

সময় এগিয়ে চলে। আমরা বড় হয়ে উঠি। তখন প্রতি সন্ধ্যায় গুরুদেবের আসরে গিয়ে বসি। সেখানে প্রভাতদাও উপস্থিত থাকতেন। তখন তিনি 'রবীন্দ্রজীবনী' লেখা শুরু করেছেন। সেই বিষয়ে গুরুদেবের সঙ্গে তাঁর কথোপকথন শুনতে খুব ভাল লাগত। একাগ্র মনে প্রভাতদা গুরুদেবের কথা শুনতেন। মাঝে মাঝে গুরুদেব কৃত্রিম ভীতি প্রকাশ কোরে বলতেন "প্রভাতের সামনে মুখ খুলতে ভয় হয়। আমি যা বলব সবই যে ও ওর খাতায় টুকে নেবে।"

একদিন প্রভাতদার গভীর অনুসন্ধিৎসা এবং কঠোর পরিশ্রম সার্থক হ'ল। একটি একটি কোরে 'রবীন্দ্রজীবনী' চার খণ্ডে প্রকাশিত হ'ল। রবীন্দ্রনাথের পথে আলো দেখাবার বর্তিকা হ'ল এই 'রবীন্দ্রজীবনী'। আজ যাঁরা রবীন্দ্রচর্চা করবেন এই বর্তিকা হাতে না নিয়ে তাঁরা একপাও এগোতে পারবেন না। ভাবী কালের মানুষদের জন্য প্রভাতদার এই দান একটি অমূল্য সম্পদ হয়ে রইল।

আমাদের প্রভাতদা

কর্মযোগী প্রভাতদা আজও নিরলস ভাবে তাঁর কাজ কোরে চলেছেন। অল্প বয়েসী কয়েকটি ছেলে মেয়ে তাঁর কাজে সহযোগিতা করে। স্নেহভরা মনে এদের তিনি তাঁর নিজস্ব পদ্ধতিতে নিপুণভাবে কাজ শিখিয়ে চলেছেন। আজকাল যখনি তাঁর পাশে গিয়ে বসি, উদ্‌ভাসিত মুখে তিনি এই সুযোগ্য সহকর্মীদের কর্মকুশলতার কথা গর্বের সঙ্গে আমাদের বলেন। সার্থক শিষ্য গড়ে তোলার কী তৃপ্তি তাঁর মুখে। প্রভাতদার কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত আমাদের স্নেহের শ্রীমান দিলীপকুমার দত্ত এবং শ্রীমান প্রবীরকুমার দেবনাথ—এদের কাছে আমাদের অনেক প্রত্যাশা রইল।

প্রভাতদা নানা সম্মানে সম্মানিত হয়েছেন। আম্রকুঞ্জে যেদিন প্রভাতদাকে বিশ্বভারতীর সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মান 'দেশিকোত্তম' উপাধি দেওয়া হ'ল, সেদিন আমাদের মনে কী আনন্দ।

এই তো সেদিন প্রভাতদাকে ডি. লিট উপাধি দিতে রবীন্দ্র-ভারতীর কর্তা ব্যক্তিরা শান্তিনিকেতনে এসেছিলেন। গুরুদেবের প্রিয় শ্যামলী বাড়ির অঙ্গনে অপরাহ্ণ বেলায় সেদিন সুন্দর অনুষ্ঠানটি হ'ল। সুদর্শন প্রভাতদা গলায় মালা. কপালে চন্দন পরে বসে আছেন. তাঁরই পিছনে বসেছেন আমাদের কল্যাণী সুধা বৌদি, পরনে তাঁর লাল পেড়ে শাড়ি, সিঁথিতে সিঁদুর। নব বর-বধূ বেশে শান্তিনিকেতনে তাঁদের প্রথম আসবার দিনের ছবিটি যেন আবার সেদিন দেখতে পেলাম, অতীতের সুখস্মৃতি জড়ানো এই শ্যামলীর অঙ্গনে।

এমনই অপরাহ্ণ বেলায় গুরুদেব বসতেন ওই অঙ্গনে। তাঁকে ঘিরে বসতাম আমরা। প্রাঙ্গণের ধারের কাঠচাঁপা গাছ থেকে টুপ টুপ কোরে ঝরে পড়ত ফুল গুরুদেবের গায়ে মাথায়।

আমাদের সেই সেদিনের সুখী আশ্রমপরিবারের প্রভাতদা ও সুধা বৌদি আরও অনেক দিন সুস্থ শরীরে আমাদের মধ্যে থাকুন, তাঁদের স্নেহে আমরা ধন্য হই—ঈশ্বরের কাছে আমার অন্তরের এই প্রার্থনা জানাই।

অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

ধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

এমন অনেক ঘটনা আছে যা অতীত হয়ে গেলেও তার মূল্য কিছুমাত্র কমে যায় না; তাকে আবার নূতন করে স্মরণ করতে হয়। ১৯১১ সালের একটি ঘটনাকে অবলম্বন করেই আমার এই লেখাটি আরম্ভ করছি। সেই বছরের পূজার ছুটিতে শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমের নবীন অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ভ্রমণের উদ্দেশ্যে আগরতলায় এসে কর্ণেল মহিমচন্দ্র দেববর্ম্মা মহাশয়ের বাড়িতে উঠেছেন। একদিন বিকালের দিকে আমাদের উজীর বাড়িতে পিতৃদেবের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। সাধারণত পিতার সঙ্গে যাঁরা দেখা করতে আসতেন তাঁদের থেকে এই নূতন আগন্তুকের চেহারায় একটু অসাধারণত্ব সেই ছেলে বেলাতেই লক্ষ্য করেছিলাম। সৌম্য মূর্তি, বয়সে নবীন, মাথায় সামান্য দীর্ঘ কালো কেশগুচ্ছ, দাড়ি গোঁফ খুব একটা দীর্ঘ নয়। গৌরবর্ণ, দেখতে সুশ্রী। পরিধানে ধুতি ও পাঞ্জাবী। একটি সাদা চাদর গায়ে জড়ানো। পিতা তাঁর সঙ্গে আলাপ করে আশ্রম-বিদ্যালয়ের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারলেন এবং বেশ খুশি হলেন। পূজার ছুটির শেষে আমার বড় ভাই ও আমি শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রমে এসে ভর্তি হলাম। আশ্রম-বিদ্যালয়ের পরিধি তখন খুবই ছোট এবং ছাত্র সংখ্যাও কম, ছাত্রীদের সংখ্যা চার পাঁচ জনের বেশি নয়। তাঁরা বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের কন্যা বা ভগ্নী হতেন। বাস করতেন শিক্ষকদেরই গৃহে। গুরুপল্লী নির্মাণের কোনো কল্পনা তখনও হয় নি।

অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

প্রাক্-কুটীরের পশ্চিমে দোতালা গৃহের উপর তলার নাম ছিল বল্লভী কুটীর. চালটি ছিল খড়ের। এটি একটি ছাত্রাবাস এবং নীচের কয়েকটি মাত্র ঘর নিয়ে বিদ্যালয়ের লাইব্রেরী। তারই পুবের একটি কোঠাকে কিছুদিনের জন্য ছাত্রদের প্রয়োজনীয় খাতা, বই, সাবান দ্রব্যাদি রাখবার ডিপোজিট-ঘর রূপে ব্যবহার করা হত। পরে এই ঘরটিতে সঙ্গীতজ্ঞ ভীমরাও শাস্ত্রী সঙ্গীতের ক্লাশ করতেন। লাইব্রেরীর প্রধান ঘরটিতে প্রবেশ করে প্রথমেই চোখে পড়তো চার পাশের দেয়াল ঘেঁষে বইয়ে ভরা র‍্যাকগুলোকে, আর পশ্চিমের দেয়ালের ডান দিকে কিছু উপরে চেয়ারে ঈষৎ হেলান দিয়ে হাতে বই নিয়ে পড়ছেন। মুখে ছোট ছোট গোঁফ-দাড়িসহ একজন সুশ্রী ব্যক্তির বড় একটি আলোকচিত্র টাঙানো ছিল। অনেক সময় প্রভাতবাবুর ছবি বলে ভুল করেছি, কারণ ফটোর সঙ্গে তাঁর চেহারার সাদৃশ্য ছিল। পরে জানতে পেরেছিলাম ছবিটি বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের। ঘরটির এক পাশে টেবিলের উপরে স্তুপীকৃত পুস্তক ও কাগজ নিয়ে চেয়ারে বসে সর্বদা লেখার কাজে ব্যস্ত থাকতে দেখতাম প্রভাতবাবুকে। এই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তাঁকে ছাত্রদের ক্লাশেও পড়াতে হত। ছোট বেলায় তাঁর কাছে আমরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের ক্লাশ করতাম। আমাদের প্রত্যেক ছাত্রের নিকটে একটি করে ছাপানো খাতা থাকতো, তার প্রতিটি পৃষ্ঠা কতকগুলি লাইন দ্বারা ছোট ছোট ঘরে ছক্ কাটা ছিলো। প্রত্যেক ছকের মাথায় এক একটি কথা লেখা থাকতো। যেমন—দিনের তাপ, আকাশের অবস্থা, মেঘের ধরণ, বায়ুর চাপ, ঝড়ের বেগ, বৃষ্টি-পাত ইত্যাদি। লাইব্রেরীর বাইরের বারান্দায় দেয়ালের গায়ে একটি ব্যারোমিটার ও থার্মোমিটার টাঙানো ছিল প্রাতে,

দুপুরে ও সন্ধ্যায় দিনের তাপ কত, বায়ুর চাপ, আকাশে মেঘ থাকলে মেঘের বর্ণনা, বৃষ্টি হয়ে গেলে কত ইঞ্চি বৃষ্টি হল— সবই সেই খাতায় লিখে রাখতে হত। সব চাইতে মজা হত যখন দারুণ গ্রীষ্মে বায়ুকোণ থেকে বিকালের দিকে কাল-বৈশাখী ঝড় শুরু হত। প্রবল বায়ু বেগে আকাশে উত্তাল কালো মেঘের দল আর উন্মুক্ত প্রান্তরে ধুলোর ঝড় সাঁই সাঁই শব্দে চতুর্দ্দিক অন্ধকার করে ছুটে আসত। আকাশে, বাতাসে আর ধুলোয় মিলে প্রকৃতির ভয়ানক রুদ্ররূপের তাণ্ডব লীলা মনে যেমন ভয়ের সৃষ্টি করত আবার তেমনি মুগ্ধও করত। শান্তিনিকেতনের প্রকৃতির যেন নিজস্ব এই রূপটি। আমরা তখন ছুটে গিয়ে জড় হতাম লাইব্রেরীর বারান্দায়, দেখতাম ব্যারোমিটারে কত বায়ুর চাপ ও ঝড়ের বেগ নির্দ্দেশ করছে এবং নিজেদের পর্যবেক্ষণের খাতায় সেকথা লিখে রাখতাম। প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের শিক্ষার দ্বারা ধীরে ধীরে প্রকৃতির প্রতি সচেতন হওয়ার গুণটি মনের মধ্যে গড়ে উঠেছিল। সেই শিক্ষার সুফল এই বৃদ্ধ বয়সে ভালোভাবে এখন উপলব্ধি করতে পারছি।

কয়েক বছর পরে শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর নিকটে আমরা ভূগোলের ক্লাশ করতাম। তিনি লাইব্রেরীতে কাজ করতেন বলে সুবিধার জন্য তাঁর ক্লাশগুলি লাইব্রেরীর নিকটেই হত। প্রাক্-কুটীরের উত্তরের অপ্রশস্ত বারান্দার পশ্চিম প্রান্তে তিনি আমাদের ক্লাশটি নিতেন। নিকটেই ছিল ছায়াময় প্রাচীন একটি বিরাট সফেদা গাছ। ক্লাশটি আমাদের নিকটে খুবই আকর্ষণীয় ছিল। গল্পের ছলে তিনি নানা দেশের কথা বলে শোনাতেন। দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকার মাঝে পানামা খালে কি করে বড় বড় জাহাজগুলিকে এক দিক থেকে অন্য

দিকে পার করে দেয় তার ছবি দেখিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। বারান্দার উপরে ছাত্রদের দিয়ে মাটির একটি বড় আকারে ইটালী দেশের রিলিফ মানচিত্র তৈরি করিয়ে ছিলেন। পাহাড়ের উচ্চতা, নদী ইত্যাদি সবই দেখানো ছিল এই মানচিত্রটিতে। দুই উদ্দেশ্যে এই মানচিত্রটিকে কাজে লাগিয়ে ছিলেন। ছাত্রদের ইটালী দেশের ভৌগোলিক ধারণা দিতে মানচিত্রটি ব্যবহার করতেন, আবার প্রয়োজন হলে অন্য উদ্দেশ্যেও কাজে লাগাতেন। কোনো ছাত্র যদি পড়া তৈরী না করে ক্লাশে আসত এবং তাঁর দেওয়া প্রশ্নের ঠিক উত্তর দিতে না পারত, কিম্বা কেউ যদি ক্লাশে দুষ্টুমি করত তাহলে সেই ছাত্রকে তিনি বিশেষ সম্মানে ভূষিত করতেন! তাকে ইটালীর রাজা করে দিতেন, অর্থাৎ মানচিত্রটির ধারে গিয়ে হাঁটু গেড়ে থাকতে হত। কোনো ছাত্ররই এই সম্মানের প্রতি কোনো লোভ ছিল না।

আশ্রম-বিদ্যালয়ের ছাত্রদের সবল স্বাস্থের প্রতি এক সময়ে কর্তৃপক্ষ সর্বদা লক্ষ্য রাখতেন। শীতকালের অতি ভোরে গৌরপ্রাঙ্গণে শিশু বিভাগের ছাত্রদের বাদে সকলকেই ব্যায়ামে এসে যোগ দিতে হত। প্রভাতবাবুর স্বাস্থ্য বেশ ভালো ছিল, তিনি ছাত্রদের মাঝখানে দাঁড়িয়ে নিজে ব্যায়াম করতেন এবং ছাত্রদেরও করাতেন। তারপরে প্রাক্-কুটীরের উত্তরে বড় কূয়োতে গিয়ে ঠাণ্ডাজলে সকলে স্নান করতেন। আশ্রমের দৈনিক জীবনের সব কর্মেই তিনি যোগ দিতেন। বই আনতে লাইব্রেরীতে যখনই যেতাম তখনই লক্ষ্য করতাম নিবিষ্ট মনে চেয়ারে বসে স্তূপীকৃত বই আর কাগজ নিয়ে তিনি লেখার কাজে ব্যস্ত। এক সময়ে বিদ্যালয়ের অধ্যাপকগণ সন্ধ্যায় বিনোদন-পর্বে ছাত্রদের গল্প বলে শোনাতেন। নাট্যগৃহে সন্ধ্যায়

অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

কয়েকদিন ধরে প্রভাতবাবু স্যার আর্থার কনানডয়ালের 'হাউণ্ড অফ দ্য বাস্কারভিলস'-এর গল্প বলে শুনিয়েছিলেন। গল্পটা কী যে ভালো লেগেছিল সে কথা আর বলবার নয়। এখনও যেন সেই জলাশয়ের ধারে হাউণ্ড কুকুরের ডাক কানে বাজে।

ধীরে ধীরে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র জীবন অতিক্রম করেছি। বয়সেও কিশোরত্ব সবেমাত্র পার হয়েছি। গান বাজনায় আশ্রম-বিদ্যালয়ের বিভিন্ন সভা-সমিতিতে যোগদান করতাম। এক সন্ধ্যায় পুরোনো লাইব্রেরীর সামনে নাচের বারান্দায় একটি সভার আয়োজন হয়েছিল। সেই সভায় একজন নবাগতা মহিলা এস্রাজ বাজালেন। মনে ঔৎসুক্য জেগেছিল ইনি কে, পূর্বে ত এঁর বাজনা কখনও শুনি নি। পরে খোঁজ নিয়ে জেনেছিলাম তিনি প্রভাতবাবুর নববধূ। গুরুপল্লীতে পর পর অনেকগুলি গৃহ ছিল, তিনি তখন সেই-খানকার একটি গৃহে বাস করতেন। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রথম পর্বে এমন একদিন ছিল যখন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অধ্যাপক ও ছাত্রগণ সম্পূর্ণ ভাবে উদ্বুদ্ধ ছিলেন। কেবল মুখের কথায় নয়, তাঁদের প্রতি আচরণে, কথাবার্তায় এই আদর্শ প্রতিফলিত হত। তখন তাঁরা সত্যিকার আশ্রমবাসী ছিলেন। স্পর্শমণি রবীন্দ্রনাথের সংস্পর্শে এসে এবং তাঁর উৎসাহে অনেক অধ্যাপক বিদ্যাচর্চায় আত্ম-ক্ষমতার সন্ধান পেয়ে তার উন্মেষ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এক এক বিষয় নিয়ে কী নিষ্ঠার সঙ্গে নিবিড় ভাবে দিনের পর দিন ধরে তাঁরা অনুশীলন কাজে ব্রতী ছিলেন! সেই সব অধ্যাপকদের অন্যতম হলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

পরবর্তীকালে তাঁর দীর্ঘকালের একাগ্র সাধনার ফলস্বরূপ 'রবীন্দ্রজীবনী' যখন পুস্তকাকারে প্রকাশিত হল, তখন বিদ্বৎ সমাজ তাঁর সাফল্যে প্রশংসায় মুখরিত। এই গ্রন্থ যেন রবীন্দ্র-জীবনের মহাভারত। শুধু রবীন্দ্রনাথের জীবন-কথা নয়, রবীন্দ্রনাথ সংক্রান্ত বহুবিধ তথ্যাদিতে এই গ্রন্থ পূর্ণ। বর্তমান এবং আগত কালের মানুষ যাঁরা রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে চাইবেন এই গ্রন্থ তাঁদের সহায়ক হবে। অবাক হতে হয় রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধে লেখকের এত খুঁটি নাটি তথ্যাদি সংগ্রহের ও পরিশ্রমের ক্ষমতা দেখে। তাঁর অন্যান্য বিষয়ে লেখা গ্রন্থাদি ছাড়াও শুধু 'রবীন্দ্রজীবনী' লেখার জন্য তিনি সাহিত্য জগতে চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবেন। সুসাহিত্যিক হিসাবেও তিনি বহু সম্মান লাভ করেছেন।

বর্তমানে ভুবনডাঙ্গার দক্ষিণে নিজ বাড়িতে বাস করছেন। এই পরিণত বয়সেও কয়েকজন যুবক কর্মীর সহায়তায় লেখার কাজে প্রতিদিন ব্যস্ত থাকেন। তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কর্মে আজও কিছুমাত্র ক্ষমতার অভাব হয় নি—এখনও অনেক কিছু বলবার, দেবার আছে। কিছুদিন পূর্বে এক বন্ধু ব্যক্তিকে বলেছিলাম যে, শিল্পে সঙ্গীতে কাব্যে সাহিত্যের ক্ষেত্রে মানুষের যতদিন বলবার দেবার কিছু থাকে ততদিনই বিধাতা তাঁকে সংসারে রাখেন। যার আর দেবার কিছু থাকে না তাঁকে তিনি অর্দ্ধচন্দ্রের দ্বারা না হলেও সস্নেহেই কাঁধে হাত দিয়ে বলেন,—শিশু ভোলানাথদের স্থান করে দেবার প্রয়োজনে এবার বাপুহে ভালোয় ভালোয় সংসার থেকে বিদায় নাও! শ্রদ্ধেয় প্রভাতবাবুর এখনও যখন অনেক কিছুই দেবার আছে তখন তাঁর কাছ থেকে সেই সব পাবার আশায় বিধাতার নিকট প্রার্থনা জানাই—তিনি শতায়ু লাভ করুন।

প্রভাতদা

কানাই সামন্ত

প্রভাতের ফুল ফুটিয়া উঠুক
সুন্দর পরিমলে।
সন্ধ্যাবেলায় হোক সে ধন্য
মধুরসে-ভরা ফলে।

এই আশীর্বাদ করেছিলেন কবি, পূর্ণের প্রসাদ কামনা করেছিলেন যাঁর তরুণ-জীবনের প্রভাতকালে, ঋষি-কবির ঐ আশীর্বচনকে সত্যই সাকার করেছেন সার্থক করেছেন তিনি প্রায় সপ্ততিবর্ষের অক্লান্ত আর অনবচ্ছিন্ন সাধনায়। মহতের উচ্চারিত আর অনুচ্চারিত আশিস্ সব সময় সকলের জন্য হলেও, সকলে তা গ্রহণ করতে পারে না একনিষ্ঠ সাধনার অভাবে। যেমন রুদ্ধ কক্ষের বাইরে থেকেই বারংবার ফিরে যায় আকাশের আলো, অনন্তের প্রসাদ, তেমনি তো মহা-জীবনের সৌম্য সুন্দর আদর্শ আর ক্ষেমঙ্কর প্রভাব; আমরা কিছুই লাভ করতে পারি নে—সহস্র চক্ষুতে চেয়ে থাকলেও কে আমরা কতটুকু দেখি আর কী ই বা বুঝি!

কিন্তু কর্মময় জ্ঞানসাধনাময় দীর্ঘ জীবনে প্রভাতদা দেখে-ছেন যা দেখবার, অবিস্মরণীয় বাঙ্‌ময় রূপে রেখে গেছেন বর্তমান কাল ও ভাবীকালের ধ্যান-ধারণার জন্য।

যেমন জীবন তেমনি জীবনীকার সন্দেহ নেই। প্রভাতদা'কে স্মরণ করতে গেলেই সর্বাগ্রে স্মরণ করতে হয় তাঁর মহাভারত--তুল্য রবীন্দ্রজীবনী। দুই—পরে চার খণ্ডে সম্পূর্ণ হয়েও যা সম্পূর্ণ হয় নি আজও—সজীব সত্তার মতোই চিরবর্ধিষ্ণু ও

বিকাশমান। সারস্বত সাধনায় আরো নানা দিকে নানা মহার্ঘ দান রয়েছে প্রভাতদা'র, কিন্তু রবীন্দ্রজীবনীই তাঁর সারাৎসার সিদ্ধি বা সফলতা—এ কথা কে না স্বীকার করবে?

যেমন জীবন তেমনি জীবনী-লেখক, এ কথার কথা নয়। এ দেশে এই কালে আউল বাউল সাঁই দরবেশের দলে ভিড়ে কোনোরূপ সাধনা করি আর না-করি, সাধনা মাত্রই আমাদের পরধর্ম হোক বা না-হোক—সকলেই আমরা 'সহজিয়া'। সাধনা ব্যতীতই সিদ্ধি, কর্ম বিনা কৃতকার্যতা, সুলভ খ্যাতি প্রতিপত্তি বিত্ত বিভব এই যেন আমাদের অন্বিষ্ট। এ জিনিষ পাওয়া যায় না বলেই আক্ষেপ আক্রোশ বা হতাশারও সীমা পরিসীমা নেই। সংবাদপত্রে প্রত্যহ সন্ধান করি 'আজ দিনটা কেমন যাবে', কোনো 'প্রাপ্তিযোগ' আছে কি নেই। হা ঈশ্বর! ছেনি ধ'রে গ্রানাইট পাথর কেটে কেটে দিনের পর দিন বৎসরের পর বৎসর একাগ্র ধ্যান ধারণা পরিশ্রমে অভ্রংলিহ মন্দির বা অনিন্দ্যসুন্দর মূর্তি রচনা, সত্য সুমহানের কোনো স্বপ্নকে সাকার ক'রে তোলা—এ ইচ্ছাই আমাদের হয় না, এ শক্তিও নেই। ইচ্ছার অভাবেই শক্তি নেই, এ কথা ঠিক।

রবীন্দ্রনাথে দেখি এর ব্যতিক্রম আর দীর্ঘকাল ধ'রে যিনি তাঁর জীবনী লিখেছেন, লিখছেন, তাঁরও জীবনে। এই মহাগ্রন্থ রবীন্দ্রজীবনের আকরগ্রন্থ বটে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে এ ক্ষেত্রেও খাটবে সন্দেহ নেই কিন্তু এ তবু রবীন্দ্র-শব্দসূচী বিষয়সূচী ঘটনাসূচী বা অভিধান নয়—এর মধ্যেই রয়েছে সুমহৎ রবীন্দ্রজীবনের বিচার বিবেক আলোচনা। রবীন্দ্রজীবনদর্শনের দিশা ও নিশানা। মননশীল নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেই তা সমাধা হয়েছে; মননীয় বিষয়ে একান্ত অনুরাগ থাকলেও, মোহময় পক্ষপাত কোথাও দেখি নে।

প্রভাতদা'র সুচির সাধনায় লাভবান হয়েছে বর্তমান আর ভাবীকাল। যদি তেমন আর-কোনো মহাকবি জন্মেন আর--কোনোদিন ভারতে, রবীন্দ্রনাথকে নিয়েই মহাকাব্য রচনায় যাঁর সাধ ও সাধনা, আমাদের মতো তাঁকেও ঋণী থাকতে হবে শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিকটে।

নবতিবর্ষপূর্তির সিংহদ্বার ঐ অদূরে। উপনিষদ্ বলেন সুস্থ এবং স্বস্থ দেহে মনে জিজীবিষেচ্ছতং সমাঃ। শ্রদ্ধাবনত-চিত্তে আমরাও তাই বলি।

একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধক

সুরজিৎ সিংহ

১৯৭৮ সালের ২৫ শে জুলাই সকালে প্রভাতদার পরিচিত কণ্ঠে টেলিফোন পেলাম—"সুরজিৎ, মোটে ৮৬ বছর পূর্ণ হোল। কারখানায় কি কাজ চল্‌ছে, একবার দেখে যেও।"

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের 'কারখানা' দেখলে সত্যিই বিস্মিত হ'তে হয়! কী বিচিত্র তার বিস্তৃতি ও সুশৃঙ্খল বিন্যাস! রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রতিদিনের ঘটনার কার্ড তৈরী হয়ে রয়েছে। এখনও নতুন কোনও সংবাদ চোখে পড়লে খালি কার্ড পূরণ করা হচ্ছে।

রবীন্দ্র-জীবনকে কেন্দ্র করে ও অতিক্রম করে তাঁর চর্চার পরিধি আজও বহুধা বিস্তৃত। এই মহাগ্রন্থাগারিক আজও গ্রন্থাগার-বিজ্ঞান বিষয়ে নতুন ভাবে চিন্তা করছেন।

পশ্চিমবঙ্গের নিম্নবর্গের জাতিদের সামাজিক আন্দোলন এবং নানা ধর্ম সম্প্রদায়ের লৌকিক বিশ্বাস, সংগঠন ও আচার বিষয়ে তথ্য ও তত্ত্ব অনুসন্ধানে প্রভাতকুমার আজও আমাদের অনুপ্রেরণা দান করছেন।

সামান্য ব্যবহারিক উপকরণ নিয়ে একটি সুদৃঢ় আধুনিক মন বহন করে একনিষ্ঠ জ্ঞান-সাধক প্রভাতকুমার আরও বহু বছর আমাদের জ্ঞান-চর্চার কর্মে অনুপ্রাণিত করুন। তাঁর শতায়ু কামনা করি।

কাছের মানুষ প্রভাতকুমার

জয়কুমার চট্টোপাধ্যায়

কোনো বিষয় বা বস্তু সম্পর্কে সম্যক্ ধারণা লাভের পথে অতি-দূরত্ব যেমন একটি প্রধান বাধা, অতিনৈকট্যকেও পণ্ডিত-গণ তেমনই সে পথের অন্যতম অন্তরায় রূপে গণ্য করেন। ব্যক্তি সম্পর্কে সম্ভবতঃ শেষোক্ত কারণটি তেমন বিপত্তি ঘটায় না। তা না হলে কোনো ব্যক্তি সম্পর্কে উৎসুক পাঠক--পাঠিকা তাঁর নিকট-জনের বক্তব্য শুনতে চান কেন? সেই ঔৎসুক্যের ওপর আস্থা রেখেই রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে কিছু অন্তরঙ্গ প্রসঙ্গের অবতারণা করছি। আশা করি সহৃদয় পাঠক সর্বজনবিদিত কোনো তথ্যের অল্পোক্তিকে আমার অতিপরিচয়-জনিত ঔদাসীন্য বা অন্যের অজ্ঞাত তথ্যের বিস্তারিত আলোচনাকে 'চোরের লক্ষণ' বলে চিহ্নিত করবেন না।

১৯৫৭ সালের ২৭ শে জুলাই আমি সর্বপ্রথম রবীন্দ্র-জীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সান্নিধ্যে আসি নিতান্তই আকস্মিকভাবে। তখন সব দিক দিয়েই আমার দুর্দিন চলছিল। আর্থিক কারণে আই. এ পাশ করার পর আমার পড়া বন্ধ। শারীরিক অসুস্থতাও দুশ্চিন্তার সীমা অতিক্রম করেছিল। সেই দুঃসময়ে আমি আশ্রয় পেয়েছিলাম রবীন্দ্র-জীবনীকারের গৃহে। আমার থাকা, খাওয়া, রোগের চিকিৎসা, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়া ইত্যাদির ভার তখন থেকে তাঁর। আর আমার মানসিক গ্লানি কাটাবার জন্য তিনি আমাকে দিয়েছিলেন তাঁর চার খণ্ড রবীন্দ্রজীবনী, 'বাংলা গ্রন্থ বর্গী-

করণ', 'পৃথিবীর ইতিহাস', 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' প্রভৃতি গ্রন্থের প্রেস কপি তৈরী করার কাজ। তৎসহ তাঁরই নির্দেশ অনুযায়ী কিছু কিছু তথ্যাদির অনুসন্ধান ও পরিমার্জনা। রবীন্দ্রজীবন এবং সাধারণ পাঠক-পাঠিকার মধ্যে জীবনীকার রচিত বিরাট সেতুবন্ধের কাজে আমার কাঠবিড়ালীসদৃশ ওই ভূমিকাটুকুর গৌরব 'লিখে রেখো এক ফোঁটা দিলেম শিশির'—কবির এই পরিহাস বাক্যের মতই হাস্যকর। তবু আলোচ্য রচনার প্রথম অনুচ্ছেদের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে সংক্ষেপে এই 'শিবের গীত'-টুকু গাইতেই হলো।

১৯৫৭ থেকে এখন পর্যন্ত সুদীর্ঘ তেইশ বছর ধরে আমি জীবনীকারকে দেখছি। দেখছি অত্যন্ত কাছ থেকে। প্রথমে বলি তাঁর নিয়ম-নিষ্ঠার কথা। আমাদের দেশে মোটামুটি ষাট বছর বয়সকেই বার্ধক্যের সীমারেখা ধরা হয় সঙ্গত কারণেই। কিন্তু ছেষট্টি বছরের (১৯৫৭) প্রভাতকুমারকে বোলপুর ডাকবাংলোর মাঠে প্রভাতে ভ্রমণ-কালে যাঁরা দেখেছেন তাঁরা একটি শক্ত-সমর্থ যুবককেই হাঁটতে দেখতেন। মাঠে পাঁচ-ছ' পাক ঘোরার পর তিনি যখন ফিরতেন তখন সূর্যোদয় হতো। প্রাতঃরাশের পর পড়ার টেবিল। বেলা এগারটা পর্যন্ত টানা পাঁচ ঘণ্টা। তখন ন'টার সময় বিস্কুট আর কফি খেতেন; আর মুখে থাকতো একটি চুরুট। লিখতে লিখতে মাঝে মাঝে আবার দু'তিন মিনিট ব্যায়াম করতেন। এই ব্যায়াম-চর্চাটা স্নানের পূর্বেই বেশী হতো। দুপুরে খাওয়ার পরে আধঘণ্টার সংবাদপত্র পাঠ—ওইটুকু বিশ্রাম। তারপর আবার পড়ার টেবিল। সূর্যাস্তের আগে পর্যন্ত লেখা। এর মধ্যেই আবার জমির ধান, আখের গুড়, মাছের পোনা, দলিল দস্তাবেজ, রাজমিস্ত্রির কাজ ইত্যাদির

হরেক-রকম ঝামেলাও থাকতো। কিন্তু কোনো কারণেই লেখাপড়ায় বিরতি ছিল না। তিনি বলতেন 'আসনসিদ্ধি'—আসনসিদ্ধি ছাড়া কোনো ব্রত উদ্‌যাপন করা যায় না। তখন সুযোগ পেলেই আসন ছেড়ে উঠে পড়তাম—এখনও আসন ছেড়ে পালাতে পারলেই বাঁচি—তবে পর্বতপ্রমাণ অকৃতকর্মের দিকে তাকিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার কথিত 'আসনসিদ্ধি'র সার্থকতার কথা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করি।

রবীন্দ্রজীবনীকার মূলতঃ ঐতিহাসিক। 'রবীন্দ্রজীবনী'ও একটি মহান জীবনের ইতিহাস। ইতিহাসের সত্য প্রধানতঃ তথ্যনির্ভর। এই তথ্য-সংগ্রহ আপাতদৃষ্টিতে অত্যন্ত নীরস এবং অনেকের কাছেই বিরক্তিকর। তাঁর সহায়করূপে কাজ করতে বসে যাতে আমি বাধ্যতামূলক কাজের বিরক্তিজনিত অবসাদে না ভুগি, সেদিকেও ছিল তাঁর সতর্ক দৃষ্টি। তিনি মাঝে মাঝেই জিজ্ঞাসা করতেন, 'বিরক্তি লাগছে না তো?' নিজের রচনা অন্যের একঘেঁয়ে লাগতে পারে, এ চেতনা তাঁর বরাবরই ছিল। সেই জন্যেই কখনো তাঁর রচনা অন্যকে পড়ে শোনাতে দেখি নি। তবে খুব কাছের দু'একজনকে না-দেখিয়ে কখনো কোনো লেখা প্রেসে দিতেন না, এখনও দেন না। এ বিষয়ে তাঁর অব্যবহিত পরামর্শদাত্রী ছিলেন তাঁর সহধর্মিনী শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়।

অনেক প্রাজ্ঞ প্রাচীন গবেষক আধুনিক সাহিত্য সম্পর্কে হয় উদাসীন, নয় খড়্গহস্ত। বিশেষতঃ আধুনিক কবিতা প্রসঙ্গে একটি তাচ্ছিল্যের ভাব অনেকেই পোষণ করেন। প্রভাতকুমারের চিরনবীন মানসিকতা এই বিমুখতার ব্যতিক্রম। তিনি এখনও মনে করেন মানব-মনোরাজ্যে একটি সুবৃহৎ গবেষণা-গ্রন্থ অপেক্ষা একটি ক্ষুদ্র মৌলিক কবিতা বা ছোট-

গল্পের মূল্য অনেক বেশী। তাঁর কাছ থেকে বহু তরুণ কবি-সাহিত্যিক অকৃত্রিম উৎসাহ পেয়েছেন এবং এখনও পান। 'কল্লোল' যুগের তরুণ কবি সুকুমার সরকার থেকে অত্যাধুনিক অখ্যাত পল্লী কবিরাও তাঁর স্নেহধন্য।

নানা বিদ্যার চর্চার জন্য বোলপুর-শান্তিনিকেতনে যাঁরা আসেন—তাঁদের একটি অবশ্য গন্তব্যস্থল রবীন্দ্রজীবনীকারের গৃহ। রবীন্দ্র-জীবন ও সাহিত্য সম্পর্কে বহু বিশেষজ্ঞ বোলপুর--শান্তিনিকেতনে আছেন। সেই অজস্র তথ্যের ভাণ্ডারীগণও প্রভাতকুমারকে শ্রদ্ধা করেন একজন নির্ভরযোগ্য কাণ্ডারীরূপে। শ্রীযুক্ত অমল হোম, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, লিওনার্ড এল্‌ম্‌হার্স্ট্‌ প্রমুখ দিক্‌পালদের দেখেছি তাঁরই গৃহে।

'দুর্দান্ত পাণ্ডিত্যপূর্ণ' ব্যক্তিরাও মাঝে মাঝে আসতেন এবং আসেন। দশ মিনিট কথা বলার পরই বোঝা যেত তাঁরা কথা বলছেন ঔপন্যাসিক প্রভাতকুমারের সঙ্গে। সুরসিক জীবনীকার কখনও কখনও কোনো অভ্যাগতের সঙ্গে ব্যারিস্টার প্রভাতকুমারের অভিনয় করে দিব্যি সেই উপন্যাসগুলি সম্পর্কে আলোচনা করতেন যেগুলি আদৌ তাঁর রচনা নয়। আমরা প্রহসনের শেষ দৃশ্যের অপেক্ষায় থাকতাম। আসল সত্য ফাঁস হয়ে গেলে অপর পক্ষের পাণ্ডিত্যের বেলুন-চুপ্‌সে-যাওয়া কাঁচুমাচু ভাবটি উপভোগ্য হয়ে উঠতো।

তিনি নাকি ঐতিহাসিক, তাঁর নাকি সাহিত্যরসে বিশেষ অধিকার নেই—এ রকম কথা তিনি মাঝে মাঝে বলেন। আমার মন কোনো দিন তাঁর এ কথায় সায় দেয় নি। যদি রসবোধই না থাকবে তাহলে তিনি দৈনন্দিন জীবন-জটিলতাকে উপলক্ষ করে বাংলা এবং রবীন্দ্র-সাহিত্য থেকে জুৎসই উদ্ধৃতি দেন কি করে? একবার সুদীর্ঘ এক মাস ধরে শান্তিনিকেতনের

একজন প্রয়াত অধ্যাপকের সঙ্গে তিনি গ্রীক নাটক সম্পর্কে আলোচনা করেন। প্রতিদিন বিকেলে দু'তিন ঘণ্টা আলোচনা। অধ্যাপক মহাশয় ছিলেন নীরব শ্রোতা। আর অবাক্ আমি, ওই এক মাস ভেবেছি, এই কি সাহিত্য-রসবোধের ন্যূনতার পরিচয়? এ ছাড়া তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' যাঁরা পড়েছেন আশা করি তাঁরাও এ বিষয়ে আমার সঙ্গে একমত হবেন। সম্প্রতি প্রকাশিত তাঁর 'ফিরে ফিরে চাই' গ্রন্থটিও তাঁর সাহিত্য--রসবোধহীনতার বিপক্ষেই ভোট দিচ্ছে।

প্রভাতকুমারের স্মৃতিশক্তি অসাধারণ। ১৯৫৪ সালে অবসর প্রাপ্ত গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার আট-দশ বছর পরেও বাড়িতে বসেই বলে দিতেন কোন্ বই কোন্ শেল্ফ-এর কোন্ জায়গায় পাওয়া যাবে। গ্রন্থাগারটি স্থানান্তরিত হওয়ার পর এখন আর তা বলা সম্ভব নয়, তবে তাঁর সময়ের কিছু গ্রন্থের সংস্করণ সংখ্যা এমন কি মলাটের রং পর্যন্ত এখনও তাঁর মনে আছে। বার্ধক্যজনিত অনিবার্য স্মৃতিদৌর্বল্যে কোনো বিষয়, বস্তু বা ব্যক্তির নাম স্মরণ করতে না পারলে তিনি যে একটি অব্যক্ত অস্বস্তিতে কষ্ট পান তা অনুভব করা যায়। বছর তিনেক আগের একটি ঘটনা। ১৯৭৭-এর মাঝামাঝি কোনো সময়। আমি পাশের ঘরে ঘুমন্ত। হঠাৎ রাত দুটোর সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল। জীবনীকার প্রভাতকুমার তাঁর সহধর্মিনীর কাছে জানতে চাইছেন—"ফরাসী-বিপ্লবের সময়ে সেখানকার বিখ্যাত দার্শনিকের নাম কি?" ক্ষীণ-শ্রবণশক্তির জন্য তাঁর সহধর্মিনী প্রথমে মনে করেছিলেন বোধহয় চোর-টোর কেউ এসে থাকবে। পরে ব্যাপারটা বুঝতে পেরে তিনি দার্শনিকের নামটা বলে দিলেন। তারপর সব চুপচাপ। পরের দিন ভোরবেলা চায়ের আসরে এ নিয়ে আমাদের এক চোট্ হাসা-

হাসি হলো। রাত তুটোর সময় ফরাসী দার্শনিক—ভাবা যায়?

রবীন্দ্রজীবনীকার বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিকের দায়িত্বই শুধু পালন করেন নি—তিনি সেখানকার ইতিহাসের অধ্যাপকও ছিলেন। আমি তাঁর কাছে আসি তাঁর অবসর গ্রহণের পর। সুতরাং প্রচলিত অর্থে আমি তাঁর ছাত্র ছিলাম না—একথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু গত তেইশ বছরে নানাভাবে তিনি কত বিষয়ই না শেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর শিক্ষণ-পদ্ধতির প্রথম এবং প্রধান উপকরণ ধৈর্য। এই সুদীর্ঘ কালে আমি তাঁকে কোনো দিন ক্রুদ্ধ হতে দেখি নি। প্রিয় মিথ্যা অপেক্ষা অপ্রিয় সত্য বলাই তাঁর স্বভাব—কিন্তু সে কথা কখনই বিদ্বেষপ্রসূত নয়। তাঁর পরিহাস-বিদ্রূপে থাকে 'আধ-মরাদের ঘা মেরে' বাঁচাবার মন্ত্র। কখনও কোনো লেখকের রচনার নিন্দা করা তাঁর প্রকৃতি-বিরুদ্ধ। আর যাঁরা যে-কোনো জীবিকা বা পেশার সঙ্গে সঙ্গে কিছু পরিমাণও লেখাপড়া করার অভ্যাস রেখেছেন বয়সনির্বিশেষে তাঁদের প্রতি যে শ্রদ্ধা তিনি প্রকাশ করেন, তা বর্তমানকালের বিদ্বৎসভায় তুর্লভ। স্পষ্টবাদী প্রভাতকুমারের কাছে মেকি সাহিত্যিকদের যেমন রেহাই ছিল না, সত্যকার সাহিত্য অনুরাগীদের প্রতিও তেমনি তাঁর সহানুভূতির অন্ত নেই। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথাও বলা প্রয়োজন—ছাত্র ছাত্রীদের আহ্বানে তিনি সব সময় সাড়া দিয়েছেন। ছোট-বড় যে কোনো অনুষ্ঠানে তিনি সানন্দে হাজির হতেন। এখন এই অষ্টাশী বছর বয়সেও সভা-অনুষ্ঠান ইত্যাদি সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ বিন্দুমাত্র কমে নি। কিন্তু পরিবারের কনিষ্ঠদের শাসনে যেতে পারেন না—এটা তাঁর উপর একটা অগত্যা আরোপিত তুঃখ।

কাছের মানুষ প্রভাতকুমার

জীবনীকারের প্রদত্ত শিক্ষার প্রথম পাঠ ছিল সোজা হয়ে দাঁড়ানো, সোজা হয়ে বসা। সকাল-সন্ধে বেড়াতে হবে; কিন্তু অহেতুক আড্ডা নয়। আর একটি জিনিষকে তিনি খুব করুণার চোখে দেখতেন; তা হলো বাঙালীর দুরারোগ্য ব্যাধি দিবানিদ্রা। আমি তাঁর বাড়ির দোতলার একটি ঘরে থাকতাম। একদিন বিকেল বেলায় তিনি একতলা থেকে হাঁক দিলেন, 'ভারত, ভারত'। আমার নাম ভারত নয়। তবু নীচে নামতেই হল। নীচে নেমে এসে বুঝলাম তাঁর আহ্বানের উদ্দিষ্ট ব্যক্তিটি আমিই। জিজ্ঞাসা করলাম, 'ভারত কেন?' তিনি সংক্ষেপে বললেন, 'ভারত কেবল ঘুমায়ে রয়'। আমার স্বভাবদোষে সে নামটি এখনও মাঝে মাঝে উচ্চারিত হয়।

যে কাজ তিনি নিজে করতেন না, সে রকম কাজ করবার অসঙ্গত আদেশও দিতেন না। বাড়িতে কোনো কারণে কাজের লোক না এলে নিজের নিজের কাপড় জামা বা খাবার থালা-বাসন ধুয়ে নেওয়ার কাজটা মাঝে মাঝে বেশ আনন্দদায়ক অনুষ্ঠানের মতই মনে হত। এ কাজে তাঁরও সোৎসাহ অংশগ্রহণে দশের লাঠি একের বোঝা হয়ে উঠতো না, সাময়িক সমস্যারও সমাধান হয়ে যেত। এ বাবদ আমার একটি চিত্রের কথা মনে আছে। একদিন বাড়ির প্রাঙ্গণে তিনি যখন কলকাতা থেকে আগত কয়েকজন ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলছেন তখন তাঁর বাঁ-হাতে ছিল বালতি আর ডান হাতে একটি ঝাঁটা। দুর্ভাগ্যবশতঃ আমার হাতে ক্যামেরা ছিল না। থাকলে একটি প্রদর্শন-যোগ্য ছবির অধিকারী হওয়া যেত। ১৯৬৯ সালে গুরুতর রকমের অসুস্থতার আগে পর্যন্ত তাঁর কর্মপটুতা ছিল যে কোনো যুবকের ঈর্ষাযোগ্য।

রবীন্দ্রজীবনীকারের অসাধারণ সংকল্পশক্তির ফসল তাঁর অব্যর্থ সফল জীবন। তাঁর জীবন-পঞ্জীটি পড়লেই এ কথা সকলেই বুঝতে পারবেন। জীবনপঞ্জীতে যা লেখা নেই এমন দু'একটি কথা বলি। এক সময় তাঁর চুরুটের ধোঁয়ায় লাইব্রেরী ঘরে মশা বসতো না, রবীন্দ্রসদনের শতবার্ষিকী গবেষণা কক্ষটি যার প্রধান পরিচালক ছিলেন রবীন্দ্রজীবনীকার স্বয়ং—অনুসন্ধিৎসু দর্শকদের কাছে মনে হত তা যেন টিয়ার-গ্যাসে পূর্ণ—তিনি হঠাৎ একদিন সে নেশা চিরকালের জন্য ছেড়ে দিলেন। দীর্ঘকালের এই অভ্যাস ত্যাগ করা স্থির-সংকল্পের দ্বারাই সম্ভব। এই সংকল্পের জোরেই তাঁকে আর একটি সঙ্কট অতিক্রম করতে দেখেছি। পূর্বকথিত ১৯৬৯-এর সেই গুরুতর ব্যাধি তাঁর এক অঙ্গকে পক্ষাঘাতগ্রস্ত করে তুলে-ছিল। সে সময় চিকিৎসককে সহায়তা করেছিল তাঁর অসাধারণ মনের জোর। শুধু মনের জোরে কয়েক বছরের ভোগান্তিকে তিনি কমিয়ে এনেছিলেন মাত্র কয়েক মাসে।

শান্তিনিকেতনে সকলেই সোনার কলম নিয়ে শিক্ষকতা করতে আসেন নি। সাধনার ফলে কারো কারো খাগের কলম পরে সোনার কলম হয়েছে। এখানে বিদ্যালয় পত্তনের যুগকে কৃচ্ছ্রসাধনার যুগ বললে বাড়িয়ে বলা হয় না। স্বভাবতঃ সকলকেই হতে হয়েছিল মিতব্যয়ী। 'দীয়তাং ভুজ্যতাং' দূরের কথা, আত্মম্ভরী টাকা-ওড়ানোর লোক এখানে আগেও ছিল না, এখনও নেই। সকলেই নিজের আয় অনুযায়ী সমঝে চলেন। কিন্তু দোষী কেবল মৎস্যরাঙ্গা। চা খেতে খেতে অনেকের পরচর্চার প্রিয় প্রসঙ্গগুলির অন্যতম হলো—'প্রভাতদা'র কার্পণ্য'। নুন খাই যার, গুণ গাই তার—এই সহজ ফর্মুলায় যাতে না-পড়ি সেজন্য শুধু তথ্য নির্ভর প্রামাণিক কিছু কথা

এই রটনার বিপক্ষে বলতে চাই। ভুবনডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য এক বিঘা জমি দান, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে পাঁচ হাজার টাকা দান,—এ সব দাতার লক্ষণ না-হতে পারে, কিন্তু এ যে কার্পণ্য নয় নিঃসন্দেহে সে কথা বলা যায়। কোনো নামের জন্য নয়—বোলপুর সংস্কৃতি পরিষদ আয়োজিত একটি অখ্যাত 'দোল-মেলা'র (১৯৭৯) জন্য পাঁচশ টাকা দান – প্রভাতকুমার ছাড়া এ অঞ্চলে আর কেউ করেছেন কি না আমার জানা নেই। এ রকম অনেক দৃষ্টান্ত আমি দিতে পারি। কিন্তু তিনি যা অপরকে বলতে চান না, আমার লেখাতে তা প্রকাশিত হলে হয়তো তিনি রুষ্ট হতে পারেন। কাজেই তালিকা বর্ধনে বিরত হতে হল। এ প্রসঙ্গ আমার নিজের ভ্রান্তিনিরসনের একটি উপাখ্যান দিয়ে শেষ করি। তখন আমি বি. এ. পড়ি। জীবনীকার প্রভাতকুমারের পাশে বসে কাজ করছি। বাড়ীর বালক-পরিচারক বলু খবর দিল বাগানে ছাগল ঢুকেছে, গাছ খেয়েছে। ছাগলটিকে সে বেঁধেও রেখেছে। ঘণ্টা খানেক পর ছাগলের মালিক এলো। জীর্ণ বস্ত্র, হাড্ডিসার একটি লোক। জীবনীকার বললেন—"চার আনা পয়সা দিয়ে ছাগল নিয়ে যাও।" লোকটির কাকুতি-মিনতিতেও তিনি অনড়। আমি মনে মনে সেদিন তাঁর উপর রাগ করেছিলাম; আমার সমস্ত সহানুভূতি ছিল ওই লোকটির উপর। শেষ পর্যন্ত সে চার আনা পয়সা দিয়েই ছাগল নিয়ে গেল। ছোট্ট বলু সিকিটি পেয়ে আনন্দিত। আমার আন্তরিক আক্ষেপ তখন চরমে। কিন্তু সে অন্তর-গ্লানির ভার সম্পূর্ণ তিরোহিত হতে ঘণ্টাখানেকও লাগে নি। অনুরূপ শীর্ণ আর এক ব্যক্তি জানালার ওপারে দাঁড়ালো। তার বক্তব্য—বোলপুর হাসপাতাল থেকে সে সিউড়ি গিয়েছিল। বুকের ছবি তোলা

হয়েছে। এখন ওষুধের জন্য আশি টাকা চাই। জীবনীকার প্রভাতকুমার কোনো কথা না-বলে টেবিলের ড্রয়ার থেকে আটটি দশ টাকার নোট বার্ করে তার হাতে দিলেন। আমি সেদিন স্তম্ভিত হয়েছিলাম। অত্যন্ত দ্রুত ঘটে যাওয়া দুটি ঘটনাকে আমি মেলাতে পারি নি। পরে আমার কাছে এই গল্পটি শুনে আমার জনৈক শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক বলেছিলেন— প্রথম ঘটনাটি তাঁর আদর্শ, আর দ্বিতীয়টি তাঁর প্রকৃতি।

এবার তাঁর সখের কথা বলি। রেডিও, টেলিভিশন, বন্দুক বা নিত্যনূতন বই কেনা—এ সখ তো অনেকেরই আছে। আমার বক্তব্য সেগুলি নয়। তাঁর বাগান করার সখের কথা ধরা যাক্। তাঁর একটি ইতস্ততঃ অবিন্যস্ত ফুলের বাগান আছে, আর আছে সব্জি-বাগান। এ বাবদ দৈনিক চার টাকা মজুরিতে এক স্বাধিকারপ্রমত্ত তথাকথিত মালী আছে, আর আছে সে মালীর নানারকম বায়নাক্কা। এ ছাড়া বীজ, চারা, সার ইত্যাদির ব্যয় তো আছেই। বোলপুর-শান্তিনিকেতনের মরুভূমিতে ফলন কম। তার ওপর এখানে 'ভাইয়ের সঙ্গে ভাইকে সে যে করেছে এক-মন'; সুতরাং 'পরের দ্রব্য' কথাটি এখানকার অভিধানে নেই। সেই অদৃশ্য 'ভাই'-দের হাতে কিছু সব্জি অদৃশ্য হবার পর যা অবশিষ্ট থাকে তার হিসেব দিয়ে দেখা গেছে একটি কুমড়োর দাম পড়ে শতাধিক টাকা, এক কেজি বেগুনের মূল্য কয়েক শত টাকা। ফুলকপি-বাঁধাকপির মধ্যে শিশু-মৃত্যুর হার শতকরা একশ ভাগ। আমগাছে পেয়ারাগাছে নিখিলভুবন শিশুবর্গের অনাহূত অখণ্ড অনুষ্ঠান লেগেই আছে। কিন্তু জীবনীকারের বাগান করা ঠেকায় কে? বছরের পর বছর বাগান করার প্রচেষ্টা চলে পূর্ণোদ্যমে, আর ফল-

-অপহরণকারী শিশুপালের জন্য রক্ষিত লজেন্সের বয়াম্ খালি হলেই আবার পূর্ণ করা হয়। এ প্রকারের সখ তাঁর হরেক রকমের।

জীবনীকার সম্পর্কে আমার বলার শেষ নেই। একান্ত ব্যক্তিগত আবেগের কথা সচেতনভাবেই বাদ দিয়েছি। আমার পরিচিত কোনো ব্যক্তির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা সাবধানতার জন্য অনুল্লিখিত থাকলো। সেগুলিও ব্যক্তিমানুষ প্রভাতকুমারকে চিনিয়ে দিতে সাহায্য করতো। তবে আমার মনে হয় যথার্থ ব্যক্তিত্ব-সম্পন্ন মানুষের পরিচয় হীরের দ্যুতির মত নিজেই বিচ্ছুরিত হয়। শুধু দেখার রকম-ফের। আজ থেকে একুশ বছর আগে রবীন্দ্রজীবনীকার একই দিনে দুটি পোষ্টকার্ডে চিঠি পেয়েছিলেন। একজন লিখেছিলেন, 'রবীন্দ্রজীবনী'তে তিনি নাকি রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট পরিমাণে ব্রাহ্ম রূপে উপস্থাপিত করেন নি। অপর চিঠিতে অভিযোগ, জীবনীকার তাঁর গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের হিন্দুত্বকে ইচ্ছাকৃতভাবে চাপা দিয়েছেন। তিনি সেদিন শুধু একের চিঠি অন্যের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। আজ প্রভাতকুমার সম্পর্কে তাঁর পরিচিত জনের মনোভঙ্গি ও দৃষ্টিভঙ্গি আদান-প্রদানের অনুরূপ একটি উপলক্ষ হওয়াতে আমি আনন্দিত। এজন্য তরুণ সম্পাদকদের সানুরাগ শুভেচ্ছাসহ ধন্যবাদ জানাই। আর ভক্তিনম্র প্রণাম জানাই দেশিকোত্তম রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্তা সুধাময়ী মুখোপাধ্যায়কে॥

কারখানার কেন্দ্রস্থলে

প্রণয়কুমার কুণ্ডু

—"আমার কারখানাটা দেখে যাও।"
—"আমার কারখানাটা দেখে এসো।"

ইদানীং এই ধরণের কথা আমরা অনেকেই শুনেছি তাঁর মুখে, তাঁর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপে, ঘরোয়া বক্তৃতায়, নানা ভাষণে বা সম্বর্ধনার প্রতিবেদনে। জীবনের অনেকটা পথ চলে এসে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় নিজের কর্মকেন্দ্রকে বলেছেন 'কারখানা'। বুঝতে পারা যায়, নিজের জীবন ও কর্মধারা সম্পর্কে এই তাঁর পরিণত ও সর্বশেষ অনুভব; যেন তিনি তাঁর সুদীর্ঘ জীবনচর্যার ভিতর দিয়ে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণার একটি কারখানা গড়তে চেয়েছেন এবং সেই কারখানার কেন্দ্র-স্থলে দাঁড়িয়ে নিরলস অধ্যবসায়ে নিজেকে ব্যাপৃত রেখেছেন সেই কাজে, যা আজ তাঁকে পৌঁছে দিয়েছে সিদ্ধিলাভের চরম শীর্ষে। একদা তরুণ বয়সে গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে এসেছিলেন, অতঃপর, মূলত তাঁকেই সামনে রেখে নীরব সাধনায় সকলের অগোচরে গেঁথে রেখেছেন তাঁর জীবনের অবলুপ্ত-প্রায় পৃষ্ঠাগুলি, ইতস্তত-ছড়িয়ে-থাকা ঘটনাগুলি জোড়া দিয়ে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্র-জীবনের বিশাল চিত্রশালা। আর, এই চিত্রশালার সামনে দাঁড়িয়ে আজ আমরা তাঁকে দেখতে পাই ঋষির ভূমিকায়। এই চিত্রশালার সামনে দাঁড়িয়েই এখনো তিনি আমাদের ডাক দিয়ে বলেন —"আমার কারখানাটা দেখে যাও।"

এই কারখানাটি কেমন? অনেকেই তার সঙ্গে পরিচিত। একটু খুঁটিয়ে দেখলেই দেখতে পাওয়া যায়, সারা ঘর বইয়ে ঠাসা, আর এরই মধ্যে সারাদিন কাজ করে চলেছেন প্রভাত-কুমার তাঁর তরুণ সহকর্মীদের নিয়ে। প্রতিদিন সঞ্চিত হয় নতুন তথ্য, খবর; বেড়ে চলে ঘটনাপঞ্জী-সম্বলিত কার্ডের পর কার্ড এবং প্রায় সকলের আড়ালেই এই কারখানার কেন্দ্রস্থলে বিরাজিত থেকে তিনি তাঁর সহকারী শিষ্য-শিষ্যাদের নিয়ে এখনো রচনা করে চলেছেন রবীন্দ্রজীবনের নব নব ইতিবৃত্ত; দর্শন ও সাহিত্যের পারম্পর্যসূত্রে ভারতীয় সংস্কৃতির নব পরিচয় দিয়ে চলেছেন। অশীতিপর এই মানুষটি এখনো তেমনি মেরুদণ্ড সোজা রেখে অনলস পরিশ্রমে এই কারখানাটিকে প্রাণবন্ত করে রেখেছেন। স্বাধীনতা-পরবর্তী ভারতবর্ষে দেশ জুড়ে গড়ে উঠেছে নানা গবেষণা কেন্দ্র, বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্রমশ বেড়ে চলেছে গবেষকের সংখ্যা, সরকারী বে-সরকারী সাহায্যপুষ্ট গবেষকের দল কাজ করে চলেছেন। সেখানে কতো আয়োজন, কতো বিপুল অর্থের দাক্ষিণ্য, কতো আড়ম্বর। কিন্তু প্রভাতকুমারের কারখানা? তাঁর এই গবেষণা কেন্দ্রের কোনো আড়ম্বর নেই, এমনকি কোনো চটকদার আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যারও আমদানী নেই। অথচ, ঐকান্তিক নিষ্ঠায় এই কারখানায় যে উৎপাদন সম্ভব হয়েছে, জানি না কোন পেশাদার গবেষণকেন্দ্র তার সমতুল্য হতে পারে কিনা। প্রবচনে আছে, 'সাজ করতে দোল ফুরোয়।' আমাদের দেশের গবেষণা কেন্দ্রগুলির বেশীর ভাগই পশ্চিমী কায়দায় বাইরের আড়ম্বরের দিকেই আগ্রহী, আয়োজনেই শক্তি নিঃশেষিত হয়। আসল কাজ নেপথ্যে থেকে যায়। কিন্তু, প্রভাতকুমার তাঁর এই কারখানায় ধ্যান-সমাহিত সাধকের মতো, বিদ্যাচর্চার যে দৃষ্টান্ত

আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন, তা অনেকের কাছেই প্রেরণার উৎস, জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে এক বিরল উদাহরণ।

এই ব্যক্তিগত সাধনার বাইরে তিনি আমাদের মতো কতো অসংখ্য ছাত্রকে যে বিচিত্র বিষয় নিয়ে গবেষণার কাজে অনুপ্রাণিত করেছেন, তা ভাবলে অবাক হতে হয়। অথচ, প্রচলিত অর্থে তিনি তো পেশাদার অধ্যাপক নন, যে, তার ভিতর দিয়ে তাঁর গৌরব বেড়েছে। এক্ষেত্রেও তিনি তাঁর কারখানার কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে তরুণ গবেষকদের গবেষণার কাজে পরোক্ষভাবে দক্ষ কারিগরের মতোই সহায়তা করেছেন। সবক্ষেত্রে যে রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কেই তাঁর আগ্রহ দেখা গেছে তা নয়, তার বাইরেও তাঁর সমান আগ্রহ দেখতে পাই। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, ইতিহাস ও শিল্পের বিচিত্র ক্ষেত্রে তাঁর সমান অনুরাগ, যা তিনি অপরের মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন। মনে পড়ে, স্নাতকোত্তর অভিজ্ঞান লাভ করার পর যখন কোন-একটা বিষয় নিয়ে কাজ করার কথা ভাবছি, তখন তিনি আমার মতো একজন সামান্য ছাত্রকে গবেষণার বিষয় নির্বাচন করে দিয়ে বলেছিলেন, সেই বিষয়টিই হবে আমার পক্ষে সবচেয়ে উপযুক্ত বিষয়। আজ বুঝি, তাঁর সেই নির্বাচন কতো মূল্যবান ও অর্থবহ। নানা সূত্রে এমনি অনেক কথাই শুনেছি, যার দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়—প্রভাত-কুমার তাঁর কারখানার বাইরেও একটা বড় কারখানা রচনা করতে চেয়েছেন—যে জগতে অসংখ্য তরুণ গবেষকের আনা-গোনা। আসলে, যে জ্ঞানের আলো তাঁকে সতত নিযুক্ত রেখেছে পড়াশোনার জগতে—সেই আলো তিনি সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন তাঁর চার পাশে। এই ভাবেই তাঁর কারখানার পরিসরও দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে, গড়ে

উঠেছে একটা গবেষক-সমাজ। আর, এই ভাবেই তিনি একটি গবেষণা-বৃত্তের কেন্দ্রে, তাঁর নিজের ভাষায় 'কারখানা'র কেন্দ্রস্থলে বিরাজ করছেন। অথবা বলা যাক্—তিনি নিজেই এমনি একটি প্রতিষ্ঠান।

এ হেন মানুষটির দৃষ্টির পরিসীমাও বহুদূর বিস্তৃত, বিষয়ও বিচিত্র—ভূগোল থেকে স্থরু ক'রে ধর্ম, ইতিহাস, দর্শন, সাহিত্য ইত্যাদি। রামমোহনকে সামনে রেখে তিনি উনবিংশ শতাব্দীর যে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক ইতিহাস উন্মোচিত করেছেন, তা সম্পূর্ণ এক নতুন আলোকপাত। তথাপি, তাঁর খ্যাতি মূলত রবীন্দ্রজীবনীকার রূপে এবং এ ক্ষেত্রেই তাঁর মৌলিক ও অবিস্মরণীয় শ্রেষ্ঠত্ব। প্রভাতকুমার গ্রন্থের ভূমিকায় এই গ্রন্থরচনার প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছেন: কিন্তু, যখন তাঁর এই গ্রন্থের কথা ভাবি, তখন মনে হয়, রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে এই কাজকে প্রকৃতপক্ষে গথিক-স্থাপত্যের বনিয়াদের সঙ্গে তুলনা করা যায়। একালের সাহিত্যচর্চার ক্ষেত্রে নানা প্রণালীতত্ত্ব অনুসৃত হয়ে থাকে। কিন্তু সেই কতোদিন আগে, যখন গবেষণার ক্ষেত্র ছিল নিতান্তই সীমিত এবং গবেষণা সম্পর্কে ধারণাও ছিল অত্যন্ত সংকীর্ণ, তখনই তিনি এমন এমন একটি বিষয়ের মধ্যে নিজেকে মগ্ন রেখেছেন। রবীন্দ্র-সাহিত্যচর্চা যে রবীন্দ্রজীবনকে বাদ দিয়ে সম্ভব নয়, এ দুয়ের মধ্যে যে একটা অন্যোন্য সম্পর্ক রয়েছে, এই ধারণা থেকেই তাঁর গবেষণার সূত্রপাত। রবীন্দ্রনাথ নিজে যদিও নিজের জীবনচরিতের মধ্যে কবিকে খুঁজতে বারণ করেছেন এবং কবিজীবনের সঙ্গে কাব্যের সত্যিই কোন যোগ আছে কিনা, এ নিয়ে যতো তর্কই থাক্, আজ আমরা তাঁর আলোচনা থেকে জেনেছি—রবীন্দ্র-সাহিত্যানুশীলনের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রজীবনের

ভূমিকা কী নিবিড় ভাবে অর্থবহ। সাঁৎ-বোভ্ থেকে সুরু ক'রে আমাদের বঙ্কিমচন্দ্র প্রমুখ সমালোচক বলেছেন, কাব্যকে জানার আগে কবিকে জানতে হবে। অবিশ্যি, টি, এস, এলিয়টের মতো সমালোচক এর উল্টো কথা বলেছেন। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে যাঁরা বস্তুতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গীর সমর্থক, তাঁরা বলবেন, ব্যক্তিত্ব ও আবেগকে সরিয়ে রাখাই সমালোচকের আসল দায়িত্ব। অথচ, এ কথা অস্বীকার করা যায় না— কাব্য কবিজীবনেরই ফসল, সুতরাং কাব্যকে কবিজীবন থেকে বিচ্ছিন্ন করা, বা জীবন থেকে বিচ্যুত করে দেখা বিজ্ঞান-সম্মত দৃষ্টিভঙ্গী নয়। প্রভাতকুমার অনেক দিন আগে এই সত্য উপলব্ধি ক'রে রবীন্দ্রজীবনের আলোচনাকে রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক ব'লে চিহ্নিত করেছেন। রবীন্দ্রচর্চার ইতিহাসে প্রভাতকুমারের এই দৃষ্টিভঙ্গী শুধু যে মৌলিকতার পরিচয় বহন করছে, তা'ই নয়, এই দৃষ্টিভঙ্গী আজকের অনেক গবেষকের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে। রবীন্দ্রচর্চার ক্ষেত্রে প্রভাত-কুমারের এখানেই সবচেয়ে বড় সার্থকতা।

'রবীন্দ্রজীবনী' যদিচ রবীন্দ্রজীবনেরই কাহিনী, তবু, লক্ষ্য রাখা দরকার, আসলে তা রবীন্দ্রজীবনের অন্তরালে ঢাকা একটি যুগের ইতিবৃত্ত; ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে সুরু ক'রে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পর্যন্ত তার পরিসীমা। এবং, এই পরিসীমার মধ্যে, দেশকালের বৃহত্তর পটভূমিতে তিনি রবীন্দ্রজীবনকে উপস্থাপিত ক'রে একদিকে যেমন আমাদের কালের ধ্রুবতারাসদৃশ একটি ব্যক্তিত্বের আবরণ উন্মোচন করেছেন, অন্যদিকে তেমনি বৃহত্তর বিশ্বজীবনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ঘটিয়ে তাঁর বিশ্বপথিকের চিত্রটিও অঙ্কিত করেছেন নিপুণ চিত্রকরের দক্ষতা নিয়ে। এই ভাবে ঘটনার পারম্পর্যের

ভিতর দিয়ে তিনি রবীন্দ্রনাথের পূর্ণাঙ্গ একটি আলেখ্য রচনা করতে সমর্থ হয়েছেন—যার দৃষ্টান্ত আমরা গ্যেটে বা টলস্টয়ের জীবনীর মধ্যে পাই। এক বৃহত্তর দেশকালের প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্রজীবনীকে উপস্থাপিত ক'রে, কবির জীবন ও সাহিত্যের মূল্যায়ন ক'রে প্রভাতকুমার তাঁর জীবনব্যাপী সাধনার ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রচর্চার সবচেয়ে মূল্যবান ও মহৎ দায়িত্ব পালন করেছেন। মানুষের জীবন যে কতকগুলি ঘটনার সন্নিবেশ মাত্র নয়, তার ভিতর দিয়ে মানবজীবন একটি স্থির লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, এবং তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাগুলি এই কারণেই গভীর অর্থময় ও তাৎপর্যপূর্ণ, এমন একটি বোধ আমরা লাভ করি তাঁর এই গ্রন্থের ভিতর দিয়ে। স্তুতি-নিন্দার জ্বরে ভারাক্রান্ত যে জীবন, তা যে শেষ পর্যন্ত একটি পরম সত্যকেই প্রতিষ্ঠিত করে, রবীন্দ্রনাথের জীবন তার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। প্রভাতকুমারের অন্বিষ্ট এই সত্যরূপেরই উদ্‌ঘাটন। রবীন্দ্রজীবনীকার হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাতন্ত্র্য এখানেই। এই গ্রন্থ বস্তুত একটি গবেষণা-গ্রন্থ মাত্র নয়, তা আসলে লেখকের প্রজ্ঞা ও মণীষারও অভিজ্ঞান।

তবু, সব কীর্তিকে অতিক্রম করে দাঁড়িয়ে থাকে যা, তা হচ্ছে মানুষ—মানুষ হিসেবে লেখকের পরিচয়ই বেঁচে থাকে শেষ পর্যন্ত। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মানুষ হিসেবেও একটি বিশুদ্ধ আদর্শ। রবীন্দ্রনাথকে কাছে পেয়েছেন অনেকেই। অনেকের মতো প্রভাতকুমারও। কিন্তু, রবীন্দ্র-শিষ্য হিসেবে প্রভাতকুমার কবির ব্যক্তিত্বের অনেকখানি অধিকারী, বা বলা যাক—রবীন্দ্রনাথের উত্তরাধিকার প্রভাতকুমারের মধ্যেই প্রোজ্জ্বল। এমন একটি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন সহজ মানুষ সকলের জন্যই দরজা খুলে রেখেছেন, সেখানে ইতর-ভদ্রের বাছবিচার নেই, সেটা বাইরের দরজাই নয়, হৃদয়েরও।

তিনি সকলেরই আপনজন। প্রজ্ঞার আড়ালে সেই মানুষটি আজো বেঁচে আছেন; সকালের রোদের মতো এই মানুষটির আকর্ষণে শুধু যে তাঁর গৃহপালিত বিড়ালটি কাছে এসে দাঁড়ায় তা'ই নয়—শান্তিনিকেতন-তীর্থে এসে প্রভাত-দর্শনও আজ যে-কোন মানুষের অভিলাষ।

কোন মানুষের যথার্থ মূল্যায়ন তাঁর আয়ুষ্কালে হয় কিনা জানি না। কিন্তু, প্রভাতকুমারের মূল্যায়ন তাঁর জীবদ্দশাতেই হয়ে গেছে। গত বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগত্তারিণী পুরস্কার পাবার পর, উত্তরায়ণে প্রদত্ত অভিভাষণে তিনি যা বলেছিলেন, তার মধ্যেই নিহিত রয়েছে তাঁর সত্য পরিচয়। তিনি বলেছিলেন—"আমি ঐতিহাসিক, সাহিত্যিক নই। তবু যে সাহিত্যিকের সম্মান আমাকে দেওয়া হল, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ।" এ কথা সত্য, কিন্তু সর্বৈব সত্য নয়। তিনি মূলত ঐতিহাসিক, তাতে সন্দেহ নেই। ইতিহাসচর্চাই তাঁর ক্ষেত্র, তাঁর অন্বিষ্ট। কিন্তু ইতিহাস যদি মানুষের জীবনেতিহাস হয়, বিশেষত কবির বা সাহিত্যিকের, তাহলে তা সাহিত্যিকের জীবনানুভব ছাড়া রচিত হ'তে পারে না। মানবজীবনের গভীর রহস্য উপলব্ধির জন্যে বাইরের ঘটনার আশ্রয় নিতে হয় সত্য, কিন্তু তার ভিতর থেকে জীবনের সত্যোদ্‌ঘাটনের জন্য দরকার হয় সাহিত্যিকের দৃষ্টি—উপলব্ধি ও প্রজ্ঞা। প্রভাতকুমারের ব্যক্তিজীবন ও কর্মধারায় তা ক্ষণে ক্ষণে অনুভব করেছি, তাঁর মনের গহন অন্তরালে বিরাজ-মান সেই সাহিত্যিক-সত্তা—যা রবীন্দ্রনাথের কবি-সত্তাকে ঠিকমতো আলোয় চিনতে পেরেছে। তাঁর কৃতিত্ব শুধু তো কবিজীবনের ঘটনাপঞ্জী রচনায় নয়, তার সঙ্গে মিশে আছে তাঁর হৃদয়ের উত্তাপ, অনুভূতি, উপলব্ধি। তাই তিনি ঐতিহাসিক হয়েও সাহিত্যিক, সাহিত্যের মুগ্ধ পাঠক।

গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার

বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দ। শান্তিনিকেতনে এলাম চাকরি নিয়ে। কতই বা বয়স তখন, আর কীই বা বেতন, বিশ্বভারতীর তখন কীই বা অবস্থা। কিন্তু আনন্দ অপরিসীম। আকর্ষণ এখানকার গুণীজন সঙ্গ, বিশেষ করে কাজটা যখন অধ্যাপক তান-য়ুন-সানের সঙ্গে। আকর্ষণ এখানকার সহজ সরল পরিবেশ আর এখানকার স্বচ্ছ শান্ত আবহাওয়া। ঘুরে ঘুরে দেখি, পরিচয় করি। মাস্টারমশায় নন্দলাল বসুর স্টুডিও, রাম-কিঙ্করদার আস্তানা, শৈলজাদার সংগীত শিক্ষা, রথীদার উত্তরায়ণ, অবন দাদুর কাটুমকুটুম্ আর গল্প, চা-চক্র আর খেলার মাঠ—কতই বা বলব। সবার উপরে আমার মনের আকর্ষণ গ্রন্থাগার—ঐশ্বর্যময় ভাণ্ডার, রবীন্দ্রজীবনীকার প্রাচ্যশিক্ষাবিদ্ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যার কর্ণধার। প্রথম আলাপেই তাঁর কাছে পেয়েছি আত্মীয়ের মতো ব্যবহার। শুধালেন—এসেছ তো, কিন্তু সিঁড়ি না বাড়ী?

বিচিত্র প্রশ্ন। শুধাই—তার মানে? তিনি বললেন—মানে, এখানে থাকবে না এটাকে পা-দানি হিসেবে ব্যবহার করে ডিঙিয়ে যাবে?

জিজ্ঞাসার হেতু ছিল, ক্রমে বুঝেছি। বন্ধুরা কেউ কেউ বলতেন—শান্তিনিকেতন? তা ভাল ঠিকানা। সুযোগ-সন্ধানী অনেকেই এখানে অধ্যাপনা প্রভৃতির কাজে আসতেন, কিছু-কাল কাটিয়েই পাড়ি জমাতেন হয় বিদেশে নয় তো বৃহৎ কোনো প্রতিষ্ঠানে, যেখানে বেতন ভাল। অর্থাৎ এখানকার অভিজ্ঞতার সুনাম ছিল।

আমার আর সে সব হল না। এখানকার জল, মাটি, গাছ, ফুল, গান, খেলা, সাহিত্যচর্চা, গুণীদের সহজ সান্নিধ্য—সবই আমাকে মায়ায় বেঁধে রাখল। সুদীর্ঘ ৩৫ বছর এখানেই চাকরি করে এবং ঐ সঙ্গে শিক্ষার্থীর মতো থেকে কাটিয়ে দিলাম। তার পরেও জীবনের বাকি অংশের আবাস বানালাম এখানেই—সব হতে আপন শান্তিনিকেতনে।

প্রভাতদা মানুষটি ঐরকমই। সোজাসুজি ভাবে কথা বলতে দ্বিধা করতেন না। মনে পড়ে, এখানকার তদানীন্তন এক কর্মী, যাঁর সঙ্গে গ্রন্থাগারের বা প্রভাতদার প্রত্যক্ষ কোন যোগই ছিল না, তাঁর প্রতি তদানীন্তন কর্তৃপক্ষ রুষ্ট হয়ে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। প্রভাতদার কানে কথাটা যেতেই তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কর্তৃপক্ষকে এক চিঠি দিয়ে এবম্বিধ ব্যবস্থা গ্রহণের অন্যায্যতা এবং অযৌক্তিকতার কথা জানিয়ে দিলেন। তাতে কাজ হয়েছিল, তাঁরা বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করে দেখেন ও নিরস্ত হন। অথচ এ খবরটা উক্ত কর্মী কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত ঘুণাক্ষরেও জানতে পারেন নি।

যা বলছিলাম। গ্রন্থাগারে যাই, দেখি প্রভাতদা নিবিষ্ট-মনে কাজ করছেন। কখনো উঠে এসে পড়ুয়াদের সুবিধা অসুবিধার তদারক করছেন। আর দুনিয়ার যে কোন বই সম্বন্ধে প্রশ্ন করলেই টেবিলে বসেই বলে দিচ্ছেন—অমুক নম্বর, অমুক তাকের, অমুক জায়গায় দেখ। কী নিপুণতা! আর মনে রাখবার কী ক্ষমতা! বুঝলাম, তিনি শুধু গ্রন্থাগারিক নন, গ্রন্থ-প্রেমীও—গ্রন্থাগারকে পরিপূর্ণ ভাবে ভালবাসেন বলেই এ বিষয়ে সবকিছু আত্মসাৎ করেছেন। এবং সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, রোহিণীকুমার নাথ, মনমোহন ঘোষ প্রমুখ তাঁর তদানীন্তন সহকর্মীদের মধ্যেও এই গ্রন্থ-প্রেম—এই ভালবাসা

সঞ্চারিত করতে পেরেছেন। এ ক্ষমতা প্রশাসন দেয় না। দেয় চরিত্র। যে সোহাগ করে তাকেই শাসন মানায়।

আমি কিন্তু তখনও স্বপ্নেও ভাবি নি যে ভবিষ্যৎ জীবনে আমিও গ্রন্থাগার-বৃত্তিতেই সামিল হব। প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় যখন আমাকে বিদ্যাভবনের গ্রন্থাগারটির ভার দিলেন তখনই আমি প্রত্যক্ষভাবে প্রভাতদার সংস্পর্শে এলাম। এবং আমার নূতন শিক্ষা শুরু হল তাঁরই সহায়তায় ; কেননা তিনিই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে একেবারে শুরু থেকেই এখানকার গ্রন্থাগারটিকে গড়ে তুলেছেন। সমগ্র সজ্জাই তাঁর হাতে। এই কাজে লিপ্ত থেকে গ্রন্থের বর্গীকরণ ও তালিকাকরণ প্রভৃতি পদ্ধতি নিয়ে, গ্রন্থাগার সংগঠন নিয়ে তাঁর মনে সে যুগেই যে চিন্তার উদয় হয়েছিল, এদেশে তার সুষ্ঠু ও কার্যকর প্রয়োগ নিয়ে তিনি যেমন ভেবেছিলেন, যে সকল সূত্রের কথা তাঁর মনে হয়েছিল, তা সেই ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দেই তিনি একটি স্মারকপত্রের আকারে লিখে স্যাডলার কমিশনের কাছে উপস্থাপন করবার জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে পাঠিয়ে দেন। সেই সময়ে, যখন পর্যন্ত ভারতে গ্রন্থাগার বিষয়ে চিন্তা দানা বেঁধে ওঠে নি, তখন এ বিষয় নিয়ে তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন।

এই সূত্রে গ্রন্থ বর্গীকরণ প্রসঙ্গে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। গ্রন্থ বর্গীকরণের নানাপ্রকার পদ্ধতি প্রবর্তন করেছেন মূলত পশ্চিম ভূখণ্ডের পণ্ডিতেরা। যাঁরা গ্রন্থাগার পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত তাঁরা জানেন বর্গীকরণের কোন্ গুণে গ্রন্থসজ্জার কাজ সহজ হয়। ব্রাউন, ব্লিস, কাটার প্রভৃতি প্রবর্তিত যে সব বর্গীকরণ পদ্ধতি আছে তার সব গুলিতেই কিছু গুণ বর্তমান, কিছু অসুবিধাও। আছে সার্বদশমিক বর্গীকরণ, লাইব্রেরি অফ্

কংগ্রেস পদ্ধতি। ভারতের রঙ্গনাথন প্রবর্তন করেছেন দ্বিবিন্দু বা কোলন পদ্ধতি। সব গুলির মধ্যে আমেরিকার মেলভিল ডিউই উদ্ভাবিত দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতি দোষে গুণে মিলে ব্যবহারিকতায় সহজ। প্রভাতকুমার এই শেষোক্ত পদ্ধতিকেই মূল করে সাজালেন গ্রন্থাগার। কিন্তু এই পদ্ধতিতে এশীয় তথা ভারতীয় বিষয় সমূহকে যথোপযুক্ত মর্যাদা দেওয়া হয় নি। বিশ্বের তাবৎ জ্ঞান-ভাণ্ডারের মধ্যে ভারসাম্য বজায় থাকে নি। প্রভাতকুমারের চিন্তাপ্রসূত কৃতিত্ব এই পদ্ধতিকে ভারতীয় ও পূর্ব-ভূখণ্ডের উপযোগী করে তোলায়। সেজন্য তিনি এই মার্কিন প্রকল্পের অন্তর্গত কতকগুলি বাড়তি বা বিস্তারিত বিভাগ বা প্রভাগকে সংকুচিত করে বাকি অংশটুকু ভারতীয় ও এশীয় জ্ঞান-ভাণ্ডারের বর্গীকরণের প্রয়োজনে কাজে লাগালেন। যেমন ধরুন, ১-এর বিভাগ—ধর্ম বিষয়ে যেখানে খ্রীষ্টধর্মের জন্য ব্যাপক ভাগ রয়েছে সেটিকে সংকুচিত করে এ দেশীয় ধর্মের জন্য কয়েকটি ভাগকে কাজে লাগালেন। অনুরূপভাবে দর্শন বিভাগে পশ্চিমী দর্শনচিন্তার সংকোচনে এল এতদ্দেশীয় দর্শন, সাহিত্য বিভাগে ভারতীয় সাহিত্য, ইত্যাদি। এবং এ কাজটি তিনি করলেন নির্দিষ্ট ধারা ধরে, বর্গীকরণের মূল নীতি বজায় রেখে।

এই সূত্রে আমার অন্যতম অভিজ্ঞতার কথা বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। গ্রন্থাগার বিশেষজ্ঞদের দলভুক্ত হয়ে যখন আমি আমেরিকায় যাই তখন সেখানে লাইব্রেরি অফ্ কংগ্রেসে ডিউই দশমিক বর্গীকরণ পদ্ধতির ষোড়শ সংস্করণ সম্পাদনার কাজ চলছিল। সম্পাদকীয় বিভাগের প্রাচ্যখণ্ডের অন্যতম ভারপ্রাপ্ত মেরী এঙ্গলেমেয়ারের সঙ্গে বসে আমাদের অর্থাৎ বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারে প্রবর্তিত প্রভাতকুমারের পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করি। ডিউই প্রকল্পে কিছু অংশ উপেক্ষিত এবং কিছু অংশ প্রয়ো-

জনাতিরিক্ত ভাবে স্ফীত হওয়াতে আমরা কি প্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হই এবং ডিউই পদ্ধতিকে নিজেদের প্রয়োজনের অনুকূলে কি ভাবে পরিবর্তন করে নিতে হয় সে প্রসঙ্গ শুনে তাঁর মনে যে চিন্তার উদয় হয়েছিল তার ফলে তিনি আমাকে পরে এক পত্রে লেখেন, ডিউইর একটি এশীয় সংস্করণ করলে কেমন হয়। স্বভাবতই আমি তাঁকে জানাই যে তাতে সমস্যার সমাধান হবে না, এবং এভাবে আফ্রিকা ইত্যাদি দেশের জন্য বিভিন্ন সংস্করণ তৈরী করবার প্রবণতা দেখা দেবে, গোঁজা-মিলের সৃষ্টি হবে। তাঁকে আমি প্রভাতকুমারের সঙ্গে পত্র-বিনিময় করতে বলেছিলাম। কেন না প্রভাতদা এ ব্যাপারে কার্যকর পরামর্শ দিতে পারবেন নিঃসন্দেহে। প্রভাতদা তো শুধুমাত্র ডিউই প্রকল্পকে ভিত্তি করে পরিবর্তন আনেন নি, তিনি এর প্রয়োজনে অন্যান্য পদ্ধতির গুণগত দিকগুলিকেও এর সঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। যেমন, রঙ্গনাথনের পদ্ধতি থেকে দ্বিবিন্দু বা কোলন চিহ্নকে তিনি সহজ ভাবে কাজে লাগিয়ে ডিউই সম্প্রসারণের চমৎকার পন্থা প্রস্তুত করেছেন। এর ফলে আমরা বর্গীকরণের সূক্ষ্মতম বিভাগে উপস্থিত হতে পারি, অথচ বর্গ সংখ্যাটি বড় এবং ভারী হয়ে ওঠে না। মনে রাখতেও অসুবিধা হয় না।

প্রভাতকুমার সংস্কৃত গ্রন্থ বর্গীকরণের পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন, উদ্ভাবন করেছেন বাংলা ও হিন্দী গ্রন্থ বর্গীকরণ পদ্ধতিও। এগুলির ভিত্তি ডিউই দশমিক বর্গীকরণ—যা অদল-বদল করে তিনি নূতনত্বই এনেছেন। এই প্রকল্প ভারতীয় যে কোন ভাষাতেই প্রয়োগ করা যায়। প্রাচ্য বর্গীকরণ পদ্ধতি প্রস্তুত করেছিলেন সতীশচন্দ্র গুহ। খুবই বৈজ্ঞানিক প্রয়োগ। প্রভাতকুমার সেটির কথাও ভোলেন নি, প্রয়োজনে

কাজে লাগিয়েছেন। বলা বাহুল্য, সংস্কৃত এবং সংশ্লিষ্ট ভারত বিদ্যার বর্গীকরণের কাজ সহজ নয়, এজন্য তাবৎ সংস্কৃত ও সংশ্লিষ্ট বিষয়ের তার বিভিন্ন ধারা সম্বন্ধে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রাচ্যবিষয়বিদ্ প্রভাতকুমারের সে অধিকার ছিল।

অভিজ্ঞ গ্রন্থাগারিক, সুষ্ঠু গ্রন্থাগার পরিচালক আমাদের মধ্যে অনেকে আছেন। কিন্তু চিন্তাশীল গ্রন্থাগার বিশারদ, গ্রন্থ বিষয়ে পণ্ডিত ও প্রয়োগকুশলী কারো কথা ভাবতে গেলে প্রভাতকুমারকে সর্বাগ্রে মনে পড়বে। রঙ্গনাথন অবশ্যই বিশ্ব-জ্ঞানভাণ্ডারকে বিভক্ত করার মৌলিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছেন। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে গ্রন্থাগার পবিচালনায় বর্গীকরণকে সহজতম হাতিয়ার করে তোলার ব্যাপারে প্রভাত-কুমারের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রবীন্দ্রজীবনীকার হিসেবে তিনি যেমন অনন্য, তেমনি গ্রন্থাগার বিশারদ হিসেবেও তিনি অনন্যতার অধিকারী।

মনে পড়ে

মণীষা রায়

শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পর্কে আমাকে লিখতে বলা হয়েছে—এ অতি আনন্দের বিষয়। বহুদিনের কথা—তবুও যা মনে আছে, তা-ই লিখছি।

১৯০৬ সাল। এই সময়ের আগে থেকেই আমরা অতি বাল্যকালে গিরিধিতে এক জায়গায় বাস করতাম। আমার মা, বাবা, দিদি, দাদা ইত্যাদি সকলেই। গিরিধি অতি স্বাস্থ্যকর স্থান—ওখানে সে যুগে বাঙালীরা খুব কমই বাস করতেন; যে-কয়েকজন থাকতেন পরস্পরে আত্মীয়তার নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ হতেন। আমরা তো প্রথম থেকেই গিরিধিতে থাকতাম। যাঁরা সেখানে যেতেন সকলেই আমরা যেন এক-পরিবার—পরম আত্মীয়। প্রভাতরা গেল ১৯০৬ সালে। প্রভাতের বাবা অসুস্থ—তাঁকে নিয়েই প্রভাতের মা, ভাই বোন সকলে সেখানে গেলেন। আমাদের সঙ্গে রোজ দেখা-শোনা হ'ত। একদিনও বাদ যেত না। এই বৈচিত্র্যময় জীবনের স্বাদ যিনি পেয়েছেন, তিনি জানেন এর মহিমা। কতদিন আগের কথা—তবুও কিছুতেই ভোলা যাচ্ছে না। মন তাই বলছে—যা জানো, রেখে যাও তার স্মৃতির ছাপ।

আমরা যে কয়েকটি পরিবার গিরিধিতে বাস করছিলাম সকলের মধ্যে ছিল প্রগাঢ় হৃদ্যতা। প্রভাতরা পিতাকে সুস্থ করতে গিরিধিতে গিয়েছিলেন—কিছুদিন ভুগে তিনি চলে গেলেন এ জগৎ ছেড়ে। এর পরেও আমরা ও প্রভাতরা বহুদিন গিরিধিতে ছিলাম। আমার দিদি হেমাঙ্গিনী বসু

অত্যন্ত মধুর স্বভাবের। তিনি আমাদের তো দিদি; অন্যদের আত্মীয়া—প্রভাতরা তাঁকে পিসীমা বলে জানত ও ডাকত। প্রভাত আমারই মতো আজও তাঁকে মনে রেখেছে।

প্রভাতের পিতার মৃত্যুর পর আমরা সবাই বহুদিন গিরিধিতে ছিলাম; প্রভাতরাও—সে কথা তো আগেই বলেছি। আমার বড়দাদা সুধাংশুবিকাশ রায় গিরিধি স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। মেজদাদা হিমাংশু রায়ও শিক্ষকতার কাজ করতেন—ছেলেরা তাঁর কাছে পড়তে খুব ভালবাসত। কেননা, মেজদাদার পড়াবার বিশেষ এক ক্ষমতা ছিল—ছেলেরা ইচ্ছে করে তাঁর কাছে আসত পড়বার জন্য। এই সময়ে প্রভাতও আমার মেজদাদার কাছে আসত—প্রভাত তাঁর কাছে পড়ায় অনেক সহায়তা পেয়েছে। প্রভাত মেজদাদার সঙ্গ ছাড়ত না। মেজদাদাও প্রভাতের প্রতিভার পরিচয় পেয়েছিলেন; বুঝেছিলেন যে, সে সামান্য ছেলে নয়—পরে সে একজন অসামান্য ব্যক্তি হবে। তার ভাবনা সত্য হয়েছে। আজ আমরা সকলেই গর্বিত।

আমার মেজদাদা হঠাৎ জানতে পারলেন যে, শান্তি-নিকেতনে শিক্ষকতার একটি কাজ পাওয়া যেতে পারে—দরখাস্ত করে পেলেনও সেই কাজ। কয়েক মাস পরে প্রভাতও আমার দাদার সঙ্গে চলে গেল শান্তিনিকেতনে। সেখানে গিয়ে কিছুদিন পরে অন্যান্য কাজের সঙ্গে সঙ্গে গ্রন্থাগার গড়ে তোলার কাজেও লেগে পড়ল। তখনও প্রভাত বড় হয় নি—কিশোর বলাই চলে। ধীরে ধীরে সে গ্রন্থাগারের একজন প্রবীণ ব্যক্তি হয়ে উঠল। আমার মেজদাদা প্রভাতকে এই ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে দেখে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। ক্রমে গ্রন্থাগারের উন্নতি হতে লাগল। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের

শান্তিনিকেতনের মহিমার যেমন তুলনা নেই, সেই রকম সেখানকার গ্রন্থাগারের কথাও ভোলার নয়—প্রভাতকুমারের কথাও নয়। এই ভেবে আমি গর্বিত যে, আজও আমরা পরস্পরকে জানি।

এ তো গেল এক দিকের কথা। এখন বলি নিজেদের কথা— যে কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়ে।

যথাসময়ে একদিন জানতে পারলাম যে, আমার সহপাঠী সুধাময়ী দত্তর সঙ্গে প্রভাতের বিয়ে হয়েছে। সুধা ও আমি একই সঙ্গে বেথুন কলেজ থেকে বি. এ পাশ করেছিলাম। সুধা শিক্ষিতা—সে প্রভাতকে সকল রকম সাহায্য করে যেতে লাগল। প্রভাত সুধার কাছ থেকে যে বিচিত্র সহায়তা পেয়েছে, সেটা না হলে তাঁর চলত না। প্রভাত আজ সুপ্রতিষ্ঠিত।

প্রভাতের তৃতীয় পুত্র চিত্তপ্রিয়র সঙ্গে আমার মেজ দাদার কনিষ্ঠা কন্যা মঞ্জুর বিয়ে হ'ল। মেজদাদা ও বৌদি তখন বেঁচে ছিলেন। বড়দাদা কন্যা-কর্তা হয়ে বিয়ে দিলেন কর্ণওয়ালিস স্ট্রীটের বাড়ীতে। অতি আনন্দের সঙ্গে আমরা সবাই এ বিয়ে সম্পন্ন করলাম—এ কথা আজও আমার খুব মনে পড়ে। প্রভাত আমার বাল্যকালের খেলার সাথী, সুধা আমার সহপাঠী—এখন উভয়েই আমার আত্মীয়।

একই জীবন-স্রোত ঘটনার পর ঘটনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে এক স্থানে এসে পৌঁছাল। নদী যেমন পাহাড়-পর্বত ভেঙে আঘাতের পর আঘাত খেতে খেতে প্রবাহিত হয়—থামে না, তেমনি আমরাও যেন চলে এলাম। সব চেয়ে বড় কথা, আনন্দই হোক্ আর দুঃখই হোক্—সবই তো পার হলাম।

লিখতে লিখতে কতো কথাই তো মনে পড়ে যায়—সব তো বলা যায় না—শুধু বলি—আনন্দ পেয়েছি অনেক।

প্রভাতকুমার : যেমন দেখেছি—ভেবেছি

ভূদেব চৌধুরী

৮৭ বছরের অনলস সাধনার সিদ্ধকাম মূর্তি প্রভাতকুমার—আমাদের 'প্রভাতদা'র কথা ভাবলেই মনে ভাসে জীবন্ত বিশ্বকোষের ছবি! গাঢ় গভীরতা, অপার বিস্তার তাঁর জ্ঞান-সাধনার স্বভাব-ধর্ম, অথচ তার ভার ব্যক্তিত্বের কোথাও চেপে বসে নি। ঐখানে বিবুধ প্রভাতকুমার রসের যাদুকর; এবং রহস্যকরও!

প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতি মনে আসে: ১৯৫২-র গ্রীষ্মের ছুটির কাল; বিনয়ভবনে দাদার কাছে বেড়াতে এসে আটকে পড়েছিলাম। পড়াশুনোটা মাটি হল বলে আক্ষেপ করতেই দাদা নিয়ে এলেন শান্তিনিকেতনের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে—গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের কাছে। অনেক বিস্ময় আর বেশ কিছুটা আবেগ জড়ানো রয়েছে ঐ নামের সঙ্গে তখনো—উন্মুখ যৌবন-অনুভবের সুরভি-মেশানো।

বাংলায় অনার্স নিয়ে কলকাতায় বি এ. পড়তে আসার পরেই সমস্ত চেতনা মন্থিত হয়ে উঠেছিল। রবীন্দ্রনাথকে আমার প্রথম দেখার স্মৃতি আজও কণ্টকিত করে এবং সেই শেষ দেখাও। ১৩৪৮-এর ২২শে শ্রাবণের সেই নিথর ঘুমন্ত পুষ্পাকীর্ণ দিব্যরূপ আজও চোখে ভাসে। সেই আক্ষেপ—সেই আলোড়নের তাড়নায় রুদ্ধশ্বাসে পড়েছিলাম হাতের কাছে যখন যেমন মিলেছিল রবীন্দ্র-রচনা এবং রবীন্দ্র-বিষয়ক রচনা। আমার 'রবীন্দ্রজীবনী' পড়ার প্রথম স্মৃতি সেই আবেগাতুরতার অনুভব-সিক্ত।

প্রভাতকুমার : যেমন দেখেছি—ভেবেছি

ছাত্রজীবনেই আর পড়েছিলাম 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' —দেশ জুড়ে তখন ৪২-এর আন্দোলন উথাল-পাথাল ; আমরা গভীর রাতে বেতারে শুনি সুভাষচন্দ্রের ডাক !

জীবনের তৃতীয় দশকের উপান্ত-সীমায় প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াই তখন—তবু প্রভাতকুমারের সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের মুখে এক দশক আগেকার ভাবালুতার ছোঁয়া জড়িয়েছিল। মুখজোড়া অনতি-প্রশস্ত দাড়ি—পরিমানে কালোর চেয়ে শাদা বেশি ; স্বল্প প্রসারিত চুলের গোছা—মাথায় তত নেই, কাঁধের সীমান্তস্পর্শী যত ; গেরুয়া রঙের পাঞ্জাবির ওপরে কালো ফিতেয় জড়ানো অদৃশ্য ঘড়ি—পকেটের সীমানা পর্যন্তই চোখের দৃষ্টি চলে, চোখে চশমা—'রিমলেস্' ! রূপ এবং বিন্যাসের অতলে রুচিস্নিগ্ধ শালীনতার ছাপ অনতি-প্রচ্ছন্ন। দাদার সঙ্গে কথা হতেই সারামুখ হাসিতে ছেয়ে গেল— বঙ্কিম কটাক্ষের ছাপ কণ্ঠস্বরে ঝরছিল যেন।

আমার পড়াশোনার ব্যবস্থা হয়ে গেল সেদিন থেকেই। গ্রীষ্মের ছুটি—সকাল বেলায় গ্রন্থাগার খোলা থাকে ; আমি পড়ি বসে সাতটা থেকে এগারোটা। পুরোনো লাইব্রেরি তখন ছিল আজ যেখানে পাঠভবন সেইখানে।

দিন দুই পরে মগ্ন হয়ে পড়ছি একটি কোণে—টেবিলের উপরে ছায়া পড়ল—চেয়ে দেখি, গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার ! সামনের চেয়ারটিতে বসে পড়লেন হাসিমুখে। শুধালেন, 'কি পড়ছ ? কি লিখবে ?'

মনে মনে তখন জীবনের প্রথম লেখার মহড়া চলছে। বললামও, 'বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস সম্পর্কে কিছু পড়াশোনার ইচ্ছে।' তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন ফিরে এল, 'কবে থেকে তার শুরু ?'

'চর্যাপদ'এর প্রসঙ্গ তুলে কথা বেশি বাড়ানো গেল না—আবার প্রশ্ন-বিদ্ধ হতে হল, 'রামমোহনের আগে বাংলা সাহিত্যে ছিল নাকি কিছু ? কতটা ছিল ?'

অপ্রত্যাশিত জিজ্ঞাসায় চমকে চেয়ে দেখি প্রভাতকুমারের গালভরা হাসি—মাথাটি একটু হেলানো—সেই সূত্রে, কিংবা স্বভাবতই, চোখের তারা কোনা ছুঁয়েছে—তাতে হাসির আভা আরো চক্‌মকে। মুখের চেয়ে—পরেও বারে বারে মনে হয়েছে—প্রভাতকুমারের চোখের হাসিতেই তাঁর ব্যক্তিত্বের উল্লাস উপচে পড়ে বেশি ! আসলে চোখ-মুখ জুড়েই যেন ইচ্ছাকৃত কটাক্ষের আভাস ! উত্তরের অপেক্ষা ছিল না—ঐ কটাক্ষটুকু ছুঁড়ে দিয়েই ছিট্‌কে চলে গেলেন।

সেদিনের সে প্রশ্ন ভাবিয়েছে অনেক—অনেক দিন ধরে। ইতিহাসের মহাপণ্ডিত কখনো কি ঐতিহ্য-বাহিত রিক্‌থ-কে অস্বীকার করতে চাইতেও পারেন ? না—এ প্রথম-সন্ধানীর প্রতি নিছক কৌতুক ! আরো প্রায় বছর আট পরে এক সভায় দৈবাৎ দেখা হতে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা'র প্রথম পর্যায় সম্পর্কে কৌতুহল প্রকাশ করেছিলেন। সেদিনও পুরোনো কথা নূতন করে মনে হয়েছিল—এ এক ধাঁধা। আজ যখন খুব কাছে এসে গেছি মনস্বী প্রভাতকুমার হয়ে পড়েছেন 'প্রভাতদা'—তখন জানি, এ কেবল ধাঁধাই—আর কিছু নয় ! তাইতেই চিনি তাঁর পুরো ব্যক্তিত্বটিকে—প্রতিভার নিকষ কঠিন গাঢ়তার ফাঁকে ফাঁকে তরতরিয়ে চলা কৌতুকের প্রাণ-বন্যা—আজ যাকে বলতে ইচ্ছে করে প্রভাতদা'র 'দুষ্টুমি।'

রামমোহন রায়ের প্রতি তাঁর ভক্তি অবিচল—একাগ্র। ইতিহাস তথা জ্ঞানলোকের প্রতিও আসক্তি তেমনি উন্মুখ !

কিন্তু আজ ভাবি, সেদিন একটিকে সম্মতি জানাতে আরেক-টিকে অস্বীকার করতে নিশ্চয়ই চান নি প্রভাতকুমার! আসলে প্রথম জিজ্ঞাসুর মনে 'ধন্ধ' লাগিয়ে দেবার 'দুষ্টুমি'-টুকুই ছিল তার মূলে। মুখের কথায় প্রভাতকুমার এমনি 'ধন্ধ' লাগিয়ে লাগিয়েই চলেন—রস-উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর সান্নিধ্য। আর ঐ রস-প্রাণতাই অমেয় পাণ্ডিত্যের ভারকে বোঝা হতে দেয় নি কখনো তাঁর মধ্যে—প্রতিক্ষণের শ্বাস-প্রশ্বাসের মতই আজও অনায়াসে নিত্য নূতন জ্ঞান-লোক-পরিক্রমার পথে ঝর্ণার মত চলেছে তাঁর জীবনের স্রোত!

ইদানীং দেখা হলেই প্রভাতকুমার প্রায় নিয়তই বলেন, 'তোমরা রস কর, আমি কষ করি।' আসলে উনি রস-কষ দুই-ই করেন—তাই নিয়ে তাঁর পূর্ণ পরিচয়।

প্রথমে কষের উৎসটিকে খুঁজে দেখা যাক: ১৯৬০-এ জলপাইগুড়িতে রবীন্দ্রজন্মশতবর্ষ-সূচনায় তিনি বক্তৃতা করে-ছিলেন, তাঁর জীবনের সাধনায় রবীন্দ্রনাথের দান বিষয়ে।

শান্তিনিকেতনের গ্রন্থাগারের দায়িত্ব পেয়েছেন তখন সদ্য তরুণ প্রভাতকুমার। গ্রীষ্মের অবকাশ চলেছে—শান্তিনিকেতনের দুরন্ত গ্রীষ্ম! গ্রন্থাগার তখনো দুবেলা খোলা থাকে—ভোর থেকে গোটা পূর্বাহ্ণ; দুপুরে ঘণ্টা দুই বিরতির পর আবার সন্ধ্যার আগে অবধি। দুপুরের রোদে কেউই আসেন না পড়তে—বাইরে ঝাঁ ঝাঁ রোদ, ভেতরে 'একা গ্রন্থাগারিক। ভরা পেটে 'ভাতঘুম' ঝিমুনি ধরিয়েই দেয়। পর পর কয়েক দিনে কারোই উপস্থিতি না দেখে সাহসী প্রভাতকুমার দুপুরের আবেশটুকুকে প্রশ্রয় দেবার ব্যবস্থা করলেন—গ্রন্থাগারের একটি কোনায় নিভৃত মাদুর-বালিশের সংযোগে। ভালোই চলছিল; এরই মধ্যে বিনা মেঘে বজ্রপাত! মাঠ-ফাঁটা রোদ্দুরে চারি-

দিক নিস্তব্ধ—গ্রন্থাগার ততোধিক নিষুপ্ত। তাই ভেদ করে কেঁপে উঠল চেনা গলার খাঁকারি, সঙ্গে এক-দু পদক্ষেপে চেনা চটির পদক্ষেপ। হুড়মুড়িয়ে উঠে বসে মাদুর-বালিশ ছুঁড়ে ফেলার জায়গা খুঁজে পান না গ্রন্থাগারিক। কোনো মতে গুটিয়ে লুকিয়ে সামনে হাজির হতেই সারা মুখে হেসে কবি বলেন, 'ঘুমিয়ে পড়েছিলে?' প্রভাতকুমার নির্বাক!

কবি সর্বদাই দিবানিদ্রা বিমুখ ছিলেন; কি একটা বই-এর দরকার পড়তেই দুপুরের রোদ ঠেলে চলে এসে-ছিলেন নিজে; আর তরুণ প্রভাতকুমার অপ্রস্তুত। সেই দিনই পণ করেছিলেন, দিনে আর শয্যা স্পর্শ করবেন না সুস্থ দেহে। ৬৫-র ওপার পর্যন্ত তার ব্যতিক্রম হয় নি। এই দৃঢ় পণ বলিষ্ঠতা প্রভাতকুমারের অতন্দ্র অধ্যবসায়ী সাধনার চাবিকাঠি—'রস' করে তিনি যাকে বলেন 'কষ'। ঐ প্রতিজ্ঞাই সেদিন তাঁর আলস্য-জড়িমাহীন অতন্দ্র জ্ঞান তপ-স্যার ভিত রচনা করে দিয়েছিল।

আর রসের কথায় মনে পড়ে ঐ বছরেরই দার্জিলিং-এর এক শতবার্ষিকী রবীন্দ্র-আলোচনা সভা। সভাপতি প্রভাত-কুমার স্বয়ং; বক্তাদের মধ্যে প্রখ্যাত অধ্যাপক, সাহিত্যিক, রসিক আছেন কয়েকজন। একালের অনেক সভাই লঘুতায় পর্যবসিত হয়, ঐ 'মাষ্টারি' সংস্কার বশে গুরুগম্ভীর বিষয় সব নির্দেশ করা ছিল বক্তাদের জন্যে; সাধ্যমত সুবিচার করবারও চেষ্টা করেছিলেন সবাই।

কিন্তু সভাপতিই দিলেন সব ভাসিয়ে—এমন বক্তৃতাই করলেন, পদে পদে পরিপূর্ণ সভাকক্ষ ভেঙে পড়ে কেবলই হাসির হুল্লোড়ে। অথচ সে-কথাও রবীন্দ্র-কথা! বেরোবার মুখে বললেন, 'কেমন শুনলে?'

কি বলব ? গাম্ভীর্যের বাঞ্ছিত পরিবেশটুকু ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে গেল, তবু যথার্থই অখুশি হই নি তো !

পরদিন সকালে প্রভাতকুমার অপ্রত্যাশিত ভাবে বাড়িতে গিয়ে হাজির ! ঢুকেই বললেন, 'কি করে তোমরা অত বড় বড় কথা বক্তৃতায় বলতে পার ? কেমন শুনলে কাল ? লোকে বললে তো—এই বুঝি রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাত মুখোপাধ্যায় ! কি জান, অত গুরুগম্ভীর লিখতে হয় বলেই বক্তৃতায় প্রায়ই আমার কৌতুক করতে ইচ্ছে করে।'

চেয়ে দেখি, বাঁকা চোখের ডগায় সেই ভাঙ্গা হাসি—মুখে ছাপিয়ে পড়ছে—যেমন দেখেছিলাম ১৯৫২-তে বিশ্ব-ভারতীর গ্রন্থাগারে। মনে হল—এও সেই "ধন্ধ" !

সেই কথাই হচ্ছিল—ঐখানেই প্রভাতকুমারের অ-সাধারণতা ! ভাষা-সাহিত্য-ইতিহাস-সমাজবিদ্যা-গ্রন্থাগারবিজ্ঞান-ধর্মতত্ত্ব প্রভৃতি বহুমুখী জ্ঞানের আহরণে যে নৈর্ব্যক্তিক-নিরপেক্ষ সাধনা নিজেকে নিঃশেষে নিঙড়ে নেবার অবিরাম অধ্যবসায়ে রত, জীবন-উৎসুক কৌতুকী কৌতূহলের নিরন্তর বহমানতার কল্যাণে সেই একই ব্যক্তিত্ব সরস সাবলীলতায় গতিচঞ্চল। তাই পাণ্ডিত্যের প্রাচুর্য কোথাও ভার হয়ে চেপে নেই, কৌতুক-কটাক্ষ-চকিত সহাসতাও কেবল হাসির ফানুস হয়ে ঝরে পড়তে পায় না কখনো।

'রসে-কষে' মিশিয়েই পরিপূর্ণ প্রভাতকুমার !

সবিনয়ে

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায়

শান্তিনিকেতন এলাকায় প্রবেশ করার আগেই যে গ্রামটি আছে এ অঞ্চলের লোক মুখে তার প্রচলিত নাম 'ভুবনডাঙ্গা'। কিন্তু পুরানো দলিল-দস্তাবেজ ঘাঁটলে দেখা যাবে এর তৎকালীন নাম 'ভুবননগর'। গ্রামটির উত্তর-পশ্চিম দিকে গেলে দেখতে পাওয়া যায় একটি বৃহৎ দীঘি বা বাঁধ। অনেকেই সে জলাশয়টি দেখেছেন; কিন্তু এটির ইতিবৃত্ত সম্বন্ধে জানার ঔৎসুক্য সাম্প্রতিক কালে তেমন নেই। এই দীঘিটির ইতিহাস দেড়শো বছরের। কিন্তু যথাযথ উদ্যোগ এবং সংস্কারের অভাবে পুষ্করিণীটির অবস্থা হয়েছিল শোচনীয়। এর দক্ষিণ কোণে অত্যন্ত অবহেলিত, অনাদৃত ভাবে আজও দাঁড়িয়ে আছে একটি স্তম্ভ যা পরবর্তী যুগের একটি ঐতিহাসিক ঘটনার প্রতীক।

আজ থেকে চুয়াল্লিশ বছর আগের কথা। ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সমস্ত বীরভূমের শুষ্ককঠিন বুকে নেমে এসেছে দুর্ভিক্ষের কালো ছায়া। জলাভাব দেখা দিয়েছে ভয়াবহ ভাবে। মানুষ জলাভাবে, অন্নাভাবে দিশেহারা। সেই সময় এগিয়ে এলেন আমার পিতা প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ঐ প্রাচীন দীঘিটির পুনঃসংস্কারের চেষ্টায়। তাঁর এই প্রচেষ্টায় প্রধান সহায়ক হলেন বিশ্বভারতীর দুজন বিশিষ্ট সমাজসেবক। একজন সর্বজন শ্রদ্ধেয় প্রয়াত কালীমোহন ঘোষ এবং আরেকজন এই অঞ্চলের সুপরিচিত সমাজসেবী স্বর্গত নিশাপতি মাঝি। দীঘির খনন কার্যে লেগে গেল শতাধিক নরনারী যারা অভাবের তাড়নায় আতঙ্কিত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল দৈনিক রোজগারের সুযোগ পেয়ে। মহিলাশ্রমিকদের দুঃস্থ সন্তানদের দুধ বিতরণ করারও ব্যবস্থা

হ'ল। অসুস্থতায় হ'ল চিকিৎসার ব্যবস্থা। সমবেত প্রচেষ্টায় দেখতে দেখতে সেই নিমজ্জিত পঙ্কিল বাঁধটি রূপ নিল এক বিরাট জলাশয়ে। গ্রামবাসীরা আনন্দিত মনে দেখতে লাগল বিস্তৃত দীঘির স্বচ্ছ জলের রূপ।

শান্তিনিকেতনে বৃক্ষরোপণ ও বর্ষামঙ্গল অনুষ্ঠানের দিন এগিয়ে আসছে। গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ আমার পিতাকে আশীর্বাদ জানালেন ত্রাণ ব্যাবস্থার সার্থক রূপায়ণের জন্য। শুধু তাই নয়, সেবারের বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠানটি ভুবনডাঙ্গা প্রসাদবিদ্যালয় প্রাঙ্গণে (জলাশয় বা বাঁধটির ধারে) করবার প্রস্তাবও এল তাঁর কাছ থেকে। দীঘিটির এপার ওপার সাজানো হ'ল শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর নির্দ্দেশনায়। আশ্রমবাসী এবং গ্রামবাসীদের এবং সেদিনকার মিলিত আনন্দোৎসবটির বর্ণনা তৎকালীন 'প্রবাসী' প্রভৃতি বহুল প্রচলিত পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। কৃষ্ণচূড়া বৃক্ষ রোপণ করলেন গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ এবং সেই ঐতিহাসিক ঘটনার স্মৃতির বাহক হয়ে রইল উল্লিখিত মূক স্তম্ভটি। সেটি এখন জীর্ণ—ভগ্নপ্রায়।

আমার পিতার সমাজ সংস্কারের প্রথম পদক্ষেপের পরই একে একে নানা কাজ এসে গেল তাঁর কাছে। জল সমস্যার ঐ দুরূহ কার্য সাধনের পর পিতার মন গেল পার্শ্বস্থিত গ্রামবাসীদের অন্তর্বিবাদ ও কলহর সুরাহা করায়। প্রায়ই শোনা যেত তারা তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে মামলা-মকদ্দমায় জড়িয়ে পড়ছে এবং সর্বস্বান্ত হচ্ছে। আমার পিতা আমাদের বাড়ীতেই সভা ডেকে গ্রামবাসীদের পারস্পরিক সহযোগিতায় সব বিবাদ-বিসম্বাদের আপোষ করে ফেলার ব্যবস্থা করলেন।

শান্তিনিকেতনের অদূরেই কতকগুলি গ্রাম-সমষ্টির একটি পরিষদ (*Union Board*) বহু বৎসর যাবৎ ছিল স্থানীয় প্রতাপশালী জমিদার পরিবারের কুক্ষিগত। গ্রাম উন্নয়নের কোন উদ্দেশ্যই তাঁদের ছিল না—একমাত্র লক্ষ্য ছিল নিরীহ গ্রামবাসীদের কাছে তাঁদের দোর্দ্দণ্ড প্রতিপত্তি দেখানো। তাঁদের হাত থেকে গ্রাম পরিষদটিকে উদ্ধার করবার জন্য প্রস্তুত হলেন আমার পিতা। সেই প্রথম এ অঞ্চলে জনমত জেগে উঠল সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে। নির্ব্বাচন-যুদ্ধে প্রবল পরাক্রান্ত জমিদারগোষ্ঠী শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন পিতার মতো একজন সাধারণ শিক্ষাবিদের কাছে। দীর্ঘ আঠারো বছরের বিশেষ গোষ্ঠীর একাধিপত্যের অবসান ঘটল সম্পূর্ণভাবে। এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনায় পিতাকে জনসেবার কাজে সহায়তা করার উদ্যম ও প্রেরণা জাগল সাধারণ মানুষের মধ্যে। তালতোড় ইউনিয়ন বোর্ড পরিচালনার ভার নিয়ে পিতা ঐ সব গ্রামবাসীদের ঐকান্তিক সহযোগিতায় রাস্তা নির্ম্মাণ, কূয়ো এবং পুকুর খননের ব্যবস্থা করলেন। তদানীন্তন সরকারী মহলও অভিভূত হয়ে গেলেন অনড়, অটল সমাজ ব্যবস্থায় এতগুলি উন্নয়নের কাজ দেখে। আজও নিকটস্থ গ্রামগুলির প্রবীণ গ্রামবাসীরা অনেকেই স্মরণ করেন সেই সব কর্মযজ্ঞের কথা শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার সঙ্গে।

বোলপুর সহর অঞ্চলেও তখন স্ত্রী-শিক্ষা সম্বন্ধে অনেকের মনের ভাবটা ছিল অনেকটা মধ্যযুগীয়। বালিকা যখন কিশোরী হ'ল তখন সে গৃহের অভ্যন্তরে এবং লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকবে, কেননা সে তখন বিবাহযোগ্যা। উচ্চশিক্ষা স্ত্রীলোকদের পক্ষে মোটেই বাঞ্ছনীয় নয়; এই ছিল তখনকার এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মনোভাব। আমার মা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞভাবে

এগোলেন এই সংস্কার মোচনের কাজে। পিতা এগোলেন জনসাধারণের মধ্যে স্ত্রী-শিক্ষার বিষয়ে শুভ চেতনা জাগাতে। দেশে তখন বিদেশী শাসন ব্যবস্থা। সেই সরকারী মহলকেও তাঁদের দুজনের প্রচেষ্টায় সাহায্য করতে অনুরোধ করলেন। পিতামাতার যুগ্ম প্রচেষ্টায় এবং বোলপুরের বিশিষ্ট সমাজ সংগঠক প্রয়াত হংসেশ্বর রায়ের সহায়তায় একটি নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় রূপান্তরিত হ'ল উচ্চ বিদ্যালয়ে—যেদিন সৌধ প্রতিষ্ঠিত হ'ল সেদিনের আনন্দ এবং উদ্দীপনার কথা বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

আজ এ অঞ্চলের সর্বত্রই একটি সামাজিক পরিবর্ত্তন এসেছে। গ্রামবাসীরা সচেতন হয়েছেন নিজেদের এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে। স্ত্রী-শিক্ষায় বোলপুরের মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটির অবদান আজ সর্বজন স্বীকৃত। সমস্ত সাংগঠনিক কার্যের পিছনে যে বিরাট পরিশ্রম এবং আন্দোলন গড়ে উঠে-ছিল, তার ইতিহাস বোধহয় আধুনিক কালে প্রায় অজানা। যাঁর এবং যাঁদের কঠোর কর্মপ্রেরণা আঞ্চলিক সমাজ সংগঠনের পথ প্রস্তুত করল, সেই দুজনের সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলে এবং গুরুদেবের রচনার কিছু উদ্ধৃতি দিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করলাম:

'কেবলই তোমার স্তবে নয়, শুধু সঙ্গীতরবে নয়,
শুধু নির্জনে ধ্যানের আসনে নহে—তব সংসার যেথা জাগ্রত রহে,
কর্মে সেথায় তোমারে স্বীকার করিব হে।
প্রিয়ে অপ্রিয়ে তোমারে হৃদয়ে বরিব হে॥'

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

জগন্নাথ চক্রবর্তী

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় যখন জীবনীকার তখন তিনি রবীন্দ্রভারে ভারাক্রান্ত। তবে রবীন্দ্রভার বহন করবার যোগ্যতা তাঁরই আছে যিনি রবীন্দ্রনাথের মতোই কর্মে নিরলস, রচনায় নিরলস এবং বিশ্ববিচিত্রার প্রতি যাঁর ঔৎসুক্য চিরনবীন। রবীন্দ্রনাথের রচনা এবং প্রভাতকুমারের রচনা অবশ্য দুটি পৃথক জগতের। একটির উন্মুখতা সৌন্দর্য্যের প্রতি, শব্দের গভীরে নিহিত বিস্ফোরক রহস্যের প্রতি, অপরটির বিচরণ সত্যের আলোকিত মুক্ত অঙ্গনে, বাস্তব ইতিহাসে। জ্ঞান আহরণে ও সত্যসন্ধানে প্রভাতকুমারের আগ্রহ, উৎসাহ এবং পরিশ্রম রবীন্দ্র-নাথের সান্নিধ্যে উদ্দীপিত এবং রেনেসাঁসী আদর্শে উদ্বুদ্ধ। নব-জাগরণের জোয়ারে বহু বাঙালী চিত্ত আলোড়িত হয়েছিল এবং ভারতবর্ষের মুক্তিপথে তাঁরাই ছিলেন দিশারী। এই জোয়ারের মধ্যেই ভূমিষ্ঠ হয় বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ, এবং এই জাতীয় শিক্ষা পরিষদেরই এক উজ্জ্বল মেধাবী অন্তেবাসী ছিলেন প্রভাত-কুমার। জ্ঞান বিজ্ঞানের সাধনার মধ্য দিয়েই যে ভারতবর্ষের মুক্তিপথ প্রসারিত হবে এবং জ্ঞানই যে প্রকৃত শক্তি, এই শিক্ষা ও প্রত্যয় প্রভাতকুমার জাতীয় শিক্ষা পরিষদ থেকেই লাভ করে-ছিলেন। জ্ঞানের প্রতি নিঃস্বার্থ ঔৎসুক্য যদি তাঁর মজ্জাগত না হত, সত্যসন্ধান যদি তাঁর তপস্যা না হত তবে তিনি সার্থক জীবনীকার হতে পারতেন না। 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় তিনি লিখেছিলেন : "জ্ঞান ও ভাব, রূপ ও রস, সৌন্দর্যের বিচিত্র নিবিড় অনুভূতি, জগৎকে ও জীবনকে নানা কল্পনায় ও

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

চেতনায় শাশ্বতের পটে সত্য করিয়া জানিবার ও জানাইবার প্রয়াসই তাঁহার জীবনের মূলগত সাধনা। এই সাধনার মধ্য দিয়াই বিশ্বসৃষ্টির পূর্ণরূপ তাঁহার অধ্যাত্মজীবনকে গড়িয়া তুলিয়াছে ; অন্তরে বাহিরে, ধ্যানে কামনায় কর্মকে সত্যের বিপুল মহিমা দান করিয়াছে।" রবীন্দ্রনাথের প্রতি প্রযুক্ত এই কথাগুলি প্রভাতকুমারের নিবিড় অনুভূতিরও কথা। জ্ঞান, সত্য, সাধনা, ধ্যান—এই শব্দগুলি সাড়ম্বর শব্দমাত্র নয়, প্রত্যেকটিই প্রভাত-কুমারের জীবনে অনুভূত ও কর্মে প্রতিফলিত শব্দ।

প্রভাতকুমারের প্রতিভা এই সাধনায়, এই জ্ঞানান্বেষণে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রজীবনীর মর্যাদা রবীন্দ্রনাথের জীবনের উপর যেমন প্রতিষ্ঠিত তেমনি প্রতিষ্ঠিত রবীন্দ্রজীবনীকারের সত্য-নিষ্ঠার মর্যাদার উপরও। দ্বিতীয়টিকে অবলম্বন না করে প্রথমটির প্রতিষ্ঠা সম্ভবই হত না। এই মর্যাদাবলে তপস্বীকে আমরা আরো ভালোভাবে বুঝতে পারি যখন দেখি তাঁর ভুবনডাঙ্গা ও রবীন্দ্র-ভুবন রবীন্দ্রভবনেই সীমায়িত নয়, তাঁর বিশ্বভারতী বোলপুর অতিক্রম করে সত্যিই বিশ্বভারতে প্রসারিত। রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে তিনি আত্মসন্তুষ্ট নন, যদিও রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে আত্মতুষ্ট থাকা অন্যায়ও নয় বা তাতে কোনো অগৌরবও নেই। কিন্তু প্রভাতকুমার শুধু রবীন্দ্রস্পৃষ্টই নন, জ্ঞানস্পৃষ্টও। এই জন্যই রবীন্দ্রনাথকেও তিনি নিস্পৃহ জ্ঞানতপস্বীর সত্যদৃষ্টিতে দেখতে পেরেছেন। এটি অসামান্য ক্ষমতা। যখন অপর সকলে রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক অভিভূত, প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের নিকটতম সান্নিধ্যে থেকেও স্থিতধী, আত্মধী।

জাতীয় শিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত তরুণ প্রভাতকুমারের কাছে জ্ঞানচর্চা ও গবেষণাস্পৃহা ছিল জীবনচর্চার আবশ্যিক

শর্ত। এই জ্ঞানস্পৃহাকেই আমরা বলে থাকি রেনেসাঁসী চেতনা, এই চেতনার জন্যই তাঁর আগ্রহ এমন বহুমুখী। চীনা ও তিব্বতী ভাষা এবং সাহিত্যের প্রতিও তাঁর গভীর আগ্রহ আমাদের চমকিত করে। ১৯২৭ থেকে ১৯৩০—এই সময়কালে বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন ছাত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় শিক্ষা পরিষদে ফিরে এলেন অধ্যাপকরূপে। তিনিই আমাদের দেশে, বলতে গেলে, প্রথম জাতীয় অধ্যাপক। জাতীয় শিক্ষা পরিষদে হেমচন্দ্র বসুমল্লিক অধ্যাপক পদে আসীন থেকে তিনি চীনে ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে ধারাবাহিক বক্তৃতা দেন। অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের সেই বক্তৃতাবলি পরবর্তীকালে 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' এই নাম দিয়ে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে। প্রকাশ করেছেন বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদ। রবীন্দ্রনাথের ইতিহাস চেতনা রবীন্দ্রনাথকে ইতিহাসচর্চায় নিয়োজিত করে নি, তাঁর বিশ্বসাহিত্যে আগ্রহও তাঁকে ধারাবাহিক সাহিত্যের ইতিহাস রচনায় উদ্বুদ্ধ করে নি। রবীন্দ্রনাথ অবশ্যই ইতিহাসবিদ ছিলেন, কিন্তু ইতিহাসকার হন নি। উপাদান সংগ্রহের ডিসিপ্লিন এবং উপাদানসমূহের কালানুক্রমিক বিশ্লেষণ ও তাৎপর্য অনুধাবন-এর জন্য বিশেষ মানসিকতা ও প্রস্তুতি প্রয়োজন হয়। প্রাণিত কবির পক্ষে এই কাজ কালক্ষেপ মাত্র। কিন্তু প্রভাতকুমার এখানে নিজের স্বাতন্ত্র্যে সম্ভ্রান্ত. তাঁর মনীষা দেশবিদেশের ইতিহাস ও সাহিত্যের খনিতে পারদর্শী ইনজিনিয়ারের। তিনি যে তাঁর গবেষণাগারকে অনেক সময় 'কারখানা' বলে কৌতুক করেন তা কিন্তু নিছক কৌতুক নয়, তার অন্তরালে রয়েছে দীর্ঘ অভিজ্ঞতার প্রত্যয়ী ঘোষণা। প্রতিভার চকিত ক্ষণপ্রভার জন্য তিনি কখনো ঊর্দ্ধমুখ অপেক্ষায়

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

বসে থাকেন নি, মেধাবী পরিশ্রমে প্রতিটি মুহূর্তকে করে তুলেছেন মূল্যবান। 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি বলেছেন: "ভারতবর্ষের ইতিহাস—সমগ্র এশিয়ার ইতিহাস হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেখিতে আমরা এতই অভ্যস্ত যে এই প্রাচ্য-এশিয়ার অখণ্ডত্বকে সহসা বিশ্বাস করিতে সাহস পাই না। কিন্তু সত্যের সত্তা ইতিহাসের পাতার মধ্যে, মানব জীবনের ধর্ম বিশ্বাসের মধ্যে, দর্শন ও ইতিহাসের মধ্যে জীবন্ত।" প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের জন্য তিনি কেবল সদিচ্ছা প্রকাশকেই যথেষ্ট মনে করেন নি, তাই মহাচীনের বহু শতাব্দী-ব্যাপ্ত বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শন চর্চার বিবরণ বহু পরিশ্রমে সংগ্রহ করেছেন। জাপানী পণ্ডিত সুজুকি কেবল জেন-বুদ্ধবাদের উপরই আজীবন গবেষণা করেছেন, কিন্তু প্রভাতকুমারের গবেষণার বিষয় বৌদ্ধ ও হিন্দু দর্শনের সমগ্র চীনা ভাষ্য। তাঁর বিষয়ের মানচিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে আমরা বিস্মিত না হয়ে পারি না। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় দর্শন এবং উভয় সাহিত্যের কথাই তিনি ব্যাখ্যানে প্রবৃত্ত; কারণ তিনি ভারত-বর্ষকে বৌদ্ধ ও হিন্দু এইভাবে বিভক্ত করে দেখতে ভালবাসেন না। ভারতবর্ষের সমগ্রতা ও ভারতীয় চেতনার অখণ্ডতা এবং ধারাবাহিকতায় তিনি আস্থাবান। শুধু ইতিহাসই নয়, ইতিহাস-দর্শনও তাঁর আয়ত্ত। এবং তাঁর ইতিহাস-চর্চায় এই ইতিহাস-দর্শনের চেতনা বিশেষভাবে পরিস্ফুট। প্রিয়দর্শী অশোক ধর্মের বাণী প্রচারের জন্য ভারতের ভৌগোলিক সীমানার বাইরে ভিক্ষুদের প্রেরণ করেছিলেন। এই ঘটনাকে প্রভাতকুমার ভারত-ইতিহাসের দিকে খুব বড় ব্যাপার বলে মনে করেন না, কিন্তু এশিয়ার ইতিহাসে একে এক স্মরণীয় ঘটনা বলে অভিহিত

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

করেন। এইভাবে পদে পদে বিশ্লেষণ ও ঘটনার তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে করে তাঁর চীনে বৌদ্ধসাহিত্য পরিক্রমা।

প্রভাতকুমারের গবেষণার স্বভাবই হচ্ছে মৌলিকতা ও মূলানুগত্যকে সমন্বিত করা। অবাধ কল্পনার পক্ষিরাজে তিনি সওয়ারী হতে নারাজ; সেজন্য তো রবীন্দ্রনাথই রয়েছেন। তিনি নির্ভরযোগ্য বাস্তব উপাদানের সমন্বয়ে তাঁর ইমারতটি গড়ে তোলেন। এই কারণে, কনফুসিয়াসদর্শন অনুধাবন করবার জন্য তিনি মূল চীনা ভাষা অধ্যয়ন করেছেন এবং চীনা ভাষ্যের সহায়তায় কনফুসিয়াসের মর্মে প্রবেশ করেছেন। কনফুসিয়াসের 'মহাশিক্ষা' ব্যাখ্যানের জন্য যিনি গ্রন্থটি বাংলায় রূপান্তরিত করার দায়িত্বও গ্রহণ করেন তিনি যে অসাধারণ গবেষক তা বলাই বাহুল্য। বিঘ্ন-কৃত ধম্মপদ সূত্রের চীনা তর্জমাও তিনিই প্রথম বাংলায় রূপান্তরিত করেছেন, এটি তাঁর এক স্থায়ী কীর্তি। অনিত্যবর্গের একুশটি শ্লোক অনুবাদ করবার সময় তিনি সংস্কৃত, তিব্বতী, পালি ও প্রাকৃত বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে অনেক তুলনীয় অংশ উদ্ধার করে বিচার-বিশ্লেষণ করেছেন; সিলভ্যাঁ লেভি সম্পাদিত তুখারির অনুবাদও তিনি সযত্নে পরীক্ষা করতে ভোলেন নি। 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' গ্রন্থে তিনি আমাদের দৃষ্টি এশিয়া মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত করেছেন। মধ্য এশিয়ার আলোচনায় তিনি অতীতকে জীবন্ত করে তুলেছেন এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ইতিহাস চেতনার তুলনা করে বলেছেন: "আমাদের ইতিহাসের আদর্শ পশ্চিম হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। সেই কথা ভুলিয়া গিয়া পাশ্চাত্য পণ্ডিতদিগের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমরা আমাদের অতীতকে অবজ্ঞা ও

অস্বীকার করিতে বসিয়াছি।" তাঁর এই সাবধান বাণী এখনও আমাদের কাছে শিক্ষাপ্রদ। চীন ও মধ্য এশিয়ার মধ্যবর্তী অঞ্চলের লুপ্ত পুথি উদ্ধারের কাহিনী তিনি এমন সরসভাবে বর্ণনা করেছেন যে একবার পড়তে আরম্ভ করলে তা শেষ না করে পারা যায় না। পাঠকরাও যেন প্রভাতকুমারকে অনুসরণ করে তাঁর আবিষ্কৃত ঐশ্বর্যের একেবারে কিনারে গিয়ে দাঁড়ান। 'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' প্রকৃতই এক ধনভাণ্ডার। বাঙালীদের এই ধনভাগ্য প্রভাতকুমারের পরিশ্রমী খননেরই ফল।

'চীনে বৌদ্ধ সাহিত্য' প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের বঙ্গীয় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধ্যাপক রূপে প্রদত্ত বক্তৃতাবলির সংকলন। এই রচনার প্রাণপুরুষকে বুঝতে হলে আমাদের আরো একটি রচনার কাছে যেতে হবে, সেটি অধ্যাপক ডঃ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নিজের জবানিতে বর্ণিত 'জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলি'। প্রবীণ পণ্ডিত মানুষটি স্বচ্ছন্দ স্টাইলে গল্পের আকারে স্মৃতিচারণা করেছেন এই পুস্তিকায়। বিংশ শতকের একেবারে গোড়ার দশকের যুবক দিনগুলির কথা প্রভাতকুমার স্মৃতির কৌটা খুলে একে একে পাঠকের সামনে মেলে ধরেছেন। সেই আন্দোলন-উত্তাল স্বদেশী যুগ, অরবিন্দ-রবীন্দ্র প্রতিষ্ঠিত জাতীয় শিক্ষাপরিষদের জয়ধ্বনিত সূচনা কাল। রাণাঘাট থেকে গিরিডি, গিরিডি থেকে কলকাতা, বৌবাজার স্ট্রীট, শিবনারায়ণ দাস লেনে প্রাতঃস্মরণীয় সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটির অফিস, সেই সব স্বপ্নবৎ স্থান-কাল-পাত্রগুলিকে জাদুকরের মতো তিনি তাঁর কথকতায় একে একে আহ্বান করে এনেছেন। নিরভিমান

পণ্ডিতের নিরভিমান বর্ণনায় শিক্ষকদের প্রতি তাঁর অসীম শ্রদ্ধা ও ভালবাসার অর্ঘ্যটি সাজানো। মোক্ষদাচরণ সামধ্যায়ীর পতঞ্জলিভাষ্য পড়ানো, সখারাম গণেশ দেউস্করের বাংলা অধ্যাপনা, এবং সেই সঙ্গে প্রভাতকুমারের হিন্দী, মারাঠী প্রভৃতি ভাষা ও সাহিত্য চর্চার পাশাপাশি সিংহলী লিপি লিখে নিয়ে 'ধম্মপদ-অট্‌ঠ কথা' বাংলায় লিপ্যন্তরের বিবরণ পড়তে পড়তে এক বিস্মৃত যুগকে আমরা যেন জীবন্ত প্রত্যক্ষ করি। অবশ্য দুঃখও হয় বর্তমান কালের বহু বিশ্ববিদ্যালয়সঙ্কুল মানবিকতার স্পর্শশূন্য মানববিদ্যার মহা-অঙ্গনগুলির দিকে দৃষ্টিপাত করলে।

ঋষিকল্প প্রভাতকুমার আজ প্রবীণ প্রাজ্ঞ পুরুষ। কিন্তু তিনি যখন কিশোর ছিলেন তখন কী ভাবে দিন কাটাতেন তিনি ? তাঁর নিজের ভাষা কিছুটা এখানে উদ্ধার করছি : "কৃষ্ণজীবন দের কাছে স্বামী বিবেকানন্দের অনেকগুলি বই পেয়ে পড়লাম—বর্তমান ভারত, বীরবাণী প্রভৃতি ; তখন স্বামীজীকে জানলাম দেশপ্রেমের উদ্‌গাতা রূপে। কৃষ্ণজীবন দের দেখাদেখি রোজ সকালে 'গীতা' পড়তাম ; আর বিকেলে উশ্রী নদীর ওপারে বেহড় বা জঙ্গল ও খোয়াইয়ের মধ্যে গিয়ে লাঠিখেলা প্রভৃতি চলতো।" ডন সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সম্বন্ধে বলতে গিয়ে লিখেছেন : "জাতীয় শিক্ষা আন্দোলনের ইনিই ছিলেন প্রথম উদ্যোক্তা। *Dawn* মাসিক পত্রে বহু বৎসর থেকে তিনি ও তাঁর শিষ্যবৃন্দ যে বাণী প্রচার করেছিলেন, তা জাতীয় শিক্ষা পরিষদ রূপে মূর্ত হয়—এখানেই প্রথম দেখি রাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ, হারাণচন্দ্র চাকলাদার ও অরবিন্দ ঘোষকে। বিনয় সরকারকেও দেখলাম। তাঁরই নির্দেশে মেসে আশ্রয়

নিলাম। ১১৭ নং আমহার্স্ট স্ট্রীটের একটি দ্বিতল গৃহের উপর তলায় স্থান হলো আমার। জীবনে এই প্রথম মা-বাবা ভাই-বোন থেকে দূরে অনাত্মীয় পরিবেশে বাস করতে এলাম।” কখনো কখনো সামান্য তুয়েকটি কালির আঁচড়ে তিনি আমাদের স্তম্ভিত করে দেন, বিন্দুর মধ্যে এক বিষাদ-সিন্ধু সৃষ্টি করে বলেন: “মেসের একটি দিনের স্মৃতি স্পষ্ট হয়ে আছে। সন্ধ্যার পর জ্যোৎস্না আসছে জানালা দিয়ে। আমরা কয়েকজন ছাত্র চুপচাপ বসে আছি—কাছে আছেন আদিত্যদা, দর্শনের ছাত্র। তিনি বললেন—আজ ক্ষুদিরামের ফাঁসি হয়েছে মজঃফরপুরে।” এখানে ‘জ্যোৎস্না’ শব্দটির প্রয়োগে বিষণ্ণতার ছায়া পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে।

এই স্মৃতিচারণার উপসংহারে তিনি বলেছেন: “পুজাবকাশের পর ১৯০৯ সালের নভেম্বর মাসে রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতনে আশ্রয় পেলাম। এবং বরাবরের মতো ১৬৬ নং বৌবাজার স্ট্রীটের সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হল।” কিন্তু সত্যিই কি এই সম্বন্ধ ‘বরাবরের মতো’ ছিন্ন হয়েছিল? না। কারণ এর তু-দশক পরে ১৯২৭ থেকে ১৯৩০ তিনি আবার ফিরে এসেছেন জাতীয় শিক্ষা পরিষদে, ছাত্র হিসাবে নয়, বৃত হয়েছেন গবেষক অধ্যাপক রূপে। এবং যে পালি প্রাকৃত পাঠ তিনি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র রূপে গ্রহণ করেছিলেন সেই পালি প্রাকৃতের জগতেই আবার বিচরণ করেছিলেন তাঁর নবীনযুগের নবীন ছাত্রদের সঙ্গে; শুধু পালি-প্রাকৃত-সিংহলীই নয়, তিব্বতী ও চীনা পুথি থেকেও তিনি অজস্র উপাদান আহরণ করে বিতরণ করেছিলেন তাঁর নবীন শ্রোতৃমণ্ডলীর মধ্যে। রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমারকে

জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ছাত্র গবেষক ও অধ্যাপক
প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়

সম্পূর্ণ বুঝতে হলে তাঁকে শুধু শান্তিনিকেতনের দিনগুলির মধ্যে দেখলেই চলবে না, জাতীয় শিক্ষা পরিষদের দিনগুলির মধ্যেও দেখতে হবে। তাঁর সাফল্যের চাবিকাঠি কি তা অনুধাবন করতে হলে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বদৃষ্টির কথা জানলেই চলবে না, প্রভাতকুমারের নিজস্ব বিশ্বদৃষ্টির সঙ্গেও পরিচিত হতে হবে। তাহলেই বোঝা যাবে প্রভাতকুমারের প্রতিভা কেন রবীন্দ্রপ্রতিভার স্বরূপ বুঝবার পক্ষে এত সহায়ক।

আয়ুষ্মান প্রভাতকুমার

নির্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

রবীন্দ্রজীবনীকার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের অষ্ট-আশি বছর পূর্ণ হতে চলেছে—প্রভাতকুমারের পত্নী শ্রীমতী সুধাময়ী দেবী ও তাঁর সন্তানদেরই শুধু নয়, এ আমাদের সকলেরই পরম সৌভাগ্য। দীর্ঘ দিন তাঁদের সান্নিধ্য পেয়েছি—জেনেছি একান্ত ঘনিষ্ঠভাবে। আজ চেয়ে দেখছি সময়ের সুদীর্ঘ-ব্যবধান-অতিক্রান্ত সুদূরে—সে সব দিনের সুখ-স্মৃতি ভোলার নয়।

১৯১৮ সালের ডিসেম্বরের শেষে প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি আমার মাতুল শ্রদ্ধেয় যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ব্রহ্মবিদ্যালয়ে বিদ্যারম্ভের জন্যে। তখন আমি নিতান্তই 'ছোটো ছেলেটি'-মাত্র, কিন্তু প্রভাতদা তখন আক্ষরিক অর্থে প্রভাত-'কুমার'—'প্রাচীন' অবশ্যই নন। সুধাদির সঙ্গে বিবাহ হল তার পরের বছর। 'কুমার' প্রভাতদাকে আমার মোটেই মনে পড়ে না। 'প্রভাতদা-সুধাদি'কে নিয়ে হৃদয়-জুড়ানো এক অবিচ্ছিন্ন স্নিগ্ধ স্মৃতি আমার সেই বাল্যকালের। দু'জনে তাঁদের নতুন সংসার পাতলেন 'উটজ'-এর পাশে ছোট্ট এক কুটিরে বিশাল এক বটগাছের ছায়ায়—গুরুদেব রবীন্দ্রনাথ নিজে ক্লাস নিতেন এই উটজেরই ছায়ায় সাধারণতঃ। প্রভাতদার পরিবারের সঙ্গে আমার পরিচয়ের সূত্রপাত সেই সময় থেকে।

'সূত্র' হলেন আমার দুই মামাতো বোন মানসী ও সরসী—আমরা একসঙ্গে পড়তে গিয়েছিলাম শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ে। তখন সেখানে ছাত্রীদের জন্য 'শ্রীসদন' জাতীয় কোনো আবাসের ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম কয়েকমাস তাঁরা দু'জনে

ছিলেন সন্তোষদার (সন্তোষচন্দ্র মজুমদার) পরিবারভুক্ত হয়ে, সন্তোষদার মা'র (যুগলমোহিনী দেবীর) তত্ত্বাবধানে। কিন্তু সন্তোষদার ভাই-ভগ্নী, ভাগ্নে-ভাগ্নীদের সবাইকে নিয়ে ছিল তাঁদের অনেক বড় সংসার। তাই বিশেষ বিবেচনার পর তাঁদের আপত্তি সত্ত্বেও মাতুল যতীন্দ্রনাথ বন্ধু প্রভাতদার অনুগ্রহপ্রার্থী হলেন। মানসী ও সরসী আশ্রয় পেলেন প্রভাতদা-সুধাদির ছোট্ট নতুন সংসারে। সন্তোষদার বাড়িটি ছিল বড় রাস্তার ওপারে পূর্ব প্রান্তে, আশ্রম থেকে বেশ একটু দূরে। প্রভাতদার কুটির আশ্রমের বুকের মাঝখানটিতে হওয়ায় সব দিক থেকেই সুবিধা হল। আজ ভাবি—এ যুগের কোনো সদ্য বিবাহিত নবদম্পতি এ ধরণের উৎপাত সহ্য করতেন কি ?

দিনে দিনে আত্মীয়তার এক সহজ সম্পর্ক নিবিড় হল আমার দুই বোনের সঙ্গে তাঁদের দু'জনের। আবাসিক ছাত্র হলেও আমিও নিতান্ত বঞ্চিত ছিলাম না সে সৌভাগ্য থেকে।

সরসী—ছোট্ট ফুটফুটে ডানপিটে সেই মেয়েটিকে হয়তো আজও তাঁরা ভোলেন নি। একটি ঘটনা মনে পড়ছে। ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সেই গেছো মেয়ে নতুন তৈরী শিশুবিভাগের বাড়িটির ছাদ থেকে লাফ দিয়ে ঠ্যাং ভেঙেছিল। তখনি তাকে কোনো বকুনি বা শাসন নয়, কিন্তু পা সেরে যাবার পরে অভিনব এক সাজার ব্যবস্থা করেছিলেন প্রভাতদা। দুরন্ত-চঞ্চল সেই কন্যাকে সুস্থ হবার পরেও দিন দশ-পনেরো বিছানায় শুয়ে শুয়ে খাওয়া-দাওয়া করতে হয়েছিল. অবিকল রুগীর মতন। তার সেই বাচ্চা বয়সের হঠকারিতায় অচিরেই ভাঁটা পড়েছিল এই অব্যর্থ দাওয়াই প্রয়োগে—আজও আমার সে কথা মনে আছে। আশ্চর্যের ব্যাপার, পরবর্তীকালে এই

কন্যাই তাঁদের সমগ্র পরিবারের এতই আদরের হয়েছিল যে, একদিন প্রভাতদার ভগ্নী কাত্যায়নী দেবীর মধ্যস্থতায় তার বিবাহ পর্য্যন্ত সম্পন্ন হয় তাঁদেরই এক আত্মীয়-সমান তরুণ বান্ধবের সঙ্গে। শুভ-সূচনা শান্তিনিকেতনে হলেও এ সব অনেক পরের ঘটনা।

প্রভাতদা সুধাদি তাঁদের সদ্যোজাত প্রথম সন্তান সুপ্রিয়কে নিয়ে 'গুরুপল্লী'র নতুন বাড়িতে বাস আরম্ভ করলেন ১৯২১ সালে। যতদূর মনে পড়ে তাঁদের সেই গৃহ-প্রবেশই গুরুপল্লীর সর্বপ্রথম গৃহ-প্রবেশ। যতীন্দ্রনাথের ছোট ভাই ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় (আশ্রমবাসী সকলের 'ধীমু') হলেন তাঁদের অন্যতম প্রতিবেশী। গুরুপল্লীতে বাড়ি হওয়ায় মানসী ও সরসী তাঁদের মা'র সঙ্গে কাকার সেই নতুন বাড়িতেই থাকতে শুরু করলেন।

প্রভাতদাকে আমি এই সময়ে বিদ্যালয়ে শিক্ষকরূপে প্রথম পেলাম। প্রাককুটির-নাট্যঘরের পিছনের প্রকাণ্ড ক্ষীরকুল (হিন্দীতে 'খিরনী' বলে) গাছের তলায় বসতো ক্লাস। লাইব্রেরি থেকে নানা দেশ-বিদেশের গোছা গোছা রঙীন ছবি ও মানচিত্র আনতেন এবং সেগুলি দেখিয়ে গল্পের মতো করে ইতিহাস পড়াতেন তিনি। সুঠাম সুদর্শন শিক্ষকের জোরালো এবং সুস্পষ্ট বাক্‌ভঙ্গী বালক বয়সে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করতো সহজেই। প্রভাতদা সর্বদা দাঁড়িয়ে পড়াতেন; অথচ সে যুগে প্রায় সব মাষ্টারমশাইরা তাঁদের আসনে বসেই পড়াতে অভ্যস্ত ছিলেন। ইতিহাস পাঠের যে-গোড়াপত্তন সেদিন তিনি করে দিয়েছিলেন, তা আমাকে আজও ইতিহাসমুখী করে রেখেছে। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের নানা পর্বের সঙ্গে তিনিই আমাদের প্রথম পরিচিত করেন। সে সব কাহিনী অন্যান্য বিদ্যালয়ের ছেলে-মেয়েদের সেকালে বলা হত কিনা

সন্দেহ। ইস্কুলে ইস্কুলে *'England's work in India'* পড়ার যুগ চলছে তখন। আমরা কি আর তখন জানি যে, আমাদের শিক্ষকমশাই নিজেও বাঙলার 'স্বদেশী আন্দোলন' এবং 'ন্যাশনাল কাউন্সিল'-এর অনুপ্রাণিত এক দাগী সন্তান। তিনি যে সর্বদা দাঁড়িয়ে পড়াতেন সেটা কিন্তু শিক্ষা বিজ্ঞানগত নির্দেশ মানার কোনো ব্যাপার নয়। এখন মনে হয়, এ বোধ হয় তাঁর ক্রিয়াশীল সজাগ স্বভাব ও চারিত্রিক ঋজুতার প্রেরণা-সম্ভূত অভ্যাস—সোজা কথায় খাড়া শিরদাঁড়ার ব্যাপার।

১৯১৮ সালের আশ্রমবটু ঘটনাচক্রে এই শান্তিনিকেতনেই তার কর্মজীবন শুরু করল। ঠিক বিশ সাল বাদে, ১৯৩৮-এ, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকরূপে যখন কাজে যোগ দিলাম, বলা বাহুল্য, তখন আমি প্রভাতকুমারের সহকর্মী। আজও মনে পড়ে, প্রথম যেদিন লাইব্রেরি-ঘরে প্রভাতদাকে প্রণাম করতে গেলাম ক্ষিপ্রতার সঙ্গে পা সরিয়ে নিয়ে তিনি দু'হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে আলিঙ্গন করে বললেন—"জলের ব্যাঙাচি ডাঙার ব্যাঙ হয়ে ফিরে এসেছ, বড় আনন্দ হচ্ছে দেখে। বড় দাদা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপমাটা মনে পড়ে?" এই ধরণের রহস্যালাপের অন্ত ছিল না, যখনই দেখা হত কাজের ফাঁকে ফাঁকে।

একদিন প্রভাতদার সঙ্গে খুব এক চোট তর্ক হয়ে গেল তাঁর কাজের ঘরে বসে—কি বিষয় নিয়ে মনে নেই। শরীর-মন বোধ হয় সেদিন কোনো কারণে ভালো ছিল না। ভেবে-ছিলাম আমার উপর খুব রাগ হয়ে থাকবে তাঁর। দিনের শেষে 'দিনান্তিকা'র 'চা-চক্রে' সেদিন আমি আর গেলাম না প্রভাতদাকে এড়িয়ে থাকার জন্যে। আমি তখন নিচু-বাংলার বাগানে নতুন তৈরী এক বাড়িতে থাকি সপরিবারে, প্রভাতদা

থাকেন ভুবনডাঙায় তাঁর নিজের তৈরী কুটিরে—বর্তমানেও সেখানে আছেন। দিনান্তে বাড়ির বারান্দায় বসে আছি, হঠাৎ দেখি প্রভাতদা তাঁর বাড়ি যাবার সোজা সড়ক ছেড়ে গাছ-পালার মধ্য দিয়ে আসছেন আমাদের বাড়ির দিকে। সামনে এসে সহাস্যে আমার পত্নী মীরাকে (তিনিও ছিলেন আমারই মতো আশ্রম-প্রাক্তনী) হাঁক দিয়ে ডেকে বললেন—"সুদের টানে আসতেই হল।" তারপর আমাদের সদ্যোজাত কন্যা জয়িতাকে কোলে তুলে নিয়ে তিনি বললেন—"আসলের দেখা না পাই দুঃখ নেই, কিন্তু এই সুদটুকু যেন বজায় থাকে। মীরা, গান গেয়ে ঘুম পাড়াও তো মেয়েকে? নিজে গুন্ গুন্ করে গান গেয়ে সর্বদা ঘুম পাড়াবে বাচ্চাকে। এই সুখটুকু থেকে ওকে বঞ্চিত কোরো না যেন। মনে রাখবে, মা'র গান শিশুদের পক্ষে একাধারে ওষুধ এবং পথ্য।" আমার সঙ্গে তিনি কোনো কথা না বললেও বুঝতে বাকি রইল না কেন কাবুলীর মতো এই সুদের সন্ধানে আসা সেদিন সন্ধ্যায়। আজ সেই সন্ধ্যাটির কথা মনে পড়ছে আর গুন্ গুন্ করছি:

আসে নি ও ভিক্ষা নিতে, না না না—লড়াই করে নেবে জিতে
পরাণটি তোমার ॥…

পুরোনো দিনের কথা যখন স্মরণ করি—কোনো শেষ পাই না। কেমন যেন নেশায় পেয়ে বসে। তার চেয়ে প্রভাতদা--সুধাদি-কে মনের মণিকোঠায় বন্দী ক'রে রাখা যাক্।

এই 'মণিকোঠা' রূপক শব্দটি লিখেই মনে হল, যাঁদের উদ্দেশে লিখলাম তাঁরা হয়তো কৌতুকহাস্যে ফেটে পড়বেন। প্রভাতদাদের জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য—তাঁরা চিরদিন (অন্তত আমরা তাঁদের যতদিন জানি) কুটিরবাসী; মাথার উপর পাকা ছাদ কখনও বরদাস্ত করেন নি। যথাসাধ্য চেষ্টা

করেছেন 'ধরণীর অতি কাছাকাছি' থাকতে। যে-'ধ্রুবপদে' বেঁধে নিয়েছিলেন তাঁদের মিলিত জীবনের তার-টিকে আশ্রম-বাসের শুরুতে, পরবর্তী জীবনের বিচিত্র বিক্ষেপের মধ্যেও সাধ্য মতো সেই সহজ সুরটিকে দুর্বল হতে দেন নি। রবীন্দ্র-জীবনী রচনার সুদীর্ঘ পথ আজ অতিক্রান্ত; প্রভাতদা আজ গৌরবের আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত। অনেক বিদ্রূপ, অনেক ব্যঙ্গ কাজটির আরম্ভে রচনাকারকে সহ্য করতে হয়েছে। শুধু গভীর গবেষণার দুর্গমতাই নয়, কর্মক্ষেত্রের এবং সহযাত্রীদের গড়া বাধার পর বাধাও প্রভাতদাকে লঙ্ঘন করতে হয়েছে অনবরত। সে সব খবর ব্যক্তিগতভাবে জানার সুযোগ হয়েছে তাঁর কাছাকাছি অনেকদিন ছিলাম বলে। বিশ্বভারতীর সুবৃহৎ গ্রন্থাগারের জটিল কাজের বোঝা কাঁধে চাপানো অবস্থাতেই তিনি তাঁর রচনার কাজ করে যেতেন। আশপাশের হট্টগোল বা কোনো বাধা-বিঘ্নে টলবার মানুষ ছিলেন না তিনি—কলম চলতো সাবলীল গতিতে। ছোটোখাটো ভাষার ত্রুটি গ্রাহ্য করতেন না তিনি। আমি নিজে যখন রবীন্দ্রনাথের 'জীবনস্মৃতি' সম্পাদনার কাজে ব্যাপৃত ছিলাম, তখন প্রভাতদার নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও মানসিক স্থৈর্য আমাকে সর্বদা প্রেরণা যুগিয়েছে। তাঁর কাছে সর্বদা উৎসাহ ও সহযোগিতা পেয়েছি। আমাদের পরস্পরের মধ্যে তথ্যের ও অন্যান্য নানাপ্রকারের আদান-প্রদান চলতো। মুগ্ধ হতাম প্রভাতদার ঔদার্যে এবং বিচারের সূক্ষ্ম নৈপুণ্যে। রবীন্দ্রজীবন ও রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের মতো যে সুবৃহৎ সেতুবন্ধ তিনি নির্মাণ করেছেন, আমাদের মতো কাঠবেড়ালিরাও যে তাতে যৎসামান্য সাহায্য করার সুযোগ পেয়েছিলাম তাতেই আমরা আজ নিজেদের ধন্য মনে করি। তাঁর জীবন-সায়াহ্নে একজন স্নেহভাজন ও রবিতীর্থের

রাহী হিসাবে আজ আমি সর্বান্তঃকরণে গুঞ্জন করছি :

সকল গর্ব দূর করি দিব,
তোমার গর্ব ছাড়িব না।

এই গর্বের আরও একটি ব্যক্তিগত কারণ আছে। রবীন্দ্র-পুত্র রথীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ জীবনে আমাদের কাছে প্রায়ই বলতেন—"প্রভাতের *loyalty to the ideal of Visva-Bharati and my father was unimpeachable*—নন্‌কো-অপারেশনের টান, ব্রাহ্মসমাজের টান, পণ্ডিচেরীর টান—আরও কত সব টানা-পোড়েন গেছে আশ্রমের বুকের ওপর দিয়ে, ওকে কিন্তু কেউ টলাতে পারে নি ; এ ব্যাপারে তাঁকে *almost fanatic* বলা যায়।"

আধুনিক কালে 'আইডিয়াল' (*ideal*) শব্দ তো পরি-হসনীয়—এ যুগ 'আইডিওলজি' (*ideology*)-র যুগ। প্রভাতদা সম্পর্কে রথীন্দ্রনাথের শেষ বয়সের এই মন্তব্যের কি কোনো মূল্য আজ আছে ? জানি না।

প্রভাতকুমারের মননপ্রকৃতি ও তাঁর সাহিত্যকৃতি

প্রবোধচন্দ্র সেন

সুদীর্ঘ কালের পরিচিত ও ঘনিষ্ঠ বন্ধুজনের পরিচয় দেওয়া দূরে থাক, তাঁর যথার্থ পরিচয় পাওয়াই সহজসাধ্য নয়। অতিনৈকট্য সত্যদৃষ্টির অন্তরায়। নিরপেক্ষ দৃষ্টির পক্ষে কিছু-না-কিছু ব্যবধান বা দূরত্ব থাকা অত্যাবশ্যক। প্রভাতকুমারের সঙ্গে আমার বয়সের ব্যবধান বেশি নয়, প্রায় পাঁচ বৎসর মাত্র। তাঁর জন্ম ১৮৯২ সালের ২৭ জুলাই, আর আমার জন্ম ১৮৯৭ সালের ২৭ এপ্রিল। সুতরাং তাঁর সঙ্গে আমার কালগত ব্যবধান অতি সামান্যই। অপরিচয়ের ব্যবধানও প্রায় নেই বললেই হয়। সে পরিচয়ের পরিধিও অন্তত: পঞ্চান্ন বৎসর। তা ছাড়া তাঁর ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে এসেছি প্রায় চল্লিশ বৎসর যাবৎ। এই অতিসান্নিধ্য মানুষের সামগ্রিক সত্যরূপটিকেই আচ্ছন্ন করে রাখে, প্রকট করে তোলে শুধু পরস্পরের চরিত্রগত তুচ্ছ ও ক্ষণিক উপসর্গগুলিকে, চারিত্র বৈশিষ্ট্যের মূল ধাতুটাই থেকে যায় নেপথ্যে।

কিন্তু কালগত বা পরিচয়গত অব্যবধানের একটা সুবিধাও আছে। এই অব্যবধান বুদ্ধির দৃষ্টিকে ব্যাহত করে রাখে বটে, কিন্তু তাতেই হৃদয়ের অনুভূতি প্রখর হয়ে উঠে দৃষ্টিরোধের ক্ষতিপূরণ করে নেয়। অন্ধ যেমন শুধু স্পর্শের যোগেই বস্তুর রূপ অর্থাৎ তার আকৃতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নেয়, অথচ তার রঙ সম্বন্ধে অজ্ঞই থেকে যায়, আমিও তেমনি শুধু অনুভূতির যোগেই প্রভাতকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা করে নিয়েছি, কিন্তু সে বৈশিষ্ট্যের বর্ণগত বৈচিত্র্য ও উজ্জ্বলতা আমার কাছে অলভ্য হয়ে রয়েছে। প্রভাতকুমার

যে কালের লোক, বলতে গেলে আমিও সে কালেরই লোক। বিশেষ যুগের বিশেষ শিক্ষাদীক্ষা আবেগ-অনুভূতি তাঁর নাড়ীতে যে স্পন্দন জাগিয়ে তুলেছে, আমার নাড়ীতেও সে স্পন্দনই নিত্যসক্রিয়। তা ছাড়া তাঁর সান্নিধ্যে আসার ও তাঁর বিভিন্ন ধরনের রচনা পাঠের ফলে তাঁর এই নাড়ীস্পন্দনের প্রতিস্পন্দনও অনুভব করেছি আমার মধ্যে। এই অধিকারবলেই প্রভাত-কুমারের মননপ্রকৃতির একটি বিশেষ দিকের একটু সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে সাহসী হয়েছি।

রবীন্দ্রজীবনীকার বলেই প্রভাতকুমারের প্রধান পরিচয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনাই যে তাঁর শ্রেষ্ঠ কীর্তি, তাতে সন্দেহ নেই। খুঁটিয়ে বিচার করলে এই মহাগ্রন্থখানির নানা স্থানেই বহু খুঁত আবিষ্কার করা হয়তো অসম্ভব হবে না। এভাবে বিচার করলে বৃহৎ বনস্পতি বা উত্তুঙ্গ মহীধরের গঠনসৌষম্যে ছোটখাটো অনেক ত্রুটি ধরা যায়। কিন্তু এদের সামগ্রিক মহিমা কে অস্বীকার করবে? প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী'র সমুচ্চ শিখরও তেমনি বর্তমানের খুঁত-ধরা সমালোচনার দৃষ্টি অতিক্রম করে ভবিষ্যতের মহাকাশে আপন মহিমা বিস্তার করছে। সুদূর ভাবী কালে এই গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা যে কখনও ফুরিয়ে যাবে, তা আজ অনুমানও করা যায় না। বরং বর্তমানের অতি-পরিচয়ের সীমা ছাড়িয়ে ভাবী কালে রবীন্দ্রনাথের মহাব্যক্তিত্বের সত্য রূপ যতই স্পষ্ট হয়ে উঠবে, প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রয়োজনীয়তাও ততই বাড়তে থাকবে এবং তাঁর এই কীর্তির গুরুত্বও ততই স্বীকৃতি লাভ করতে থাকবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। রবীন্দ্রনাথের তিরোধানের পরে গত উনচল্লিশ বৎসরে এই গ্রন্থখানি যে উত্তরোত্তর অধিকতর আদৃত হচ্ছে, তাতেও উক্ত অনুমানের সত্যতা সপ্রমাণ হয়।

প্রভাতকুমারের মননপ্রকৃতি ও তাঁর সাহিত্যকৃতি

কারও কারও মনে হতে পারে প্রভাতকুমারের খ্যাতি রবীন্দ্রখ্যাতিরই একটা উপসামগ্রী মাত্র। অর্থাৎ—

রাজেন্দ্রসঙ্গমে
দীন যথা যায় দূর তীর্থদরশনে,

প্রভাতকুমার তেমনি করেই রবীন্দ্রসঙ্গমের ফলে 'যশের মন্দিরে' প্রবেশের সুযোগ পেয়েছেন। কিন্তু 'রবীন্দ্রজীবনী' গ্রন্থখানি একটু নিবিষ্টভাবে অনুধাবন করলেই বোঝা যাবে, এই আপাত--প্রতীয়মান সত্য স্বীকৃতিযোগ্য নয়। অর্থাৎ প্রভাতকুমারের খ্যাতি রবীন্দ্রখ্যাতির প্রতিফলন মাত্র নয়, এই গ্রন্থের সর্বত্র তাঁর স্বকীয়তা সুস্পষ্ট। রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিত্ব ও কীর্তিকে নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখার, বিচার করার ও ব্যাখ্যা করার মানসিক প্রস্তুতি ও যোগ্যতা তাঁর ছিল।

রবীন্দ্রনাথকে বোঝবার অর্থাৎ তাঁর জীবন ও কর্মের পরিচয় পাবার সার্থকতা আছে। কিন্তু সে জীবন ও কর্মের যিনি ব্যাখ্যাতা তাঁকেও বোঝা আবশ্যক। ব্যাখ্যাতার স্বরূপ অবগত না হলে ব্যাখ্যাত বিষয়ের স্বরূপ উপলব্ধিও সম্ভব নয়। যে চোখ দিয়ে জগৎকে দেখেছি, সে চোখের যথার্থ প্রকৃতি ও শক্তিসীমা জানা না থাকলে জগৎ-দেখাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়, এবং তার স্বরূপ-উপলব্ধিও সম্ভব হয় না। আমাদের জ্ঞানমাত্রই আপেক্ষিক। বিকলেন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানও বিকৃত হতে বাধ্য।

এ কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, বাংলা দেশ আজ প্রভাতকুমারের চোখ দিয়েই আজ রবীন্দ্রনাথকে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছে। তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী'র সহায়তা না নিয়ে আপন চোখে রবীন্দ্রনাথকে সমগ্রভাবে দেখতে সমর্থ, এমন লোক প্রায় নেই বললেই হয়। সুতরাং প্রভাতকুমার যে চোখ নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখেছিলেন, তা জানা বিশেষ প্রয়োজন।

প্রভাতকুমারের মননপ্রকৃতি ও তাঁর সাহিত্যকৃতি

আধুনিক কালে বাঙালি জাতির মানসিক পুনরুজ্জীবন ঘটে বলতে গেলে ওয়ারেন হেস্টিংসের আমলে সার উইলিয়ম জোন্‌স্ কর্তৃক 'এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল' প্রতিষ্ঠার সময় (১৭৮৪) থেকে। তখনই প্রথম প্রজ্বলিত হল ভারতসংস্কৃতির আলোক-শিখা এই নিদ্রামগ্ন বাংলাদেশের গৃহপ্রাঙ্গণেই। এই আলোক-বর্তিকা ছিল পাশ্চাত্ত্য মনীষীদের হাতে। বাঙালি জাতির তখনও ঘুম ভাঙে নি। প্রথম চোখ মেললেন রাজা রামমোহন রায়। জাগরণের আহ্বানও প্রথম ধ্বনিত হল তাঁরই কণ্ঠে। এই আহ্বান প্রথম শোনা গেল তাঁর 'বেদান্ত গ্রন্থে' (১৮১৫)। সে সময় থেকে রবীন্দ্রনাথের তিরোধান (১৯৪১) পর্যন্ত সওয়া শো বৎসর কালকে বলা যায় বাংলার জাতীয় জীবনে সাংস্কৃতিক উদ্‌বোধন ও অভ্যুদয়ের যুগ। তার মধ্যে মোটামুটি ১৮৭৫ থেকে ১৯২৫ পর্যন্ত অর্ধশতাব্দী কালকে বলতে পারি বাংলার মনঃপ্রকৃতি ও সংস্কৃতির পূর্ণবিকাশের যুগ। এই পূর্ণবিকাশের যুগেই প্রভাত-কুমারের আবির্ভাব। শুধু তাই নয়, তৎকালীন বঙ্গসংস্কৃতির কেন্দ্রবিন্দু থেকেও তিনি দূরবর্তী ছিলেন না। তখন বাংলাদেশে যাঁরা সংস্কৃতির বাহক ও পোষক ছিলেন তাঁদের অনেকেরই অব্যবহিত সান্নিধ্যে আসার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। যাঁদের সঙ্গে অব্যবহিত যোগ ছিল না, তাঁদেরও অনেকেরই প্রভাব-মণ্ডলের মধ্যেই তিনি ছিলেন। কিন্তু শুধু যুগ ও পরিবেশের প্রভাবেই মানুষ তৈরী হয় না, যদি তার মধ্যে ওই প্রভাবকে আত্মসাৎ করবার শক্তি নিহিত না থাকে। প্রভাতকুমারের সে শক্তি ছিল পূর্ণ মাত্রাতেই। তাই অনুকূল পরিবেশ ও যুগ--প্রভাবকে এমন করে আকর্ষণ করে নিতে পেরেছিলেন। কাল-গতই হক আর পরিবেশগতই হক. কোনো বাহনপ্রভাবই কোনো ব্যক্তি বা জাতির মধ্যে মেধা বা প্রতিভা সঞ্চারিত করতে পারে

না, অন্তর্নিহিত মেধা ও প্রতিভার স্ফুরণ ঘটাতে পারে মাত্র। প্রভাতকুমারের বেলাতেও তাই ঘটেছে।

এখন দেখা যাক প্রভাতকুমারের স্বকীয় প্রতিভার স্বরূপ কি, যা বিকশিত ও ফলবান্ হয়ে তাঁর সুপ্রচুর রচনাবলীরূপে প্রকাশ পেয়েছে। তাঁর শিক্ষালাভের ও গ্রহণ করবার বয়সে অর্থাৎ উনবিংশ শতকের শেষ দশক ও বিংশ শতকের প্রথম দশকে বাংলাদেশ বিচিত্র চিন্তায়, আবেগে ও কর্মপ্রচেষ্টায় আন্দোলিত হচ্ছিল। তার প্রত্যেকটির ঢেউ তিনি বুক ভরে গ্রহণ করেছিলেন, তার মূলগত তাৎপর্য উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু কিছুতেই গা এলিয়ে দেন নি, ভেসেও যান নি। স্বাধীন বিচারবুদ্ধির বিবিক্ততাই ছিল তাঁর রক্ষাকবচ। এই বিচার-বুদ্ধির ফলেই তিনি আপন চারিত্রিক প্রবণতা অনুযায়ী কর্ম-সাধনার পথ বেছে নিতে পেরেছিলেন। তখন বাংলাদেশে কাব্য, নাট্য, সংগীত, চিত্র প্রভৃতি সর্ববিধ কলাবিদ্যার চর্চাই চলছিল পূর্ণ মাত্রায়। তিনি গেলেন না সে পথে। তখন সমাজ-সেবা, জনকল্যাণসাধন, ধর্মদীপনা, রাষ্ট্রপ্রচেষ্টা প্রভৃতিও বাংলা দেশকে মথিত করছিল। এসব পথেও তিনি গেলেন না। তিনি নির্বাচন করলেন জ্ঞানচর্চার পথ। জ্ঞানচর্চার পথও বহুধাবিভক্ত। ইতিহাস, দর্শন, বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের সব বিভাগেই বাঙালি তখন দৃঢ় প্রত্যয় নিয়ে এগিয়ে চলেছিল। প্রভাতকুমার বেছে নিলেন ইতিহাসের পথ, বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস। কিন্তু জ্ঞানের অন্যান্য বিভাগের প্রতিও তিনি অনবহিত ছিলেন না। বস্তুতঃ তাঁর ইতিহাসবুদ্ধিই তাঁকে জ্ঞান-চর্চার প্রায় সব বিভাগের দিকে চালিত করেছিল। ইতিহাস-বোধের অভাবে জ্ঞানজাত কোনো তথ্যেরই আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় সম্ভব হয় না। প্রভাতকুমারের রচনার পরিমাণ ও বৈচিত্র্য

কম নয়। একটু মন দিয়ে বিচার করলে দেখা যাবে, সব ক্ষেত্রেই তিনি ইতিহাসের দৃষ্টি নিয়ে সমস্ত তথ্যের গুণাগুণের যাচাই করেছেন। এই ঐতিহাসিক দৃষ্টির সঙ্গে মিলেছিল বিজ্ঞানসুলভ যুক্তিনিষ্ঠতা। এই যুক্তিনিষ্ঠার অভাবেও জাগতিক কোনো বিষয়েরই সত্যজ্ঞান লাভ করা যায় না। ঐতিহাসিক দৃষ্টি ও যুক্তিনিষ্ঠা, এই দুটি হল আধুনিক পাশ্চাত্ত্য জগতের তথা নবোদ্‌বুদ্ধ বাংলাদেশের জ্ঞানবিকাশের দুটি মূল নীতি। প্রভাত-কুমারের মনোজীবনের এই দুটি মূলধনই তাঁর সমস্ত রচনাকে সমৃদ্ধ করেছে, তাঁকে সত্যের ঋজুপথে দৃঢ়পদক্ষেপে অগ্রসর হতে সহায়তা করেছে।

তৎকালীন বাঙালির সাংস্কৃতিক প্রবণতার আর-একটি বিশিষ্ট লক্ষণ হল দার্শনিকতা অর্থাৎ তত্ত্ববিচারপরায়ণতা। এই মনোভঙ্গিও প্রভাতকুমারের অপরিচিত ছিল না। তাঁর শ্বশুর শ্রদ্ধেয় সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় ছিলেন একজন ধর্ম ও তত্ত্ব-জ্ঞানপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ দার্শনিক পণ্ডিত। তাঁর সম্পাদিত উপ-নিষদ্‌গুলি ও অন্যান্য রচনা দার্শনিক মহলে খুবই সমাদর লাভ করেছিল। একসময়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসার প্রেরণায় আমি তাঁর কাছে নিয়মিত যাতায়াত করতাম। তাঁর সহৃদয় ব্যবহার ও সস্নেহ উপদেশ পেয়ে আমি মুগ্ধ হয়েছি। তখন তাঁর সম্বন্ধে আমার হৃদয়ে যে শ্রদ্ধা সঞ্জাত হয়েছিল, আজও তা সমভাবে অম্লান আছে। এই যাতায়াতের সূত্রেও মাঝে মাঝে প্রভাতকুমারের সঙ্গে আমার দেখা হত। যা হক, তত্ত্বদৃষ্টির সঙ্গে যথেষ্ট পরিমাণে পরিচিত থাকলেও প্রভাতকুমার তাঁর লেখায় তত্ত্বালোচনার দিকটা সযত্নে পরিহার করে চলেছেন। সহজাত ঋজু বুদ্ধির বশে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, তত্ত্ববিচারের প্রভাবে বাস্তব জগতের ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক (অর্থাৎ মানবিক) সত্য অনেক সময়ই

তুচ্ছতাপ্রাপ্ত বা আচ্ছন্ন হয়ে যায়। মানবজগতের আপেক্ষিক সত্য নিয়েই তাঁর কারবার। তাই তিনি তত্ত্ববিচারের পথে অগ্রসর হন নি।

তৎকালীন বঙ্গসংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগই তাঁকে টেনে এনেছিল শান্তিনিকেতনে রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যে। এখানে এসে তিনি পেলেন জ্ঞানচর্চার অবারিত সুযোগ—এক দিকে গ্রন্থাগার পরিচালনা ও অন্য দিকে ইতিহাস অধ্যাপনা। রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে শান্তিনিকেতন গ্রন্থাগার বিচিত্র জ্ঞানসম্ভারে উত্তরোত্তর সমৃদ্ধ হয়ে উঠল। প্রভাতকুমারের সম্মুখে উন্মুক্ত হল বিশ্ব-জ্ঞানের মহাসৌধ। তার কক্ষে কক্ষে বিচরণে তাঁর ক্লান্তি ছিল না। অপর দিকে ইতিহাসের মহাসৌধও ক্ষুধিত পাষাণের মতোই অনিবার্য শক্তিতে তাঁকে আকর্ষণ করেছে, তাঁকে ঘুরিয়েছে তার বহুরত্নমণ্ডিত অসংখ্য কক্ষে—বিশ্বের সমস্ত দেশ এবং আদিকাল থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত সমস্ত যুগের ইতিহাসই তাঁকে মুগ্ধ করেছে। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিশ্বযাত্রী নন, কিন্তু বোধ করি এমন দেশ নেই যেখানে তাঁর মানসভ্রমণ বাধাপ্রাপ্ত হয়েছে। শুধু তাই নয়, ইতিহাসের সব যুগেই তাঁর গতি অবারিত। একসময় বিশ্বভারতীতে যখন বহু ভারততত্ত্বজ্ঞ পাশ্চাত্ত্য মনীষীর আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি তখন তাঁদের কাছে পাঠ নিয়ে প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিচর্চায় নিরত হয়েছিলেন। যাদবপুর বিশ্ব-বিদ্যালয়ে প্রদত্ত তাঁর প্রাচীন ভারতসংস্কৃতিবিষয়ক বক্তৃতামালার কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এ বিষয়ে তাঁর অনেক গবেষণানিবন্ধ (প্রধানতঃ ইংরেজি) তখন প্রকাশিত হয়েছিল। দুঃখের বিষয় প্রভাতকুমারের জ্ঞানচর্চার তথা মানস প্রস্তুতির এই দিকটা আজকাল অনেকেই জানেন না।

প্রভাতকুমারের মানস প্রকৃতি তথা জ্ঞানচর্চার যে সংক্ষিপ্ত

পরিচয় দেওয়া গেল, তার ফলাফলের কথাও একটু বলা দরকার। কেননা, তরুজগতের স্থায় মানস জগতেও সব কিছুই ফলেন পরিচীয়তে। প্রভাতকুমারের জ্ঞানসাধনার ফল হিসাবে তাঁর রচিত কয়েকটি গ্রন্থের নাম করাই আমাদের পক্ষে যথেষ্ট। ইতিহাসের দপ্তর (পুরাণো ভারত), প্রাচীন ইতিহাসের গল্প, পৃথিবীর ইতিহাস, ভারতে জাতীয় আন্দোলন—এসব বইএর নাম থেকেই বোঝা যায় দেশ-বিদেশের ইতিহাসের কত বিভিন্ন দিকে তিনি তাঁর জ্ঞানচর্চার নিদর্শন রেখেছেন। 'বঙ্গ পরিচয়' ও 'ভারতপরিচয়' বই-দুটিতে আছে স্বদেশ ও স্বজাতিকে ঘনিষ্ঠভাবে জানবার আগ্রহ তাঁর কত গভীর তার প্রমাণ। 'জ্ঞানভারতী' বা 'নব জ্ঞান-ভারতী' তাঁর বিচিত্র বিদ্যাচর্চার নিদর্শন। গ্রন্থাগারিকের কাজটিকেও যে তিনি নেহাত জীবিকার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেন নি, এ ক্ষেত্রেও যে তাঁর নিত্যসক্রিয় মন সৃষ্টির কাজ থেকে বিরত থাকে নি তার প্রমাণ তাঁর 'বাংলা-গ্রন্থ বর্গীকরণ' বইটি।

বলা বাহুল্য, প্রভাতকুমারের বৃহত্তম কীর্তি ও তাঁর অর্ধ-শতাব্দীর সাধনার শ্রেষ্ঠ ফল তাঁর মহাগ্রন্থ 'রবীন্দ্রজীবনী'। রবীন্দ্রনাথের মহাব্যক্তিত্বের উপযোগী মহাজীবনচরিতই বটে। এই মহাসাধনার আগে ও পরে একটি উদ্‌যোগপর্ব ও একটি উত্তরপর্বও আছে, এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন। উদ্‌যোগপর্বের পরিচায়ক হিসাবে প্রভাতকুমারের 'রবীন্দ্র-বর্ষপঞ্জী' ও 'রবীন্দ্র-গ্রন্থপঞ্জী' এই দুখানি ছোট বইএর নাম করতে পারি। এগুলিকে বলতে পারি বৃহৎ 'রবীন্দ্রজীবনী'র প্রাথমিক খসড়া বা নকশা। রবীন্দ্রচর্চার সেই আদিযুগে এরকম নকশা তৈরি করা যে কতখানি নিষ্ঠা ও শ্রম-সাধ্য তা বর্তমান সময়ে অনুমান করাও কঠিন। এই নকশাকে অবলম্বন করেই পরবর্তী 'রবীন্দ্রজীবনী' প্রকাশিত

হল অনতিবৃহৎ তুই খণ্ডে। তার পরে তিন দশকের বেশি সময় অতিক্রান্ত হয়েছে। এই সময়ের মধ্যে বইখানি তিন-চার সংস্করণে ক্রমশঃ সংশোধিত, পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে সুবৃহৎ চার খণ্ডে গ্রথিত একটি অবিস্মরণীয় মহাগ্রন্থে পরিণত হয়েছে। তার যথার্থ মূল্য নির্ণয়ের ক্ষমতা বর্তমান লেখকের বা অন্য অনেকেরই নেই। সে মূল্য নির্ণীত হবে ভাবী কালে। এই মহাসাধনার উত্তরপর্বে এই গ্রন্থেরই পরিশিষ্ট রূপে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনকথা', 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ', 'শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী', 'গীতবিতান : কালানুক্রমিক সূচী' ইত্যাদি। এগুলির গুরুত্ব উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু সে আলোচনার স্থান এটা নয়।

রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র জীবনকাহিনী ও কর্মকীর্তির বিবরণ, তাঁর বহুমুখীন ব্যক্তিত্বের পরিচয় দান এবং তাঁর শিল্প ও মনন--কর্মের তাৎপর্য ব্যাখ্যান, এই ত্রিবিধ সুকঠিন কাজে সিদ্ধিলাভের কতখানি যোগ্যতা তিনি অর্জন করেছিলেন, সে সম্বন্ধেও কিছু বলা প্রয়োজন। তাঁর শিক্ষা ও মননসাধনার যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় পূর্বে দেওয়া হয়েছে তার থেকেই এ সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যেতে পারে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতিই যে রবীন্দ্রনাথের মানস-সত্তার মৌল উপাদান, এ কথা আজ সুবিদিত। তিনি নিজেকে পরিচয় দিয়েছেন 'ভারতপথিক' বলে এবং বলেছেন 'মহা-ভারতের' সীমানা তিনি কখনও ছাড়িয়ে যান নি। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির সনিষ্ঠ চর্চা যে প্রভাতকুমারকে রবীন্দ্রসত্তার মৌল উপাদানটির তাৎপর্য উপলব্ধিতে সহায়তা করেছে তাতে সন্দেহ নেই। শুধু প্রাচীন ভারত নয়, আধুনিক ভারতের জীবনপ্রবাহ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ সমভাবে উৎসুক ছিলেন এবং নানাভাবে (অথচ আপন প্রণালীতে) তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

প্রভাতকুমার যে এদিকেও সচেতন ছিলেন তার অন্যতম প্রমাণ তাঁর 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' গ্রন্থখানি। এইজন্যই তিনি রবীন্দ্রনাথকে আধুনিক ভারতের ঐতিহাসিক পটভূমিকায় যথা-স্থানে যথাযথরূপে স্থাপন করতে সমর্থ হয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের মতো তিনি বিশ্বযাত্রী ছিলেন না, তাঁর মতো বিশ্বজীবনের সঙ্গেও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন না। কিন্তু তাঁর ইতিহাসক্ষুধা ও জ্ঞান-তৃষ্ণা তাঁকে বিশ্বগ্রাসী করে তুলেছিল এবং তাঁর মানসভ্রমণ জগতের কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হয় নি, এ কথাও আগেই বলেছি। বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারই ছিল তাঁর এই বিশ্বভ্রমণের মানসযান। ফলে রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী না হলেও তাঁর বিশ্বভ্রমণের তাৎপর্য উপলব্ধি নেপথ্যচারী প্রভাতকুমারের পক্ষে কঠিন হয় নি। চিন্তার রাজ্যে দেখি ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক এই ত্রিবিধ মনোভঙ্গি (কাব্যিক মনোভঙ্গি এ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়) নিয়েই রবীন্দ্রনাথ সমাজ, শিক্ষা, ধর্ম, রাষ্ট্র প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ের বিচার-বিশ্লেষণ ও মূল্যনিরূপণ করেছেন। প্রভাতকুমারও এই ত্রিবিধ দৃষ্টিকেই আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন। তাই এ ক্ষেত্রেও তিনি অনায়াসেই রবীন্দ্র-চিন্তাধারার সামগ্রিক রূপটিকে অধিগত করতে পেরেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ও প্রভাতকুমারের আবির্ভাবকালের ব্যবধান কিঞ্চিদধিক ত্রিশ বৎসর। এই ব্যবধানটুকুও প্রভাতকুমারের সত্য-দৃষ্টির সহায়ক হয়েছে। কেননা, যে যুগের এক প্রান্তে রবীন্দ্র-নাথের আবির্ভাব, তারই প্রায় অপর প্রান্তে প্রভাতকুমারের জন্ম। ফলে যে যুগপ্রভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভা সংগঠিত ও বিকশিত হয়েছিল, সে প্রভাব তাঁর জীবনেও যথেষ্ট ক্রিয়া করতে পেরেছিল। অর্থাৎ কালগত অতিব্যবধান না থাকায় তিনি রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রাণস্পন্দন নিজের মধ্যে অনুভব করার সুযোগ পেয়েছিলেন।

পক্ষান্তরে কালগত অতিনৈকট্যের অভাবে তিনি রবীন্দ্রনাথ থেকে যথেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে তাঁর জীবনলীলা পর্যবেক্ষণ করবার সুযোগও পেয়েছিলেন। রবীন্দ্রজীবনের শেষ ত্রিশ বৎসর তিনি রবীন্দ্র-নাথের অতিসান্নিধ্যেই কাটিয়েছেন বটে, কিন্তু তিনি তার মধ্যেই এমন একটি মানসিক ব্যবধান রচনা করে নিয়েছিলেন যাতে তাঁর দৃষ্টি আচ্ছন্ন হতে পারে নি। সৌরমণ্ডলের মধ্যে থেকেও তিনি সৌরপ্রভাবে অভিভূত হন নি। তাই তিনি এমন স্বাধীন ও নিরপেক্ষ ভাবে রবীন্দ্রপ্রতিভার বিশ্লেষণ ও তাঁর কার্যকলাপের বিচার করতে পেরেছেন।

রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত রচনার পক্ষে এমন বহুমুখী যোগ্যতা আর কার ছিল, আর কার জীবনে এ কাজের জন্য এমন নিরলস সাধনা ও প্রস্তুতি দেখা গিয়েছে ? এ ক্ষেত্রে তিনি একক, অনন্য-সাধারণ। ভবিষ্যতে হয়তো আরও বড় বড় পণ্ডিত আবির্ভূত হবেন, তাঁরা হয়তো উৎকৃষ্টতরভাবে রবীন্দ্রনাথের জীবনভাষ্য রচনা করবেন। কিন্তু তাঁরা রবীন্দ্রযুগের তথা রবীন্দ্রপ্রতিভার প্রাণ-স্পন্দনের প্রত্যক্ষ অনুভূতি থেকে বঞ্চিত থাকবেন। ফলে তাঁদের রচিত ভাষ্য অনেকাংশেই প্রাণহীন পাণ্ডিত্যের মহাকীর্তিরূপে স্বীকৃতি লাভ করবে। এই পাণ্ডিত্যে মুগ্ধ হলেও রবীন্দ্রযুগ ও রবীন্দ্রজীবনের এই প্রাণস্পর্শ লাভের আশায় ভাবী কালের পাঠক-সমাজকে প্রভাতকুমারের এই মহাগ্রন্থের আশ্রয় নিতে হবে, রবীন্দ্রযুগ ও জীবনের অলকাপুরীর প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করে তাদের বলতে হবে—

সেথা কে পারিত
লয়ে যেতে, তুমি ছাড়া, করি' অবারিত
'রবীন্দ্র-অলকাপুরী'—অমর ভুবনে !

সর্বশেষে নীরব ও নিরলস জ্ঞানসাধক প্রভাতকুমারের একটি চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। খ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভের অনেক সুযোগ তাঁর ছিল। রবীন্দ্রনাথের সাহচর্যে নানা স্থানে ভ্রমণ, সভাসমিতিতে বক্তৃতা, বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশ, রেডিও-ভাষণ ইত্যাদি নানা উপায়েই তিনি প্রভূত খ্যাতি পেতে পারতেন। কিন্তু সে লোভ তিনি ত্যাগ করেছেন, খ্যাতিলাভের সহজ পথে তিনি চলেন নি। কঠিন সাধনার পথই তিনি বেছে নিলেন। তিনি সারাজীবন তাঁর জ্ঞানসাধনাকে শিথিল করে সুলভ খ্যাতির পেছনে ছোটেন নি বটে, কিন্তু দুর্লভ খ্যাতি আড়ালে থেকে তাঁকে অনুসরণ করে চলেছিল। জীবন-সায়াহ্নে তিনি যখন তাঁর সাধনমার্গের শেষ প্রান্তে উপনীত, তখন সেই দুর্লভ খ্যাতিই তাঁকে প্রকাশ্যে বরণ করে নিল। আমাদের দেশের বিদ্যামহানিকেতনগুলি বারবার তাঁকে উপাধিতে-পুরস্কারে ভূষিত করে তাঁর জ্ঞানসাধনাকে স্বীকৃতি জানিয়েছে। কিন্তু এ গুলিই তাঁর শেষ স্বীকৃতি বা শেষ পুরস্কার নয়। সেই চরম স্বীকৃতি ও চরম পুরস্কার সঞ্চিত হয়ে আছে ভাবী কালের ভাণ্ডারে। যত দিন যাবে ততই তাঁর স্বদেশ ও স্বজাতির কাছে তাঁর এই নীরব মহাসাধনার সমাদর বাড়বে, ততই তাঁর এই মহাকীর্তির পাশে তাঁর এই চরিত্রমহিমাও সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এক শ্রেণীর বিষয়নিষ্ঠ মানুষ সারাজীবনের কঠিন চেষ্টায় প্রচুর ঐশ্বর্যের অধিকারী হন, কিন্তু নিজেরা তার ফল পুরোপুরি ভোগ করে যেতে পারেন না। ভোগ করেন তাঁর উত্তরাধিকারীরা, আর দুই হাত তুলে আশীর্বাদ করেন পূর্বপুরুষকে। প্রভাতকুমারও তাঁর এই মহৎ কর্মের শেষ ফল ভোগ করে যেতে পারবেন না। সে ফল ভোগ করবেন তাঁর উত্তরপুরুষেরা, আর অজস্র আশীর্বাদ বর্ষণ করবেন তাঁর স্মৃতির প্রতি। মানুষের জীবনের নিয়তিই এই—তার সারা-

জীবনের সাধনায় উৎপন্ন সোনার ফসল তাকে তুলে দিতে হয় যে সোনার তরীতে, সে তরী কালস্রোতে ভেসে চলে যায় নিরুদ্দেশের পথে। সে তরীতে তার নিজেরই ঠাঁই হয় না।

কালিদাস বলেছেন, গ্রীষ্মকালে সারাদিনের দুঃসহ দাবদাহের পরে সন্ধ্যাবেলাটা হয় রমণীয়— 'দিবসাঃ পরিণামরমণীয়াঃ।' প্রভাতকুমারের সারাজীবনব্যাপী কঠিন তপশ্চর্যার পর তাঁর এই সায়াহ্নকালটাও রমণীয় হোক, এই কামনা করি।

শিক্ষক প্রভাতকুমার

কালীপদ রায়

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও আমার শৈশবের গুরু শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে অনেক স্মৃতি আজও উজ্জ্বল হয়ে আছে। এই স্মৃতিকথায় সেই সব পুরানো দিনের কথাই বলবো—যে কথা বার বার মনে পড়ে।

১৯১০ সালের ২৭শে জুন মাত্র আট বছর বয়সে আমি শান্তিনিকেতনে এসেছিলাম পিতা স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায়ের সঙ্গে। পিতা তখন প্রৌঢ়—এসেছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাগ্রহ আহ্বানে ম্যাট্রিক ও *Preparatory* ক্লাসে ইংরেজি ও ইতিহাস পড়াবার জন্য; আর আমি এসেছিলাম ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র হয়ে।

শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের পনের থেকে আঠার বছর বয়সের যে চারজন তরুণ শিক্ষকের কাছে আমার পঠন-পাঠন শুরু হয়েছিল তাঁরা হচ্ছেন প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়, তেজেশচন্দ্র সেন, নারায়ণ কাশীনাথ দেবল ও সন্তোষ মিত্র। সুধীরঞ্জনদার কাছে শুনেছিলাম যে, প্রভাতবাবু ও তেজেশদা যখন প্রথম আশ্রমে এসেছিলেন তখন তাঁরা ছাত্র হয়ে এসেছিলেন না শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন ঠিক বোঝা যেত না। তবে গুরুদেব বলতেন যে, তাঁর আশ্রম-বিদ্যালয়ে ছাত্র-মাস্টার সকলেই বিদ্যার্থী—শিক্ষকদেরও অনেক কিছু জানবার আছে। এ কথা তিনি প্রভাতবাবুকে উদ্দেশ্য করেই বলেছিলেন বলে মনে হয়। প্রভাতবাবুকে লাইব্রেরিতে বসে বিভিন্ন সময়ে নানা বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করতে দেখেছি। এই লাইব্রেরির কর্ণধার ছিলেন প্রভাতবাবু নিজেই—

আশ্রম-বিদ্যালয়ের ক্ষুদ্র লাইব্রেরিটির সার্বিক উন্নয়নে তাঁর প্রয়াস আমাদের মুগ্ধ ও বিস্মিত করেছিল।

সব বিষয়েই প্রভাতবাবুর গভীর অনুসন্ধিৎসা ও নিষ্ঠা ছিল। মাঝে তাঁকে একবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা দেবার জন্য তৎপর হতে দেখেছিলাম। তখন তাঁকে ক্রমান্বয়ে অনুবাদ চর্চা করতে দেখেছি, দেখেছি ইংরেজি রচনা লিখতে। এ ছাড়া বিভিন্ন সময়ে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর কাছে সংস্কৃত, পালি ও প্রাকৃত ভাষার পাঠ নিতেও দেখেছি। কিছুদিন তিনি চীনা ভাষাও শিখেছিলেন। গুরুদেবের পাঠ-চক্র থেকে তিনি কোনদিন দূরে থাকেন নি। এমনি করে নিজের অসাধারণ অধ্যবসায় ও উৎসাহেই তিনি পরবর্তীকালে হয়ে উঠেছেন একজন একনিষ্ঠ জ্ঞানতপস্বী। আমরা তাঁকে বলতাম *'Living Encyclopaedia'*।

ব্রহ্মাচর্যাশ্রমের এই তরুণ শিক্ষকটি 'প্রকুমু' নামেই আমাদের কাছে পরিচিত ছিলেন। তিনি যে-যে বিষয় পড়াতেন, রুটিনে সেই বিষয়গুলির তলায় এই সংক্ষিপ্ত নামটিই লেখা থাকত। তাঁর পড়াবার বিবিধ পদ্ধতির মধ্যে যে বৈশিষ্ট্য ছিল তা আমাদের বিশেষভাবে অভিভূত করেছিল।

ইতিহাস ও ভূগোল পড়াবার সময় তিনি ছেলেদের বিভিন্ন পথ অবলম্বনে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। সেটা তাঁর কাছে যাঁরা না পড়েছেন তাঁরা ঠিক ঠিক উপলব্ধি করতে পারবেন না। লাইব্রেরি থেকে খুব ভাল করে পড়াশুনো না করে তিনি কখনই ক্লাসে যেতেন না। একটু আগেই বলেছি, তাঁর শিক্ষাদানের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রভাতবাবু নিজের হৃদয়-বিগলিত বাণীর দ্বারা ছেলেদের শিক্ষা দিতেন এবং সত্য-ধর্মে অনুপ্রাণিত করতেন। আমাদের কাছে তিনি ছিলেন একজন আদর্শ শিক্ষক।

আমি যখন প্রথম শান্তিনিকেতনে আসি, তখন আশ্রম-বিদ্যালয়ের 'সর্বাধ্যক্ষ' ছিলেন আচার্য ক্ষিতিমোহন সেন। যেদিন এসেছিলাম তার পরদিনই সকালবেলায় ক্ষিতিমোহনবাবু স্লিপ লিখে একটি ছেলের সঙ্গে আমাকে প্রভাতবাবুর ইংরেজি ক্লাসে পাঠিয়ে দেন। ক্লাসে গিয়ে পলকহীন চোখে প্রভাতবাবুর দিকে তাকিয়ে রইলাম। এমন সুপুরুষ আমি এর আগে (রামানন্দবাবুর বড় ছেলে বুবাদাকে ছাড়া) আর কাউকে দেখেছি বলে মনে হয় না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণ। চিকণ সরু উন্নত নাক। মাথা-ভরা বড় বড় চুল কুঁকড়ে এসে পেছনে এবং কানের উপর দিয়ে ঝুলে পড়েছে। সুন্দর করে ছাঁটা দাড়ি। অনেকটা গুরুদেবের ভাইপো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মত চেহারা। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা মনে পড়ছে। প্রভাতবাবু লাইব্রেরির যেখানটিতে বসতেন তারই সামনের দেয়ালে প্রভাতবাবুর মাথার উপরেই বেশ বড় একটি বাঁধানো ফটো ছিল। ফটোটি দেখে আমার মনে হত প্রভাতবাবু একটি *Reclining Chair*-এ বসে 'সাধনা' পড়ছেন। দীর্ঘকাল পরে একদিন শান্তিনিকেতনে এসে দেখলাম ছবিটি আর লাইব্রেরিতে নেই। প্রভাতবাবুকে জিজ্ঞাসা করলাম—"আপনার অমন সুন্দর ফটোটি কোথায়?" প্রভাতবাবু অবাক-বিস্ময়ে বললেন—"আমার আবার কোন্ ফটো? লাইব্রেরিতে আমার তো কোন ফটো ছিল না" আমি ছবিটির বিশদ বিবরণ দিলাম—তখন প্রভাতবাবু বিষয়টা বুঝতে পেরে একটু হেসে বললেন—"ওটা আমার ফটো কে বললে? ওটা তো বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবি।"

১৯১০ থেকে ১৯১৯ সাল পর্যন্ত নয় বছর আমি ব্রহ্মচর্যাশ্রমে পড়েছিলাম। তার মধ্যে পাঁচ বছর ধরে বিভিন্ন সময় ভূগোল,

প্রকৃতি-পর্যবেক্ষণ (*Nature Study*), বাংলা এবং ইতিহাস পড়েছি প্রভাতবাবুর কাছে।

১৯১০ সাল থেকেই তাঁর কাছে আমার ভূগোল পড়া শুরু —অষ্টম বর্গ থেকে তৃতীয় বর্গ পর্যন্ত তা অব্যাহত ছিল। মোট কথা, ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রভাতবাবু ছাড়া আর কারও কাছে ভূগোল পড়েছি বলে মনে পড়ে না। তিনি বিশ্বের প্রাকৃতিক ভূখণ্ডের সঙ্গে খুব ভাল করেই আমাদের পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। আমাদের কখনও ভূগোলের কোন পাঠ্যপুস্তক ছিল না। প্রভাতবাবু মুখে মুখে ভূগোল পড়াতেন। ক্লাসে আমাদের নোট দিতেন; আমরা সেগুলো বাঁধানো 'ফেয়ার খাতা'য় লিখে প্রভাতবাবুকে দেখাতাম —তিনি সংশোধন করে দিতেন। শিশুছাত্রদের পর্যবেক্ষণ-শক্তি বিকশিত করাই ছিল তাঁর ভূগোল শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য। সুতরাং আমরা ছাত্ররা যাতে চারদিকের ঘটনা মনোযোগের সঙ্গে লক্ষ্য করে বিচার পূর্বক কার্যকারণের সম্বন্ধ নির্ণয় করতে পারি, সেই দিকে তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। প্রত্যক্ষভাবে পরীক্ষা ও আলোচনার দ্বারা লব্ধ জ্ঞান সহজেই আয়ত্ত হয় মনে করেই প্রভাতবাবু আমাদের প্রায়ই ক্লাসের সময় পার্শ্বস্থ খোয়াইয়ে বেড়াতে নিয়ে গিয়ে প্রাকৃতিক গঠনের মাধ্যমে ভৌগোলিক সংজ্ঞাগুলির সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়েছিলেন। ভৌগোলিক সংজ্ঞাগুলি বই থেকে মুখস্থ করে সত্তর বছর পরে আজ লেশমাত্র মনে থাকত কিনা সন্দেহ, কিন্তু প্রভাতবাবুর শিক্ষাদানগুণে বর্তমানেও ঐ বস্তু-গুলির *image* আমার অন্তরে গাঁথা হয়ে আছে। মোট কথা, তাঁর কাছে ভূগোল পড়া যেমন ছিল আমোদজনক, তেমনি চিত্তাকর্ষকও।

১৯১১ সালে 'সপ্তম বর্গে' প্রমোশন পেলাম। সেখানেও প্রভাতবাবুর কাছে আমাদের ভূগোল অধ্যয়ন অব্যাহত থাকল।

সে বছর গ্রীষ্মাবকাশের পর আমাদের আর একটি পাঠ্য বিষয়ের দায়িত্ব প্রভাতবাবুর উপর এসে পড়ে—সেটি হচ্ছে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ বা '*Nature study*'। এই বিষয়টি গুরুদেবের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রথম প্রবর্তন করেছিলেন অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ। প্রশান্তবাবু এই সময়ে আশ্রমে এসে কিছুদিন আমাদের সঙ্গে ছিলেন এবং তিনিষ্ট এই ক্লাসটি নিতেন। গ্রীষ্মের ছুটির পর থেকে প্রভাতবাবু বিষয়টি পড়াতে শুরু করেন। আজও স্পষ্ট মনে পড়ে, তিনি আমাদের ক্লাসের প্রত্যেক ছাত্রকে একটি ঘরকাটা ছাপানো খাতা দিয়েছিলেন। নিজস্ব পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে আমাদের সেই ঘরগুলি পূরণ করতে হত। তাতে ছিল—তারিখ, সময়, বাতাসের দিক, বাতাসের গতি, উষ্ণতা, আকাশের অবস্থা, মেঘের প্রকৃতি, বৃষ্টির পরিমাণ এবং মন্তব্য। প্রভাতবাবু অনেক সময়ে আমাদের নিয়ে চারদিকে ঘুরে ঘুরে ঐ খাতার ঘর পূরণ করতে সাহায্য করতেন। মনে আছে, বোম্বাই থেকে তিনি একটি '*Rain-Gauge*' আনিয়ে গৌর-প্রাঙ্গণে স্থাপন করেছিলেন। বৃষ্টির পর প্রত্যেকবার জল মাপবার সময় আমরা তাঁকে ঘিরে থাকতাম। এইভাবে আমরা প্রত্যেকদিনের বৃষ্টি মেপে সে মাসে মোট কি পরিমাণ বৃষ্টি হল তা নির্ণয় করতাম। বাতাসের চাপ ও দৈনন্দিন উষ্ণতা মাপবার জন্য একটি ব্যারোমিটার ও একটি থার্মোমিটার লাইব্রেরিতে প্রভাতবাবুর টেবিলের উপর থাকত। আমরা তা থেকে নিজেরাই *reading* গুলি লিখে নিতাম। এ রকম ভাবে প্রকৃতি পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে প্রাকৃতিক ভূগোলটাও সহজে আমাদের আয়ত্তে এসেছিল।

১৯১২ সালে উঠলাম 'ষষ্ঠ বর্গে'। এবারে ভূগোল ছাড়া বাংলাও পড়তে আরম্ভ করলাম প্রভাতবাবুর কাছে। এই ক্লাসে আমাদের পাঠ্য ছিল গুরুদেবের 'কথা ও কাহিনী', 'রাজর্ষি' আর

অজিতকুমার চক্রবর্তীর 'খৃষ্ট' বইটি। বাংলা পড়াবার সময়ও প্রভাতবাবুর বৈশিষ্ট্য দেখা যেত। 'কথা ও কাহিনী'র' কবিতা পড়াবার সময় তিনি নিজে আগাগোড়া কবিতাটি আবৃত্তি করে আমাদের উপর ন্যস্ত করতেন মুখস্থ করবার ভার। তা ছাড়া ক্লাসে দুটি দল গঠন করে কবিতা আবৃত্তিতে ঐ দুই দলের মধ্যে প্রতিযোগিতার ব্যবস্থাও করেছিলেন। প্রভাতবাবু নিজে বিচারক হয়ে নম্বর দিতেন এবং জয়ী দলের নাম ঘোষণা করতেন—খুব উল্লাসের সঙ্গে ছেলেরা তা গ্রহণ করত।

'রাজর্ষি' বইটিকে প্রভাতবাবু *Rapid reading*-এর মত পড়াতেন। মাঝে মাঝে রঘুপতির চেহারার বর্ণনা ও রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্র লিখতে দিতেন। অজিতবাবুর 'খৃষ্ট' বইখানি তিনি ইতিহাস ভিত্তিক পটভূমিকায় পড়াতেন। এই বইখানি পড়াবার সময় ব্যাখ্যা, অন্বয় এবং বানান শুদ্ধির জন্য মাঝে মাঝে *dictation*-ও লেখাতেন। মোট কথা, প্রভাতবাবু বাংলা সাহিত্যের রস সৃষ্টির সঙ্গে ভাষার সামান্য শুষ্ক কাঠিন্যের মিশাল করেই আমাদের বাংলা পড়াতেন। বাংলা পড়াবার এই অভিনব পদ্ধতি প্রভাতবাবু নিজেই প্রবর্তন করেছিলেন।

১৯১৩ সালে প্রমোশন পেয়ে 'পঞ্চম বর্গে' উঠলাম। এ বর্গেও প্রভাতবাবুর কাছে আমাদের ভূগোলের পাঠ অব্যাহত রইল। ইতিহাসও চলল সঙ্গে সঙ্গে। ভূগোল ও ইতিহাস পড়াবার সময় প্রভাতবাবু রোজ বড় বড় *Wall Atlas* এবং *Globe* ব্যবহার করতেন; সেগুলি লাইব্রেরি থেকে তিনি নিজেই ক্লাসে নিয়ে আসতেন—কোনদিন এর ব্যতিক্রম দেখি নি।

১৯১৪ সালে প্রমোশন পেলাম 'চতুর্থ বর্গে'। ইতিমধ্যে আমাদের বিদ্যালয়ে শ্রেণী-বিভাগ প্রবর্তন হয়ে গেছে। এ বছরে প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমার যোগাযোগ আরও ঘনিষ্ঠ হয়ে

উঠল। এ বছরই শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যাশ্রমে আমাদের ভূগোল পড়ার শেষ বছর। বলা বাহুল্য, এই শেষ বছরে প্রভাতবাবু আমাদের এমন উচ্চমানের ভূগোল পড়িয়েছিলেন যে, এর পরে ছাত্রদের প্রবেশিকা ভূগোল পড়তে কোন অসুবিধা হত না; যদিও আমাদের বিদ্যালয়ে প্রবেশিকা বর্গে ভূগোল পড়াবার কোন ব্যবস্থা তখন পর্যন্ত হয় নি। এই বর্গে প্রভাতবাবুর ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস পড়ানোর ব্যাপারে তাঁর আর একটি বৈশিষ্ট্য আমাকে মুগ্ধ করেছিল। এই সময় অর্থাৎ ১৯১৪ সালে আমরা প্রভাতবাবুর সঙ্গে তদানীন্তন লাইব্রেরির উপরতলায় খড়ের ছাওয়া সুবৃহৎ ছাত্রাবাসটিতে থাকতাম। গুরুদেব এই গৃহটির নাম দিয়েছিলেন 'বল্লভী'। এই ঘরের অধিকাংশ ছাত্র ছিল ইতিহাসের। এই বর্গে প্রথম ইতিহাসের পরীক্ষা হবে—প্রভাতবাবু দুপুরের খাবারের পর ও পরীক্ষা আরম্ভ হবার আগে ইতিহাসের ছাত্রদের নিয়ে বসতেন আলোচনার জন্য; অনেকটা *Refresher Course*-এর মত। এক একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় পালাক্রমে বিভিন্ন ছেলেকে দিয়ে বলাতেন, কারও কোন ভুল থাকলে আমাকে সেটা সংশোধন করতে বলতেন। ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসও তিনি যথেষ্ট উচ্চাঙ্গের এবং অতি উৎকৃষ্ট ভাবে পড়িয়ে-ছিলেন—তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না।

১৯১৫ সালে আমরা 'তৃতীয় বর্গে' প্রমোশন পেলাম। এ বছরেই প্রভাতবাবুর সঙ্গে আমাদের শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্কের সমাপ্তি ঘটল। কিন্তু তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ একেবারে ছিন্ন হয় নি। ১৯১৪ এবং ১৯১৫—এই দু'বছর তিনি আমাদের 'গৃহাধ্যক্ষ' ছিলেন। আশ্রমে তখন যে কয়টি অবাঙালী ছাত্র ছিল তাদের মধ্যে একমাত্র বিজয় বাসু ছাড়া আর সকলেই প্রভাতবাবুর অধীনে 'বল্লভী' কুটীরেই থাকত। সব কাজে তিনি

আমাদের সঙ্গ দিতেন ; এমন কি আশ্রম-বিদ্যালয়ের বরাদ্দ কর্মসূচি পালন করার ব্যাপারেও। ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে উঠে নিজেই ছেলেদের সকলকে জাগিয়ে প্রাতঃকৃত্যের জন্য মাঠে পাঠিয়ে দিতেন। ঘর ঝাঁট দেওয়ার সময় নিজে উপস্থিত থেকে ছেলেদের সাহায্য করতেন। ঘর এবং ছেলেদের সিটগুলি, বই-পত্র গোছানো প্রভৃতি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার প্রতি তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। ছেলেদের নিয়ে ব্যায়াম এবং বাগান করতেও তাঁকে দেখেছি। সব বিষয়েই তাঁর উৎসাহ ছিল খুব।

এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা বিশেষভাবে মনে পড়ছে। প্রভাতবাবু একবার উৎসাহের সঙ্গে কয়েকটি কর্নি, কিছু চুন-বালি, ব্রাশ, দড়ি-দড়া, বাঁশ ইত্যাদি জোগাড় করে ছেলেদের নিয়ে 'বল্লভী' কুটীরের মত বিরাট ঘরটি প্লাস্টার এবং চুনকাম করতে লেগে যান। ঘর চুনকাম হয়ে গেলে কুয়ো থেকে দোতলায় জল টেনে নিয়ে ঘরটি ভাল করে ধুয়ে মুছে আবার তক্তপোষ প্রভৃতি আসবাব-পত্র পুনরায় যথাস্থানে সাজিয়ে রাখেন। তাঁর সঙ্গে সাহায্য করেছিল ছেলেরা। এই কাজটির জন্য বিদ্যালয় থেকে আমরা আঠার টাকা পেয়েছিলাম। প্রভাতবাবুর নির্দেশে সেই টাকা জমা দিয়েছিলাম আশ্রমের সেবা-ভাণ্ডারে। এমন অভিনব কাজ আমার আশ্রমজীবনে আর কখনও দেখেছি বলে মনে হয় না।

ব্যায়ামের পর স্নানের সময়ও প্রভাতবাবু কুয়োতলায় উপস্থিত থাকতেন। অনেক সময় দেখেছি, শীতকালে ছেলেরা ভাল করে তেল না মাখলে তিনি নিজেই তাদের গায়ে ভাল করে মর্দিত করে দিতেন। স্নানের পরেই ছিল উপাসনার পালা। এই উপাসনায় বসতে তাঁর ঘরের একটিও ছেলে যাতে দেরী না করে সেইদিকে সব সময় তাঁর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থাকত। উপাসনার পর

তিনি সোজা চলে যেতেন রান্নাঘরে এবং মাষ্টারমশাইদের চায়ের আড্ডাটিতে উপস্থিত থাকতেন। সহযোগী অধ্যাপকদের সঙ্গে নানাবিধ আলোচনায় তিনি খুব উৎসাহের সঙ্গে অংশ নিতেন।

রান্নাঘরের জলযোগ পর্ব শেষ হলে তিনি লাইব্রেরি খুলে নিজের কাজে বসতেন। নির্দিষ্ট ক্লাসগুলি ছাড়া সব সময় তিনি একজন জ্ঞানতপস্বীর মত লাইব্রেরিতে বসে পড়াশুনা করতেন এবং লাইব্রেরির উন্নতির জন্য আপ্রাণ খাটতেন। কুঁড়েমি কাকে বলে তিনি জানতেন না—ভীষণ পরিশ্রমী ছিলেন, ক্লান্তি তাঁর ধার দিয়েও ঘেঁসত না। তাঁকে আমরা বরাবরই খুব স্বাস্থ্যবান দেখেছি।

প্রভাতবাবু পেশায় ছিলেন একজন গ্রন্থাগারিক এবং শিক্ষক। কিন্তু তাঁর নেশা ছিল বই পড়ায়। আমাদেরও তিনি পাঠ্য-পুস্তকের বাইরের বই পড়বার জন্য সর্বদাই উৎসাহ দিতেন। তাঁর সান্নিধ্যে এসে আমাদের বদ্ধমূল ধারণা হয়েছিল যে, একটি দৃঢ় সংকল্প নিয়েই তিনি আমাদের গৃহাধ্যক্ষের কাজ শুরু করে-ছিলেন। ছেলেদের সঙ্গে তিনি খোলাখুলিভাবে মিশতেন, কেননা তিনি মনে করতেন যে এই প্রকার মেলামেশা এবং বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনার মাধ্যমেই ছেলেদের বিভিন্ন বিষয়ের বই পড়ার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে এবং তাদের সৎপথে চালনা করা সহজসাধ্য হবে।

প্রভাতবাবু দেখতে যেমন সুন্দর, অন্তরটিও তেমনি স্নেহপ্রবণ এবং সহানুভূতিশীল। কিন্তু স্পষ্ট কথা বলতে তিনি কোনদিনই বিরত হতেন না। এমন কি অনেক সময় গুরুদেবের সঙ্গে তর্ক করতেও দ্বিধা করতেন না। আসলে তিনি কখনও *'yes man'*-এর দলভুক্ত ছিলেন না। এই সদ্‌গুণটি তিনি উত্তরাধিকার সূত্রে তাঁর মায়ের কাছ থেকেই পেয়েছিলেন বলে মনে হয়।

তাঁর মা গিরিবালা দেবী ছিলেন অপূর্ব সুন্দরী, মহিয়সী নারী—রমণী রত্ন। আশ্রমবাসী সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করতেন। প্রভাতবাবুর মায়ের সঙ্গে আমার মায়ের এমন অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল যে, আমার মা তাকে কোনদিন ভুলতে পারেন নি। দীর্ঘদিন হল প্রভাতবাবুর মা গত হয়েছেন, কিন্তু আমার মা তার পরেও অনেকদিন বেঁচেছিলেন—এই সময় প্রায়ই তাঁকে নাতি-নাতনীদের কাছে প্রভাতবাবুর মায়ের কথা বলতে শুনেছি। মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি গিরিবালা দেবীর কথা বলে গেছেন।

আমার পিতা স্বর্গীয় নেপালচন্দ্র রায় ছিলেন অত্যন্ত বন্ধু-বৎসল। যৌবনে কর্মজীবনের শুরু থেকেই তিনি সহকর্মী বন্ধু-বান্ধবদের পরিবারের সঙ্গে এমন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন—যেন তাঁরা আমাদেরই নিকট আত্মীয়।

মনে পড়ে, তখনকার দিনের আশ্রম-বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে অন্যতম কনিষ্ঠ ছিলেন প্রভাতবাবু। বলা বাহুল্য, আমার পিতা প্রভাতবাবুকে নিজের ছেলের মত ভালবাসতেন। আমার পিতার প্রতি প্রভাতবাবুর কতখানি ভক্তি ও শ্রদ্ধা ছিল তা প্রকাশ পেয়েছে তাঁর রচিত 'রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ' গ্রন্থে—যেখানে তিনি নেপালচন্দ্র প্রসঙ্গে লিখেছেন প্রাণঢালা শ্রদ্ধা ও ভালবাসা দিয়ে।

আগেই বলেছি, প্রভাতবাবু আমাদের কাছে ছিলেন একটি *'Living Encyclopaedia'*। একথা অসংকোচে বলা যায় যে, অতীত ও বর্তমানের বিশ্বজনীনতার ইতিহাস অষ্টাশি বছরের এই জ্ঞানতপস্বীর মনীষায় আজও উজ্জ্বলভাবে বিরাজমান।

শ্রদ্ধাঞ্জলি

সন্‌জীদা খাতুন

মা আমাকে নিয়ে এসে ভর্তি ক'রে দিয়ে গিয়েছিলেন শান্তিনিকেতনে। উনিশ শো চুয়ান্ন সালের কথা। পরিচিত সকলের বাড়ী চিনিয়ে দেবার সময় নিয়ে গেলেন ভুবনডাঙায় প্রভাত কাকাবাবুর বাড়ী। আমাকে বললেন, 'ছাখ্, তোর বাবার সঙ্গে যখন প্রথম এখানে আসি, তখন এঁরা আমাদের একদিন খেতে বলেছিলেন।' অবাক হয়ে গেছিলাম—সে কী কথা—মুসলমানকে বাড়ীতে খেতে বলা! আসলে সে-সব সময়ে সম্প্রদায় বিচারে কার মনের ভাবটা কি রকম, বুঝবার চেষ্টা ক'রে ভয়ে ভয়ে চলতাম আমরা।

'রবীন্দ্রজীবনী'র লেখক হিসেবে এত উঁচুতে তাঁকে রেখেছি সেই ছাত্রজীবনে, যে অনেক নিচু থেকে যেন মাথা তুলে তাঁর দিকে তাকাই শ্রদ্ধাভরে। আসা-যাওয়ায় ক্রমে কাছাকাছি হলাম। দেখলাম, এই ছোঁওয়াছুঁয়ি জাতবিচারের ব্যাপারটায় তাঁরা রীতিমত অসহিষ্ণু। সাহিত্যের আলোচনাতেও এটি প্রকাশ হয়ে পড়ত। 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য হচ্ছিল একবার শান্তিনিকেতনে। ওঁরা স্বামী-স্ত্রীতে মন্তব্য করলেন—ওই মেয়েটির পাপের কাহিনীখানা বাছাই না-করে 'চণ্ডালিকা' করলে কি হয়! সাহিত্যবিচারের প্রসঙ্গ টানবার দরকার নেই, তাঁদের কাছে 'চণ্ডালিকা'র আলাদা মাহাত্ম্য কেন ধরা পড়ে—এইটি আমার কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

ভালো লাগত তাঁদের সংগীতপ্রীতি। আমার আলোচনাতে আমি কিছুতেই তাঁদের দুজনকে আলাদা ক'রে রাখতে পারব না কারণ, সব সময় এক সাথে এক সুরে বাঁধা দেখেছি দুজনকে।

একাত্তর সালে দেশ থেকে তাড়া খেয়ে এসে আশ্রয় নিয়েছিলাম শান্তিনিকেতনে—নিরন্তর মন-মরা ভাব। ওঁদের কাছে গেলেই, তাক থেকে নামানো হত এসরাজ—সাহানা বৌদিকে সুর বেঁধে আসর সাজিয়ে বসতে হত। ভুনুদাও ব'সে পড়তেন একপাশে। পারিবারিক প্রীতির রসে সজীব পরিবেশ। সুরে মন মিলিয়ে সব দুঃখ ভাসিয়ে দিতাম। একজন চোখ বুজে শুনতেন মাথা নেড়ে তাল দিয়ে, আর একজন থেকে থেকে গলা মেলাতেন সঙ্গে। বাহাত্তর বৎসরের বৃদ্ধা স্বচ্ছন্দ ভঙ্গিতে পায়ে তাল দিতে দিতে গেয়ে শুনিয়ে দিলেন—'মাটির প্রদীপখানি আছে মাটির ঘরের কোলে'। আমাদের মুগ্ধ-বিস্ময় লক্ষ্য ক'রে, মাথা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সকলের দিকে কাকাবাবুর সে কি গর্বিত দৃষ্টিপাত।

জরা পরাভব করবার আশ্চর্য ক্ষমতায় যে দৃপ্তভঙ্গিতে প্রভাত কাকাবাবু বরাবর দেখবামাত্র আমাদের সাদর আহ্বান জানিয়ে আসছেন, তাতে তাঁকে কখনোই অশীতিপর বৃদ্ধ ব'লে ভাববার অবকাশ হয় নি। বিস্মিত হব না, যদি এখনো তাঁরা দুজনে—একজন বারান্দার পিঠসোজা চেয়ারে, অপরজন নিচু ইজিচেয়ার-টিতে বসে গেয়ে ওঠেন 'আমরা নূতন যৌবনেরই দূত'। কাকাবাবু গাইতে পারেন ব'লে শুনি নি, কিন্তু নাটক যে করেছেন, সে বোঝা যায় ভঙ্গিতেই। ভঙ্গিতেই রয়েছে যৌবনের ঘোষণা।

আসর জমে সচরাচর সন্ধ্যায়। আটাত্তর সালে একদিন বেলা দশটার দিকেই দুজনে জমিয়ে তুললেন আসর ভিতরের বারান্দায়। ক্ষীণকণ্ঠকে এসরাজের সঙ্গে মিলিয়ে একা গান গাইতে চেষ্টা করলেন সুধাময়ী দেবী। রোগ ভোগ ক'রে উঠেছেন—গলা চলে না—তখন সকলে মিলে একসঙ্গে গাওয়া চলল গান। উৎসাহে ঘাটতি নেই কিছু।

তেমনি উৎসাহ লিখে চলায়! যেমন ইনি—তেমনি উনি!

প্রতিবার দেশ থেকে এখানে বেড়াতে এসে বই উপহার পাই—হয় এঁর, নয় ওঁর। তেয়াত্তর সালের গ্রীষ্মে দেখা করতে গিয়ে পেলাম সদ্য প্রকাশিত 'গীতবিতান/কালানুক্রমিক সূচী'। মহা উৎসাহে জানালেন—আমার এ-বইয়ের প্রথম ক্রেতা ভারতবর্ষের পশ্চিম প্রান্তের কৃষ্ণ কৃপালনী, দ্বিতীয় ক্রেতা পূর্ব প্রান্তের তুমি।' 'কেমন আছেন' জিগ্যেস্ করলেই হাত দুখানা একসঙ্গে ঘুরিয়ে বলবেন—'চলছে। কাজ করছি। লিখছি'।

রবীন্দ্রপ্রসঙ্গে যে-কাজই করতে যাই, কি সংগীত কি সাহিত্যের দিক্—প্রথমেই পড়তে হবে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়। একাত্তর সালে সংগীত নিয়ে কাজ করব ব'লে উপদেশ চাইলাম। বললেন, 'একটি গানেই অনেক কথা ধরা রয়েছে—গানের ভিতর দিয়ে যখন দেখি ভুবনখানি/তখন তারে চিনি, আমি তখন তারে জানি। ভুবনটার দিকে রবীন্দ্রনাথ তাকিয়েছেন গানেরই ভিতর দিয়ে—গানেই তাঁর সম্পূর্ণ পরিচয়'। এই বক্তব্য নিয়ে লেখা তাঁর এক প্রবন্ধের কথাও বললেন, পড়ে নিলাম।

এ-বৎসর বাংলাদেশের জন্যে রবীন্দ্রজীবন ও কর্মের পরিচিতি-মূলক গ্রন্থ প্রস্তুত করতে গিয়ে, প্রথমেই দেখে নিতে হচ্ছে 'রবীন্দ্রজীবনকথা'। কি সহজ অনাড়ম্বর ভাষা, কেমন সংক্ষেপে বিচিত্র বিষয়কে বিভাসিত করবার ক্ষমতা! যিনি এত জানেন, তিনি নিজেকে সম্বরণ করছেন কি ভাবে? সেখানেও দ্বৈত লীলার ব্যাপার। সুধাময়ী দেবী চারখণ্ড 'রবীন্দ্রজীবনীর' সংক্ষিপ্তসার তৈরী ক'রে না-দিলে একাজ দুঃসাধ্য ছিল। প্রভাতকুমার নিজেই বলেছেন—নিজের লেখার সবটাই মনে হয় অপরিহার্য। পরিহার করবার মত বিষয়গুলো ছেঁটেকেটে ছিমছাম একটি অবলম্বন তৈরি করে দিয়েছেন সুধাময়ী, তবেই নতুন ভাষায় তরতর ক'রে এগিয়ে গেছে প্রভাতকুমারের লেখনী। ভিতরে রয়েছেন দুইজন, বাইরে আমরা দেখছি একজনকে।

তাঁদের উভয়কে আজ আমার অন্তরের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

মনীষী প্রভাতকুমার

অন্নদাশঙ্কর রায়

শান্তিনিকেতনের আশ্রমগুরুদের মধ্যে জীবিত আছেন এখন একমাত্র প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়। যদিও তিনি আশ্রম থেকে সরে গিয়ে ভুবনডাঙায় বাস করছেন বহুকাল। তাঁকে বাদ দিয়ে আমি শান্তিনিকেতনের কথা ভাবতেই পারিনে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ঋষিকল্প দ্বিজেন্দ্রনাথ ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্য তাঁর জীবনে প্রবহমান রয়েছে। এর থেকে মনে হতে পারে তিনি আদিব্রাহ্মসমাজভুক্ত। তা নয়। তিনি সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের সদস্য। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য সীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় তাঁর শ্বশুর। সহধর্মিনী সুধাময়ী দেবী সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে লালিত। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ আদি-ব্রাহ্মসমাজের চেয়ে উদার। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে যোগ দিয়ে প্রভাতকুমার উপবীত বর্জন করেন। তখনকার দিনে এটা ছিল পরম সাহসের পরিচায়ক। সাম্যবাদী প্রভাতকুমার এর পরে অসবর্ণ বিবাহ করেন। তাঁর চোখে ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণ সমান। আজকাল এরূপ ঘটনা অহরহ ঘটছে। কিন্তু তখনকার দিনে এর জন্যে সামাজিক নিগ্রহ ভোগ করতে হতো। হিন্দুসমাজ যে আজ অপেক্ষাকৃত উদার হয়েছে সেটা প্রভাতকুমারের মতো তেজস্বী পুরুষদের জন্যেই। ব্রাহ্মমতাবলম্বী হলেও তিনি হিন্দুসমাজের থেকে বিচ্ছিন্ন নন। তিনিও বৃহত্তর অর্থে হিন্দু। হিন্দু উত্তরাধিকার থেকে তিনি বঞ্চিত নন। সাকার উপাসনা ও বর্ণাশ্রম অগ্রাহ্য করেও হিন্দু বলে পরিচয় দিতে পারা যায়। রবীন্দ্রনাথও এই অর্থে হিন্দু। যদিও বর্ণাশ্রমের ঊর্ধ্বে উঠতে তাঁর

তিনভাগ জীবন কেটে যায়। শেষপর্বে তাঁর পরিবারেও অসবর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠিত হয়।

প্রভাতকুমারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় তিনি যখন গ্রন্থাগারিক ও আমি যখন বহিরাগত ছাত্র। পরবর্তীকালে সে পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হয়। আমাদের উভয়েরই সামাজিক আদর্শ এক। ধর্মীয় ব্যাপারে আমি কতক পরিমাণে ব্রাহ্ম, কতক পরিমাণে বৈষ্ণব, কতক পরিমাণে টলস্টয়ের প্রভাবে খ্রীষ্টমার্গের সারাংশে বিশ্বাসী। প্রভাতকুমার কিছুদিন মার্কসবাদের দিকে ঝুঁকেছিলেন। এখন বোধ হয় সেটা কাটিয়ে উঠেছেন। রামমোহনের বিরুদ্ধে কী এক কুক্ষণে গান্ধীজী এক অশোভন উক্তি করেছিলেন। সেটা আমাকেও আঘাত করেছিল। প্রভাতকুমারকে তো করবেই। মনে হয় সেই অপরাধে তিনি গান্ধীজীর অর্থনীতির উপরেও বিরূপ হন। রবীন্দ্রনাথও। এটা দুঃখের বিষয়। তবে তিনি একবার কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন, "ওরে ভীরু, তোমার পরে নয় ভুবনের ভার। ভারতের ভার গান্ধীর উপরে।..."

প্রভাতকুমার শান্তিনিকেতনের লাইব্রেরীর জন্যে যা করেছেন তা আর কারো দ্বারা সম্ভব হতো না। সেটাই তাঁর অসামান্য কীর্তি বলে পরিগণিত হতো, যদি না ইতিমধ্যে তিনি 'রবীন্দ্র-জীবনী' লেখা আরম্ভ করে দিতেন ও সেই মহাগ্রন্থ শেষ করার পরেও রবীন্দ্রনাথের জীবনের প্রত্যেকটি দিনের বিবরণ সংগ্রহ করার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। ভাবীকাল তাঁকে মনে রাখবে রবীন্দ্রনাথের কৃষ্ণদাস কবিরাজরূপে। এর জন্যে তিনি অতুলনীয় পরিশ্রম করেছেন ও করছেন। "গৃহীত এব কেশেষু" এই নিয়ে থাকবেন।

কিন্তু প্রভাতকুমারের আগ্রহ সর্বতোমুখী। ইতিহাসেই তাঁর সর্বাধিক আগ্রহ। তিনি একপ্রকার বিশ্বকোষও প্রণয়ন করেছেন।

আমি যখনি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেছি তখনি দেখেছি তিনি নিত্য নতুন গ্রন্থ রচনায় নিমগ্ন। তবে রবীন্দ্রজীবনীই চিরসঙ্গী। তিনি নিজেই একটি জীবন্ত বিশ্বকোষ।

চেহারাটিকেও প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের মতো করে এনেছেন। এই নিয়ে আমি প্রায়ই পরিহাস করি। রবীন্দ্রনাথকে না দেখলে প্রভাতকুমারকে দেখ। খানিকটা তো পাবে। তিনি গুরুবাদী নন, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নিবিড়ভাবে একাত্ম। রবীন্দ্রনাথের বিবর্তনের সঙ্গে সেই ১৯১০ সাল থেকেই তিনি অন্বয় রক্ষা করে এসেছেন। সালটা বোধহয় ১৯০৯ হবে। মাঝখানে কিছুদিনের জন্যে অন্যত্র গেছলেন। বিবাহের পর শান্তিনিকেতনেই ফিরে আসেন ও সপরিবারে সেইখানেই স্থায়ী হন। যদিও বাসগৃহ নির্মাণ করা হয় ভুবনডাঙায়।

শান্তিনিকেতনে অবস্থানকালে আমি ভাদুর গান শুনেছি। তাতে একজনের উল্লেখ থাকত। "ভুবনডাঙার দেড়েল-বাবু গো…"। এই দেড়েলবাবু আর কেউ নন। আমাদেরই প্রভাতকুমার। আমি যখন তাঁকে প্রথম দেখি সেই ১৯২৪ সালে তাঁর দাড়ি সবে গজিয়েছে। গানটা আমি শুনি প্রায় ত্রিশ বছর বাদে। ততদিনে তিনিও বর্ধিষ্ণু। তাঁর দাড়িও বর্ধিষ্ণু। ইতিমধ্যে তিনি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টও হয়েছিলেন। সুতরাং ভাদুর গানের নায়ক হতে বাধা কোথায়।

রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত যে ধারাটি প্রবাহিত হয়েছে আমি সেই ধারায় ভেসে এসেছি। প্রভাতকুমারও তাই। আমাদের মধ্যে একটি প্রচ্ছন্ন সাযুজ্য বিদ্যমান। এই কারণে আমিও শান্তিনিকেতনবাসী হয়েছি। যদিও আপাতত কলকাতায় আছি। "আমাদের শান্তিনিকেতন, আমাদের সব হতে আপন।"

প্রভাতকুমারের শতায়ু কামনা করি। তাঁর জয় হোক।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রবিদ্যা

ভবতোষ দত্ত

বাংলা ভাষাতত্ত্বের বা বাংলা ভাষার ইতিহাসের প্রসঙ্গ যখন ওঠে, তখন সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে যায় সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রসঙ্গ উঠলে আপনা থেকেই এসে যায় দীনেশ চন্দ্র সেন এবং সুকুমার সেনের কথা। বাংলা ছন্দের কথা যখন আলোচ্য হয়, প্রবোধচন্দ্র সেনের নামটা মনে পড়বেই। এ রকম দৃষ্টান্ত আরও দেওয়া যেতে পারে, শুধু সাহিত্যে নয় বিজ্ঞানেও, যাতে ব্যক্তিবিশেষের নাম চিরকালের জন্য কোনো বিশেষ প্রসঙ্গে জড়িয়ে আছে। রবীন্দ্রজীবনের বিবরণ প্রসঙ্গে তেমনি প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় আর একজন আছেন—তাঁর নামও এমনি একটি বিশেষ সূত্রে স্মরণীয়। বাংলা ছোট গল্পের ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের পরেই তাঁর নাম। ছোট গল্পের ইতিহাসের কথা বলতে গেলে তাঁর নাম আসবেই। তাই বলে তিনি যে শ্রেষ্ঠ তা নাও হতে পারে কিন্তু তিনি স্মরণীয়। এদিক দিয়ে রবীন্দ্রজীবনীকার অগ্রণী এবং শ্রেষ্ঠ—দু'য়েরই মর্যাদার অধিকারী। হয়তো প্রভাতকুমারের রবীন্দ্রজীবনী লেখার আগে রবীন্দ্রনাথের জীবনকথা কোথাও কোথাও বেরিয়ে থাকবে। তবু তিনি যে অগ্রণী এ-কথাটা ভুল প্রমাণিত হবার সম্ভাবনা নেই। রবীন্দ্রনাথকে তিনি যেভাবে দেখেছেন, সে দেখার তুলনা এখনও নেই। তাই তাঁর প্রতি আমাদের এই শ্রদ্ধার্ঘ্য।

রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার অসামান্যতা এখানেই যে এ কেবল কবির জীবনী নয়, একজন জমিদারের জীবনীও নয়,

নয় কেবল একজন আর্টিষ্টের। তাঁর সাহিত্য সাধনার সমান গুরুত্ব তাঁর জীবনাচিন্তার আদর্শ-ভাবনার দেশ এবং রাষ্ট্র চিন্তার। সেই সঙ্গে ধর্ম, দর্শন চিত্রকলা, সঙ্গীত-শিল্প, শিক্ষাদর্শন সব মিলিয়ে রবীন্দ্রমানসের যে ব্যাপ্তি ও গভীরতা তার সর্বাঙ্গীন ইতিহাস রচনা করবার যোগ্যতা এবং শক্তি কজনের? রবীন্দ্রনাথ একাই তুলনাহীন এক বিস্ময়। এই বিস্ময়কে নতুন করে ফুটিয়ে তোলা এক আর্ট। রবীন্দ্রজীবনী রচনাও এক আর্টিষ্টের কাজ। কিন্তু এই আর্টিষ্ট কল্পনা দিয়ে সৃষ্টি করেন না, করেন তথ্য দিয়ে ইতিহাস দিয়ে। প্রমাণ দিয়ে, মানবসভ্যতার এক পরম বিস্ময়ের বাণীরূপ তিনি রচনা করেন।

রবীন্দ্রজীবনী বইখানা পড়লে রবীন্দ্রনাথ যেমন ভেসে ওঠেন চোখের সামনে, তেমনি এ বই যিনি লিখেছেন তাঁর একটা প্রচ্ছন্ন ব্যক্তিরূপও পরোক্ষে কৌতুহলী পাঠকের কাছে ফুটে ওঠে। সে-মূর্তি শ্রমের সাধনার অনুসন্ধিৎসার জিজ্ঞাসার আবার রসের এবং তৃপ্তির। আমাদের সাহিত্যে পূর্ববর্তী যে সব জীবনী লেখা হয়েছে, তার সঙ্গে তুলনা করলেই এর এই বৈশিষ্ট্য বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের জীবনী লিখতে গেলে শুধু তো সাহিত্যবোধ থাকলেই চলবে না, যে ঐতিহাসিক পশ্চাৎপটে তাঁর আবির্ভাব তার পরিপূর্ণ জ্ঞান থাকা চাই। বাংলাদেশের রেনার্শাস, মধ্য-যুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণ, পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসার, সামাজিক ভাববিপ্লব, মুল্যবোধের রূপান্তর, রাষ্ট্রীয় পরিবর্তন-পরম্পরা বিভিন্ন দেশনেতা ও ভাবনেতার আদর্শ ও চিন্তা সম্বন্ধে পরিপূর্ণ ধারণা—এ সব ঐতিহাসিক জ্ঞানের প্রগাঢ়তা না থাকলে রবীন্দ্রকীর্তির পরিপূর্ণ ছবিটি আঁকা সম্ভব নয়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের জীবনী লেখার দুঃসাহস আরও কঠিন কেননা তাঁর ভাবক্ষেত্র শুধু ভারতে বিস্তৃত নয়। বিভিন্ন দেশের

মনীষী দার্শনিক বৈজ্ঞানিক লেখকদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ভাব-বিনিময়ের পরিপূর্ণ পর্যালোচনা করতে গেলে তাঁদের লেখা এবং চিন্তাধারার সঙ্গেও পরিচয় থাকা দরকার। এমন জীবনী লিখবার দরকার তো আগে কারো হয় নি। প্রথমত এমন জীবন ছিল না, দ্বিতীয়ত এমন প্রস্তুতিও কারো ছিল না। ব্যক্তি যুগ এবং জীবনকে মিলিয়ে আধুনিক কালে হয়েছিল একটি জীবনী—রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ। সকলেই জানেন এতে রামতনু লাহিড়ীই আড়ালে পড়ে গিয়েছেন। তা ছাড়া ব্যক্তিত্ব হিসাবেও রামতনু লাহিড়ীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ব্যাপকতার তুলনা হয় না।

তাই মনে হয় রবীন্দ্রজীবনী পড়া *itself an education*। রবীন্দ্রজীবনী পড়তে পড়তে বহু বিষয় জানতে হয়। এত বিচিত্র উল্লেখ ও আলোচনা ঠিকমতো অনুসরণ করতে হলে পাঠককেও বিচিত্র বিষয় জানতে হয়। উনিশ শতকের ব্রাহ্ম আন্দোলন, ঠাকুর পরিবারের সংস্কৃতি চর্চা, পারিপার্শ্বিক নানা ইতিহাস এ-সব সামাজিক তথ্যের অধিগম্যতা তো আছেই, যাকে হিস্টরী অব আইডিয়া বলে মননধারার সেই জটিল পর্যালোচনাও আছে। ঐতিহাসিককে দার্শনিক হয়ে উঠতে হয়। এবং সেই ভাবের ইতিহাস শুধু আমাদের দেশের নয়, বের্গসঁ, রাসেল, সোয়াইৎজার, আইনস্টাইন ইত্যাদি বহু বিচিত্রমনা মনীষীদের মননচিন্তার বিশ্লেষণ; রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাদের তুলনা করতে হয়েছে, কিংবা রবীন্দ্রনাথকে তারই পরিপ্রেক্ষিকায় স্থাপন করতে হয়েছে।

এ দিক দিয়ে প্রভাতকুমার অগ্রণী। এখনও পর্যন্ত তিনি যে শ্রেষ্ঠ সে-ও সন্দেহাতীত। তাঁর মানসশক্তি বিস্ময়ের উদ্রেক করে। ভবিষ্যতে আরও কেউ কি রবীন্দ্রজীবন-কাহিনী রচনার প্রয়োজন বোধ করবে? যদি একথা বলি তবে বলতে হবে

প্রভাতকুমারের এই আশ্চর্য জীবনী আমাদের পথ রুদ্ধ করে দিয়েছে; আমাদের ভাবাতে শেখায় নি, আমাদের অনুসন্ধিৎসাকে বিমূঢ় করেছে। 'রবীন্দ্রবিদ্যা' এ রকম শব্দ অবশ্য এখনও চলতি হয় নি। কিন্তু প্রভাতকুমারের এই জীবনীটাই এ রকম একটা শব্দের সম্ভাবনা তৈরি করেছে। সেই রবীন্দ্রবিদ্যা কি স্তব্ধ হয়ে থাকবে? তিনিই কি ভবিষ্যৎ গবেষকদের নানা দিক নির্দেশ করেন নি? দু-একটা উদাহরণ দেওয়া যায়।

মধুসূদন থেকে ১৯৪১ পর্যন্ত একটা বড়ো সাহিত্য গড়ে উঠেছে। প্রথমে তার অনুগামী ও পরে তার অধিনায়ক রবীন্দ্রনাথ। এই সাহিত্যধারার পটভূমিকাটি রবীন্দ্রজীবনে আভাসিত হয়েছে কিন্তু পরিস্ফুট নয়। রবীন্দ্রনাথের নিজের রচনার খুটিনাটি (কোনো কোনো সময়ে দিনানুদৈনিক) বিবরণ রবীন্দ্রজীবনীতে আছে, কিন্তু যে বাংলা সাহিত্যে তাঁর আবির্ভাব তার সঙ্গে রবীন্দ্ররচনার যোগের বিশ্লেষণও দরকার। দেবেন্দ্র-নাথ সেন অক্ষয় বড়াল রবীন্দ্রনাথের মতো কবি নন তবু তাঁরা যে সাহিত্যধারায় এসেছেন, সে ধারার মূল্যও যথাযথ হওয়া উচিত। বাংলাসাহিত্যের এই পটভূমিকা রবীন্দ্রসাহিত্যজীবনে মূল্যবান। ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া দেখিয়েই এর বিবরণ হবে।

আর একটি কথা মনে হয়। রবীন্দ্রজীবনীতে ধর্মের নবযুগ নামে একটি চমৎকার অধ্যায় আছে। প্রভাতকুমার রবীন্দ্রনাথের মুক্ত উদার ধর্মচিন্তা বিশ্লেষণ করেছেন সমকালীন চিন্তাধারার পটভূমিকায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত ধর্মান্দোলন বাঙালীর চিন্তাকে অনেকটা বাধামুক্ত করেছে, এ তো সুজ্ঞাত তথ্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ প্রবর্তিত ধর্ম ও সমাজচেতনা যে দেশের একটি ব্যাপক ও বাস্তব সত্য তা-ও তো অস্বীকার্য নয়। এ দেশে মধ্যমণিরূপে রবীন্দ্রনাথকে যখন দেখি, তখন সেই

দেশের লোকমানসের একটি চেহারাও রবীন্দ্রজীবনকালকে পূর্ণায়ত করতে পারে।

কিন্তু এসবই আছে রবীন্দ্রজীবনীতে। ভবিষ্যৎ রবীন্দ্র-বিদ্যাসাধক হয়ত একে পূর্ণতর করে তুলতে পারবে।

বস্তুত রবীন্দ্রজীবনীতে যে কত অপরিমেয় সম্ভাবনার বীজ অঙ্কুরিত, তরুণ গবেষকদের চেষ্টাতে তা ক্রমে ক্রমেই ধরা পড়বে। প্রভাতকুমার নিজেও নব্বুইয়ের দ্বারে উপনীত হয়ে কাজে নিরত আছেন। 'ভারতে জাতীয় আন্দোলন' তিনি লিখেছেন। এখন লিখছেন 'বাংলার ধর্মসাহিত্য'। এর মধ্যে বেরিয়েছে 'রামমোহন ও তৎকালীন সমাজ ও সাহিত্য'। আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের নানা দিকের সন্ধান করতে করতেই তিনি এসব বই লিখতে উৎসুক হয়েছেন।

রবীন্দ্রবিদ্যার এই সাধককে দেখলে মনে পড়ে যায় চৈতন্যচরিতামৃতকার কৃষ্ণদাস কবিরাজকে যিনি নব্বই অতিক্রম করে তাঁর অমর গ্রন্থ রচনা শুরু করেছিলেন।

অধুনা প্রভাতকুমার

ধীরেন্দ্রনাথ দাস

রবীন্দ্রজীবনীকার শ্রদ্ধেয় প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৫৪ সালে বিশ্বভারতীর কর্ম থেকে অবসর গ্রহণ করেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি তাঁর বাসভবনে গড়ে তোলেন 'রবীন্দ্র অকাদেমী'। নানা দুর্লভ গ্রন্থসংগ্রহে সমৃদ্ধ অকাদেমীর গ্রন্থাগারটি পরবর্তীকালে প্রভাতকুমারের রবীন্দ্র-চর্চা ও অন্যান্য বিচিত্র জ্ঞানসাধনার পীঠস্থান হয়ে উঠেছে। বর্তমানে এই গ্রন্থাগারটির পুনর্গঠনের দায়িত্ব অনেকখানিই আমার উপর অর্পিত হয়েছে। আমার সরকারী কর্মের নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে আমি যথাসাধ্য সেই দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট আছি—নির্দেশনায় আছেন মহাগ্রন্থাগারিক প্রাভতকুমার স্বয়ং।

প্রভাতকুমারকে আমি জানি আমার ছেলেবেলা থেকে। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সময়ে তাঁর গবেষণাকর্মে সহায়তা করার সৌভাগ্যও আমার হয়েছে—এখনো হচ্ছে। অকাদেমী গ্রন্থাগারের কাজে এবং বহু পূর্বে প্রকাশিত (অসম্পূর্ণ) দু'খণ্ড 'জ্ঞানভারতী' সম্পাদনার কাজে নিযুক্ত থেকে প্রভাতকুমারকে এখন দেখছি আরও কাছে থেকে।

বহু সম্মানে ভূষিত প্রভাতকুমার আজ দেশের মানুষের কাছে সুপরিচিত। তাই তাঁর বর্তমান বিচিত্রমুখী কর্মধারা সম্পর্কে জানার কৌতূহলও বহু মানুষের। প্রভাতবাবু কি এখনো লেখেন? তাঁর কি কি নোতুন বই বেরুচ্ছে? —ইত্যাদি নানা প্রশ্নের জবাব প্রায়শই দিতে হয়। সে সব প্রশ্নের এবং সম্ভাব্য আরও নানা প্রশ্নের জবাবে এই লেখা।

প্রাত্যহিক জীবন-চর্যায় প্রভাতকুমার বরাবরই নিয়ম-নিষ্ঠ। এখনো কদাচিৎ তার অন্যথা হতে দেখি। আগামী ১১ই শ্রাবণ (১৩৮৭) ৮৯ বছরে পদার্পণ করবেন প্রভাতকুমার। বয়সের ভার তাঁর কর্মপ্রবাহকে কিঞ্চিৎ মন্থর করলেও বিপর্যস্ত করেনি— সামান্য বিষয়েও তাঁর নিয়ম-নিষ্ঠা ও অনুসন্ধিৎসা যে-কোনো যুবকের আদর্শ। তাই তিনি যখন বলেন 'পরিশ্রম-বিমুখ হয়ো না' তখন বুঝি একথা বলার তিনি যথার্থ অধিকারী।

আজকাল প্রভাতকুমার ভোর পাঁচটায় শয্যা ত্যাগ করেন। ছ'টার সময় রেডিও খুলে বি. বি. সি-র বাংলা খবর বা জার্মান বেতারের অনুষ্ঠান শোনেন। খবর শোনার পর সামান্য কিছু খেয়ে (চা খান না—দশ-বারো বছর আগেই ছেড়েছেন) বাইরের খোলা বারান্দায় এসে বসেন—পড়ার টেবিলে। প্রয়োজনীয় কয়েকটি বই ছাড়াও টেবিলে একটি ট্রে-তে থাকে হরেক রকম কলম, চিঠি-পত্র, খাম-পোস্টকার্ড এবং দু'-তিনটে ডায়েরী। আর থাকে একটি বড়ো বয়ামে রঙ্-বেরঙের লজেন্স—পাড়ার ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের জন্য। সত্যি কথা বলতে কি, আমরাও তা থেকে বাদ যাইনে, বাদ যান না প্রভাতকুমার নিজেও।

এখনো প্রভাতকুমার নিয়মিত লেখার অভ্যাস রেখেছেন। তবে একটানা দীর্ঘ সময় নয়। কোনো কোনো দিন পড়াশোনার মাঝখানে 'শিশু ভোলানাথ'দের আমন্ত্রণ প্রভাতকুমারকে হৈ-হৈ খেলার আনন্দোৎসবে মাতিয়ে তোলে। অশীতিপর বৃদ্ধ অথচ চিন্তায় ও কর্মে যুবক প্রভাতকুমারের সে এক ভিন্নতর রূপ।

প্রতি শুক্রবারের সকালটা তাঁর কাটে ভিখারীদের নিয়ে। টেবিলে সেদিন থাকে একটি বড়ো অ্যালুমিনিয়মের বাটিতে

খুচরো পয়সা। সকাল থেকেই ভিখারীদের আনাগোনা শুরু হয়। প্রভাতকুমার শুধু পয়সা দিয়েই ওদের বিদেয় করেন না—প্রত্যেকের নাম-ধাম, ঘর-গেরস্থালীর খবরাখবরও জেনে নেন। এখন তাই ওরা সকলেই প্রভাতকুমারের পরিচিত। হঠাৎ কেউ দীর্ঘ দিন না এলে প্রভাতকুমার সঙ্গীদের কাছে তার খোঁজ-খবর নেন—"অমুককে দেখছি না কেন ক'দিন? কি হয়েছে ওর?" ইত্যাদি। ওদের মধ্যে যারা বৃদ্ধ বা অসুস্থ, শীতের সময় তাদেরকে মোটা কাপড় বা চাদর কিনে দিতেও দেখেছি; অসুখ বিসুখ হ'লে কিছু বেশি অর্থসাহায্য। আমাদের মতো কয়েকজন কাছের মানুষ ছাড়া এই প্রভাতকুমারকে ক'জনই বা জানেন!

ইদানীং সকালের প্রথম পর্বটা সবদিন এক রকম ভাবে কাটে না। কোনো কোনো দিন হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে একটা রিক্শো করে প্রভাতকুমার সস্ত্রীক বেড়িয়ে পড়েন শান্তিনিকেতন বা শ্রীনিকেতনের পথে; কখনো কখনো গোয়ালপাড়া বা আদিত্যপুর গ্রামের দিকে। বিলাসিতা প্রভাতকুমারের দু'চোখের বিষ, তাই আর্থিক সামর্থ থাকলেও বাড়ীতে গাড়ী নেই। কোনো দিন যদি ইলামবাজারের জঙ্গল বা অজয়ের পুল তাঁকে ডাক দেয়, ট্যাক্সি ভাড়া করেই বেড়িয়ে পড়েন। প্রসঙ্গত বলি, প্রভাত-কুমারের পোষাক-পরিচ্ছদও বরাবর বাহুল্য বর্জিত—একেবারে সাদাসিধে।

লেখা-পড়া, শিশুদের নিয়ে মাতামাতি, বেড়ানো প্রভৃতির ভেতর দিয়ে সকালের পর্ব শেষ হয়। তারপর সাড়ে এগারোটা নাগাদ স্নান। না—স্নানের ঘরে নয়, বারান্দাতেই মোড়া বা জলচৌকিতে বসে। স্নানের আগে অনেকক্ষণ ধরে শরীরে সরষের তেল মালিশ চলে। এ অভ্যাস তাঁর দীর্ঘদিনের।

বারান্দাতেই বড়ো এক বালতিতে জল রাখা থাকে, শীতকালে দেখেছি রোদের তাপে গরম হওয়া এই জলেই সাধারণতঃ স্নান করেন তিনি।

প্রভাতকুমার নিরামিষাশী নন। তবে এখন আর মাংস ডিম খান না—দুধ-ভাতই খান। রাত্রে ভাত নয়—দু'-তিন টুক্‌রো রুটি বা কিছু খই, একটু দুধ, একটা সন্দেশ, এই মাত্র। খাওয়া-দাওয়ার ব্যাপারেও তাঁর পরিমিতি-বোধ বিস্ময়কর—অনুকরণীয় তো বটেই।

দুপুরের খাওয়া-দাওয়ার পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম। তারপর ঘরের মধ্যে বসেন রেডিও খুলে। দিল্লীর খবর শোনেন; শোনেন দিল্লী বা ঢাকার রবীন্দ্রসঙ্গীত, অতুলপ্রসাদ ও নজরুলের গান—যখন যেমন থাকে। তারপর সেদিনের ডাকে আসা চিঠি-পত্র ও পত্র-পত্রিকা দেখার পালা। আবার বারান্দার সেই পড়ার টেবিলে। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেখানেই। বিকেলের দিকে প্রায় নিয়মিত পরিচিত অপরিচিত নানা ব্যক্তি ও আত্মীয়জনের আনাগোনা চলে। বারান্দায় তখন তাঁর সুযোগ্যা সহধর্মিনী—চুরাশির ধাক্কাতেও যিনি নিত্য-সাবলম্বী—সেই সুধাময়ী দেবী থাকেন তাঁর পাশেই; তাছাড়া কনিষ্ঠ ও ঘনিষ্ঠদের কেউ কেউ। রাত আটটা নাগাদ পরিমিত আহারের পর প্রভাতকুমার রেডিও খুলে বসেন অথবা দুরদর্শনের অনুষ্ঠান দেখেন কিছুক্ষণ। ন'টার মধ্যে বিছানায়। *'Early to bed and early to rise, makes a man healthy, wealthy and wise'*—প্রভাতকুমারের জীবন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের 'রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পে'র কিছু গবেষণামূলক কাজের ভার রয়েছে প্রভাতকুমারের উপর ১৯৬৮ সাল

থেকে। এ জন্য বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ তাঁকে নানাভাবে সহায়তা করে যাচ্ছেন। ওই বছরই রবীন্দ্রভবনের দুই তরুণ সাহিত্য--সহায়ক শ্রীপ্রবীরকুমার দেবনাথ ও শ্রীদিলীপকুমার দত্তকে তাঁর রবীন্দ্র-চর্চায় সার্বিক সহায়তার জন্য নিয়োগ করা হয়। 'রবীন্দ্র-চর্চার দুশ্চর ব্রতে···দীক্ষিত' এই তরুণদ্বয় আজও তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রয়েছেন।

প্রভাতকুমার এখন ব্যাপৃত আছেন নানা কাজে। রবীন্দ্র-জীবনী, রবীন্দ্রজীবনকথা, রবীন্দ্রনাথের চেনাশোনা মানুষ, রবীন্দ্র বর্ষপঞ্জী, রবীন্দ্রগ্রন্থপরিচিতি (২য় ও ৩য় খণ্ড) ইত্যাদি গ্রন্থের পরিমার্জনা ও সম্পাদনা তো আছেই, তা ছাড়া চলছে 'রবীন্দ্র দিনপঞ্জী' ও 'জ্ঞানভারতী' সম্পাদনার দুরূহ কাজ। প্রভাত-কুমারের যে গ্রন্থগুলি প্রকাশের অপেক্ষায় আছে সেগুলি হ'লো— বাংলায় ধর্মসাহিত্য, ফিরে ফিরে চাই (২য় খণ্ড), পৃথিবীর ইতিহাস (২য় খণ্ড), রবীন্দ্রগ্রন্থ পরিচিতি (২য় ও ৩য় খণ্ড) ও একখানি প্রবন্ধ সংকলন।

'রবীন্দ্র দিনপঞ্জী' অর্থাৎ রবীন্দ্রজীবনের প্রতিদিনের ঘটনা ও রচনার বিস্তারিত উপাদান সংগ্রহের কাজ শুরু হয় আজ থেকে প্রায় পঁয়ষট্টি বছর আগে। সে সময় প্রভাতকুমার প্রতি-দিনের তথ্য সংকলন করে কার্ডে লিপিবদ্ধ করেছেন। আজ সেই কার্ডের সংখ্যা প্রায় কুড়ি হাজার। পড়ে এই কার্ডের তথ্যাদি 'রবীন্দ্র দিনপঞ্জী' নামাঙ্কিত বড়ো বড়ো খাতায় লেখা শুরু হয়। এ পর্যন্ত মোট ছেষট্টি খানা খাতা সম্পূর্ণ হয়েছে ; এখনো বহু বাকী। এখনো নোতুন নোতুন তথ্য সংগৃহীত ও সংযোজিত হচ্ছে। প্রথমে প্রভাতকুমার নিজেই এই খাতা তৈরীর কাজ শুরু করেন। পরবর্তীকালে (আজ থেকে প্রায় আঠার বছর আগে) আমি এই কাজে সহায়ক হই এবং তারও

পরে আরও দু-চারজন তরুণ। সকলকেই প্রভাতকুমার নিজ তহবিল থেকে পারিশ্রমিক দিয়েছেন। বছর কয়েক আগে—১৯৭৭ সালে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ প্রভাতকুমারের এই কাজে বিশেষভাবে সহায়তার জন্য শ্রীঅজয়কুমার মাল ও শ্রীমতী শিবানী ভট্টাচার্য (রায়) কে নিয়োগ করেন। এরা দু'জনে অন্যত্র চলে যাওয়ায় প্রায় বছর খানেক হলো শ্রীমতী শীলা সিংহরায় নিযুক্ত হয়েছেন। এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়—'রবীন্দ্র দিনপঞ্জী' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলে রবীন্দ্রানুরাগী ও রবীন্দ্র-গবেষকগণ বিশেষভাবে উপকৃত হবেন।

'রবীন্দ্রজীবনীর' মতো 'জ্ঞানভারতী' এবং 'নব জ্ঞানভারতী' কোষগ্রন্থ দু'খানিও প্রভাতকুমারের অবিস্মরণীয় কর্মদক্ষতা ও অধ্যবসায়ের ফসল। অন্যান্য গ্রন্থের মতো এ গ্রন্থ দু'খানির সংস্করণেরও ব্যবস্থা হয়েছে। সম্প্রতি 'নব জ্ঞানভারতী'র দু'খণ্ড নবরূপে প্রকাশ করেছেন 'সাক্ষরতা প্রকাশন' 'জ্ঞানভারতী'র সংস্করণ ও সম্পূর্ণায়নের কাজও দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে। গ্রন্থাগারের কাজ ছাড়াও আমি ও শ্রীমতী অশ্রুকণা দত্ত এই কাজে সহায়তা করে চলেছি।

এই সব নির্দিষ্ট কাজ তো আছেই, তাছাড়া প্রায় নিয়মিত বিভিন্ন সংস্থা ও পত্রিকা সম্পাদকের অনুরোধ আসছে—লেখা চাই। সবই রবীন্দ্রবিষয়ক নয়—নানা রকমের। স্বভাবতই প্রভাতকুমার সকলের ইচ্ছা পূরণ করেন—এ কাজে তাঁর প্রধান সহায়ক প্রবীরকুমার। সবচেয়ে বড়ো কথা, প্রভাতকুমার কাউকে নিরুৎসাহিত করেন না, উপেক্ষা করেন না—যেমন লেখা পাঠানোর বেলায়, তেমনি মুখোমুখি বসে আলাপ-আলোচনায়। তরুণদের চিন্তাভাবনা সৃষ্টিক্ষমতার উপর প্রভাত-কুমারের আস্থা বহুকালের—তাই যে-কোনো কর্মোদ্যোগ প্রসঙ্গেই

"তরুণদেরও ডাক দাও।" ঊননব্বই-এর দোরগোড়ায় দাঁড়িয়েও মানসিকতায় তিনি ঊনত্রিশের যুবক!

প্রভাতকুমারের অন্যতম মহৎ গুণ—তিনি শুধু নিজে লিখেই ক্ষান্ত হন না, সহায়কদেরও লিখতে অনুপ্রাণিত করেন। বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবীরকুমার দেবনাথের প্রবন্ধ ও তাঁর প্রকাশিতব্য গ্রন্থ 'রবিতীর্থে বিদেশী' অথবা দিলীপকুমার দত্তের 'শান্তিনিকেতনের গৃহাদির' ইতিহাস লেখা তো এইভাবেই সম্ভব হয়েছে। বলা বাহুল্য, যে-কোনো তরুণ সাহিত্যসেবী ও গবেষকের জীবনে এ ধরণের অনুপ্রেরণা অমূল্য আশীর্বাদস্বরূপ।

সূচনাতেই বলেছি, প্রভাতকুমার তাঁর নিজস্ব গ্রন্থাগারটির পুনর্গঠনের অনেকখানি দায়িত্ব আমাকে দিয়েছেন। এই গ্রন্থাগারে রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রবিষয়ক বই তো আছেই, এ ছাড়া আছে বিচিত্র বিষয়ের বহু মূল্যবান বই। এখানে এমন অনেক ছোটো বড়ো বই আছে, যেগুলো সংগ্রহের সময় হয় তো বিশেষ কাজে লাগে নি, কিন্তু এখন সেগুলোর বিষয়-বস্তু অমূল্য হ'য়ে উঠেছে। বিস্ময়ের কথা এই, প্রভাতকুমার আজও তাঁর বারান্দায় বসেই বেশির ভাগ বই-এর আকারপ্রকার ও বিষয়বস্তুর কথা নির্ভুলভাবে বলে দেন। অষ্টআশি বছরের একজন মানুষের স্মৃতি যে এত প্রখর থাকে ভাবা যায় না।

বই লেখা বা বই পড়া যেমন প্রভাতকুমারের ধ্যান-জ্ঞান, বই কেনাও তেমনি। ভালো ভালো বই প্রকাশিত হওয়া মাত্র সংগ্রহের জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হ'য়ে ওঠেন—নির্দেশ দেন সংগ্রহ ত্বরান্বিত করার জন্য। এ ছাড়া বিভিন্ন নামী অনামী লেখকের উপহার-গ্রন্থ তো নিয়মিত জমা হচ্ছে এই গ্রন্থাগারে; আসছে নানা পত্র-পত্রিকাও। বর্তমানে গ্রন্থাগারের গ্রন্থসংখ্যা প্রায় চার হাজারের কাছাকাছি। পুরোনো বই নিয়মিত বাঁধানো

হচ্ছে—কিছু কিছু মূল্যবান পত্র-পত্রিকাও। নোতুন করে বাঁধানো হ'লে প্রভাতকুমার আবার একবার নেড়ে চেড়ে দেখেন—কখনো কখনো পড়তে শুরু করে দেন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকরা অনেকেই এই অকাদেমী গ্রন্থাগারে এসে পড়াশোনা করেন, সংগ্রহ করেন প্রয়োজনীয় উপাদান। অনেক সময় প্রভাতকুমারের নির্দেশনাও তাঁদের উপরি জোটে। আজীবন জ্ঞান-সাধক প্রভাতকুমার এই সাধন-কেন্দ্রটিকে কিন্তু তাঁর একার অধিকারেই রাখেন নি; যে-কোনো জ্ঞানপিপাসু পাঠকের কাছেই এর দ্বার উন্মুক্ত। শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ সংগ্রহ করা এবং জিজ্ঞাসু পাঠকের হাতে তাঁর আকাঙ্খিত গ্রন্থটি তুলে দেওয়া আদর্শ গ্রন্থাগারিকের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য। মহা গ্রন্থাগারিক প্রভাতকুমার আজও সেই চিন্তা-সূত্রে আবদ্ধ আছেন—'রবীন্দ্র অকাদেমী'র সৃষ্টি বোধ হয় সেজন্যেও।

সংযোজন ও সংশোধন

সংযোজন

জীবন-পঞ্জী

১৯৮০ ॥ ১৩৮৬ ॥ বয়স ৮৮

: ২০শে জানুয়ারি বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সাম্মানিক ডি. লিট্ উপাধি-লাভ ঘোষিত।

প্রভাতকুমার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকতে পারেন নি। ১১ই শ্রাবণ (২৭শে জুলাই) ১৩৮৭ তাঁর জন্মদিনে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও বিশিষ্ট প্রতিনিধিবৃন্দ প্রভাতকুমারের বাসভবনে উপস্থিত হয়ে এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই উপাধি-পত্র অর্পণ করেন।

: ১লা ফেব্রুয়ারি গোপালনগরে (বীরভূম) 'আন্তর্জাতিক বাউল মেলা'র উদ্বোধক।

: ২৩শে ফেব্রুয়ারি 'ছন্দোবতী' সংস্থা কর্তৃক মহাজাতি সদনে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন।

প্রভাতকুমার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হতে পারেন নি। পরে ১৪ই এপ্রিল (১লা বৈশাখ ১৩৮৭) প্রভাতকুমারের বাসভবনে সংস্থা কর্তৃক আয়োজিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মানপত্র প্রদান করা হয়।

রচনা-পঞ্জী

১৯১৯ ॥ ১৩২৬

তথ্য-সংগ্রহ। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৬ বৈশাখ, আষাঢ়।

১৯২১ ॥ ১৩২৭

দশমিক অনুসারে বাঙালা পুস্তক। শান্তিনিকেতন পত্রিকা, ১৩২৭ মাঘ, ফাল্গুন।

১৯৭৭ ॥ ১৩৮৪

আমার জানা সুনীতিকুমার। পরিচয়, ১৯৭৭ আগষ্ট-সেপ্টেম্বর (সুনীতিকুমার স্মরণসংখ্যা)।

বন্ধু প্রশান্তচন্দ্র। সংবদধ্বম্, ১৯৭৭ ডিসেম্বর, পৃ. ১৪৩-১৪৬।

১৯৮০ ॥ ১৩৮৬-৮৭

বোলপুর দোলমেলা। পলাশ, ১৩৮৬ ফাল্গুন।

আশীর্বাণী। স্মরণিকা (মাধ্যমিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী সমিতির ৯ম বার্ষিক রাজ্য সম্মেলন। ২২-২৪ মার্চ, ১৯৮০)।

আশীর্বাণী। কবিচিত্রে বীরভূম, প্রথম খণ্ড (২৫শে বৈশাখ ১৩৮৭) পৃ. ৩।

স্মৃতিচারণ। পারানি, ১৩৮৭ বৈশাখ, পৃ. ১-২।

রবীন্দ্রচর্চাভবন উদ্বোধনে আচার্য প্রভাতকুমারের আশীর্বাদ। রবীন্দ্র ভাবনা, এপ্রিল-মে ১৯৮০, পৃ. ৩৯।

সংশোধন

পত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ।
৮	গ্রন্থাগার	গ্রন্থাগার
১২	রমা রোঁলা ..	রমাঁ রলাঁ।

পত্রাঙ্ক	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২	১৯৬৭ ॥ ১৩৬৪…	১৯৬৭ ॥ ১৩৭৪…
১৬	রবীন্দ্রনাথ	রথীন্দ্রনাথ
২১	Satisfied	Statistical
২২	শান্তিনিকেতন পত্রিকা. -১৩৩০ ফাল্গুন…	শান্তিনিকেতন পত্রিকা, -১৩৩০ অগ্রহায়ণ··
২৩	শান্তিনিকেতন পত্রিকা, -১৩৩৩ আশ্বিন…	শান্তিনিকেতন পত্রিকা, -১৩৩৩ আষাঢ়, শ্রাবণ…
২৯	splecial	special
৪২	In memorium-Rabindranath…	In memorium-Rathindranath…
৪৭	প্রবাসী, ১৩৭০ আষাঢ়…	প্রবাসী, ১৩৭০ শ্রাবণ ··
৫০	কথাসাহিত্য, ১৩৭২ পৌষ…	কথাসাহিত্য, ১৩৭২ আষাঢ়…
৫৫	সাতই পৌষেই মেলা।	সাতই পৌষের মেলা।
১০৫	Abbot নেপোলিয়ন ··	Abbot-এর নেপোলিয়ন…
১২৭	একজন প্রয়াত	একজন অধুনা প্রয়াত
১৪৭	মণীষা রায়	মনীষা রায়
১৫২	ইচ্ছে কার	ইচ্ছে করে
১৫৭	এবং সেদিনকার	সেদিনকার
১৭৮	কলে	ফলে
২১৬	"তরুণদেরও ডাক দাও।"	তিনি বলেন, "তরুণদেরও -ডাক দাও।"